প্রকাশক—
শ্রীমহেন্দ্রনাথ পাল
দি নিউ বুক স্টল
৫/১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট,
কলিকাতা-৯

মুদ্রণ—
শ্রীতুলসীচরণ বক্সী
ন্যাশনাল প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
৬৩/ডি, মদন মিত্র লেন,
কলিকাতা-৬

উৎসর্গ-পত্র

দেশ ও জাতির একনিষ্ঠ সেবক সর্বজনপ্রিয় গণনায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সমীপেষু—

স্বাধীনতা-আন্দোলনের আমিও একজন ক্ষুদ্র সৈনিক ছিলাম —নির্যাতন ভোগ করিয়াছি সত্য, কিন্তু তোমার সহিত তাহার তুলনা হয় না। আমার এই নির্যাতিতের কাহিনী 'অতীতের কথা' তোমার হাতেই শোভা পাইবে মনে করিতেছি। খোদা তোমাকে জয়যুক্ত করুন ইহাই প্রার্থনা।

আফতাবউদ্দীন চৌধুরী

বাংলা হিলি (বাংলাদেশ)

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

হঠাৎ বাংলাদেশে স্বাধীনতার যুদ্ধ আরম্ভ হইল। বর্বর পাকিস্তানী সৈন্যদল হিলি আক্রমণ করিয়া অনেক নিরীহ গ্রামবাসীকে হত্যা করিয়া তাহাদের যথাসর্বস্ব লুণ্ঠন ও অগ্নিদাহ করিতে লাগিল। আমরা প্রাণভয়ে অগণিত লোক ভারতীয় এলাকায় আশ্রয় লইলাম। আমার অতীতের কর্মকেন্দ্র ও আবাসভূমি ছিল এই ভারতীয় হিলি। দীর্ঘ বিশ বৎসর পর উত্তরবঙ্গের ব্যবসাকেন্দ্র হিলির বর্তমান দৈন্য দশা দেখিয়া বড় দুঃখ হইল। সহকর্মীদের মধ্যে মাধব রায় ও আর দু'-চার জন ছাড়া সকলেই পরপারে পাড়ি জমাইয়াছেন। আমার অনুজপ্রতিম মাধবকে অনেক দিন পরে দেখিয়া আমরা আলিঙ্গনাবদ্ধ হইলাম। মাধব যৌবন সীমা অতিক্রম করিয়াছে, কিন্তু জনসেবায় তাহার আগ্রহ পূর্বের ন্যায় রহিয়াছে। যুদ্ধ ক্রমশঃ ঘোরতর আকার ধারণ করিলে আমার অপর এক প্রাক্তন সহকর্মী ভোলানাথ সাহার কথায় আমরা হিলি ত্যাগ করিয়া ৮ মাইল দূরবর্তী তিওড় রিলিফ ক্যাম্পে আশ্রয় লইলাম। ভারত সরকার ও ভারতীয় জনসাধারণের কাছে আমরা চিরকৃতজ্ঞ, কারণ আমাদের দুঃসময়ে প্রায় এককোটি বাস্তুত্যাগী মানুষের ভরণপোষণের ব্যবস্থা তাঁহারা করিয়াছেন।

যুদ্ধের পূর্বেই আমার 'অতীতের কথা' পুস্তকখানি প্রকাশিত হয়। যুদ্ধ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতা নেতাজী ভবনে অবস্থিত ন্যাশনাল কোয়ার্ডিনেশন কমিটির পক্ষ হইতে এক প্রতিনিধি দল কাপড়-চোপড় ও অন্যান্য জিনিসপত্র লইয়া আসিয়াছিলেন। মাধব রায়ের বাসায় তাঁহাদের সহিত আমার আলাপ-পরিচয় হয়। এই প্রতিনিধি দলের অধ্যাপক সন্দীপ দাস ও অধ্যাপিকা জাহানারা বেগম আমার বইখানা দেখিয়া আনন্দিত হন এবং উহার একটি উৎকৃষ্ট সংস্করণ কলিকাতা হইতে প্রকাশের চেষ্টা করিবেন বলিয়া বইখানি তাঁহারা লইয়া যান। ইঁহারা কয়েক দিন হিলিতে ছিলেন। আমার ভাঙ্গা বাড়ীও দেখিয়া গিয়াছেন। আমি সন্দীপবাবু ও জাহানারার উপর বইখানি প্রকাশের ভার দিলাম। মূল বক্তব্য ঠিক রাখিয়া আবশ্যকমত পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের ভারও তাঁহাদের রহিল।

তাঁহাদের দুই জনের অক্লান্ত চেষ্টায় সম্প্রতি এই পরিমার্জিত সংস্করণ প্রকাশিত হইল। আমার কন্যাসমা জাহানারা, সন্দীপবাবু ও নিউ বুক স্টলের স্বত্বাধিকারী

শ্রীমহেন্দ্রনাথ পালের নিকট আমি কৃতজ্ঞ। এই বই প্রকাশের ব্যাপারে বিশিষ্ট অধ্যাপক চিত্তরঞ্জন দাশগুপ্ত অত্যন্ত আগ্রহ নিয়াছেন। তাঁহাকেও আমার কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাগণ বইখানি পাঠ করিয়া আনন্দলাভ করিলে সুখী হইব।

বাংলা হিলি (বাংলাদেশ) বিনীত—
১লা ফাল্গুন ১৩৮০ সাল আফতাবউদ্দীন চৌধুরী

আত্মকথা

আমার কর্মজীবনের কাহিনী 'অতীতের কথা' প্রবন্ধ আকারে করাচীর 'দিগন্ত' পত্রিকায় ও বগুড়া জয়পুর হাট হইতে প্রকাশিত 'অভিযান' পত্রিকায় কতক অংশ প্রকাশিত হইয়াছিল। দিগন্ত-সম্পাদক সুসাহিত্যিক জনাব মফিজউদ্দীন আহম্মদ ও অভিযান-সম্পাদক বহু গ্রন্থপ্রণেতা জনাব শাহাদত হোসেন ফারুক এবং অন্যান্য বহু বিশিষ্ট ভদ্রলোক প্রবন্ধগুলি পুস্তক আকারে প্রকাশ করিতে আমাকে অনুরোধ করেন। তাঁহাদের অনুরোধে গ্রন্থখানি লিখিতে আরম্ভ করি। কিন্তু আমার অযোগ্যতা প্রধান অন্তরায় রূপে দেখা দিল। তবুও লিখিয়া চলিলাম। এইবার দৈব প্রতিকূল হইল, বাত ব্যাধিতে আমার দক্ষিণ হস্ত অকর্মণ্য প্রায় হইয়া যাওয়ায় লেখা বন্ধ করিতে বাধ্য হইলাম। দীর্ঘ দিন পর স্থানীয় কাস্টম ইনস্পেক্টর জনাব কাজী আবদুস সাত্তার ও তাঁহার সুযোগ্যা সহধর্মিণী আমাকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইলেন। আমি বলিয়া যাইতাম স্নেহাস্পদ বেগম হালিমা সাত্তার, বি.এ. কথাগুলি লিখিয়া দিতেন। এতদ্ব্যতীত আমার লণ্ডনপ্রবাসী কন্যা বেগম জাহানারা দিনাজপুরের প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক জনাব মেহেরাব আলী সাহেব, বাবু লক্ষ্মীনারায়ণ দাস, মীর মোশারফ হোসেন এবং আরও অনেকে পুস্তকের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিতে আমাকে সাহায্য করিয়াছেন। দিনাজপুরে তদানীন্তন জনপ্রিয় ডেপুটি কমিশনার জনাব এ. কে. এম. জ্যাকেরিয়া সাহেব পুস্তক-প্রণয়ন ও মুদ্রণ বিষয়ে যে সাহায্য করিয়াছেন তাহার জন্য তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম। তিনি স্বয়ং হিলি আসিয়া পুস্তকখানা প্রকাশের জন্য অর্থ সংগ্রহের নিমিত্ত স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে লইয়া একটি কমিটি গঠন করিয়াছেন। তাঁহার অনুরোধ ও কমিটির চেষ্টায় স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যবসায়ী জনাব কাজী আবদুল মজিদ চৌধুরী, জনাব শাহ্ রহিমুদ্দীন চৌধুরী, জনাব আজিমুদ্দীন মণ্ডল, জনাব নজিরউদ্দীন মণ্ডল, বাবু বিনয়চন্দ্র বসাক, বাবু প্রবীরচন্দ্র বসাক, জনাব রফিকউদ্দীন আহম্মদ, হাজি শাহাদতজ্জামান চৌধুরী, ডাক্তার দেলোয়ার হোসেন, মোঃ সিদ্দিক, সৈয়দ সোলায়মান আলী, জনাব আজাদ হোসেন, বাবু নিকুঞ্জবিহারী মজুমদার এবং আরও অনেকে অর্থসাহায্য করিয়াছেন। রাজসাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক সাংস্কৃতি ও ইতিহাসের অধ্যক্ষ স্বনামখ্যাত মনীষী ডক্টর অবুদুল বারী সাহেব কয়েকটি ঐতিহাসিক ভুল সংশোধন করিয়া দিয়াছেন ও অর্থ-

সাহায্য করিয়াছেন। নওগাঁ বার সমিতির সভাপতি জনাব আবু ইউসুফ বদিউজ্জামান সাহেবও অর্থসাহায্য করিয়াছেন। জনাব অবদুল কুদ্দুস মুন্সি, ডাক্তার আজিজুর রহমান, মোঃ মোস্তাফা খান, আবুল হোসেন মিয়া, ইস্টার্ন ফেডারেল ইন্সিওরেন্স কোঃ জনাব মোশারফ হোসেন তালুকদার, বি.এ., বগুড়া ওরিয়েন্ট প্রেসের মালিক জনাব আবদুল গফফার সাহেব পুস্তকখানির প্রুফ সংশোধন ও মুদ্রণ বিষয়ে সাহায্য করিয়াছেন। কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, প্রথিতযশা সাহিত্যিক জনাব ওয়াসিউল্লা সাহেব ও স্বনামপ্রসিদ্ধ লেখক অধ্যাপক জনাব আবুল ফজল সাহেব, সাহিত্যরথী বাবু প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়গণের গ্রন্থ হইতে আমি কিছু সাহায্য পাইয়াছি। আমার স্নেহাস্পদ দৌহিত্র ক্যাপটেন এ. টি. এম. আবেদুর রহমান, এম.বি.বি.এস. ও তাহার সুযোগ্যা সহধর্মিণী বেগম হোসেন-আরা, এম.বি.বি.এস. আমাকে সাহায্য করিয়াছেন।

মুসলিম-কীর্তিতে-ভরা ভারত এখন বিদেশ। আমি যেখানে গিয়াছি সেখানকার দ্রষ্টব্য স্থানগুলির মোটামুটি বিবরণ সংক্ষেপে দিতে চেষ্টা করিয়াছি। কেননা ঐগুলি দেখার সুযোগ পূর্বের মত আমাদের এখন আর নাই। আশা করি, ইহা পাঠক-পাঠিকাগণের আনন্দ বর্ধন করিবে।

আধুনিক কয়েকজন মুসলমান লেখক ভারতীয় কংগ্রেসকে হিন্দু প্রতিষ্ঠান বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু কংগ্রেস শুধু হিন্দু প্রতিষ্ঠান ছিল না। মুসলমানগণ সংখ্যালঘু হইলেও পাক ভারতের বিশিষ্ট মুসলিম মনীষী ও লক্ষ লক্ষ আজাদী পাগল মুসলমান ইংরেজ তাড়াইবার উদ্দেশ্য লইয়া কংগ্রেসে যোগ দিয়া যথেষ্ট নিগ্রহ ভোগ করিয়াছেন। হিন্দু-মুসলমান সমবেত শক্তির দাপটে এদেশ হইতে ইংরেজ চিরবিদায় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছে। সুতরাং কংগ্রেসকে শুধু হিন্দু প্রতিষ্ঠান বলিলে স্বাধীনতা-সংগ্রামে মুসলমানের দান কতটুকু থাকে ?

মুসলিম লীগ বর্ণ হিন্দুদের সংকীর্ণতার জন্য, পাকিস্তান হাসেল করিয়াছে। কিন্তু ইংরেজ তাড়াইতে যায় নাই। এ কথা সত্য ইংরেজ চলিয়া না গেলে পাকিস্তান হিন্দুস্থান কিছুই হইত না। অনেকের ধারণা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র জীবিত থাকিলে দেশ ভাগ হইত না। কংগ্রেস যদি মুসলমানের দাবি-দাওয়া স্বীকার করিয়া লইত তাহা হইলে পাকিস্তানের দাবি উঠিত না। কংগ্রেস ও লীগ এক মত হইতে না পারায়, নিরুপায়ে ইংরেজ চলিয়া যাওয়ার সময় মুসলমানদের দাবি-দাওয়া কতকটা স্বীকার করিয়া লইয়া ফুটা পাকিস্তান দিয়া গিয়াছে। মুসলিম লীগ

ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করিয়াছে, শুধু দেশ বিভক্তি হয় নি। দশ কোটি মুসলমানও দ্বিধা-বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। ইহা ভাল হইয়াছে কি মন্দ হইয়াছে পরবর্তী ঐতিহাসিকগণ তাহা নির্ণয় করিবেন।

প্রুফ দেখার ক্রটিতে পুস্তকটির বিভিন্ন স্থানে কিছু কিছু ভুল ছাপা হইয়াছে। তাহার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

হিলি
২৯শে আষাঢ় ১৩৭৭

বিনীত—
আফতাবউদ্দীন চৌধুরী

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস ও ইসলামিক সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যক্ষ বিখ্যাত মনীষী ডক্টর মওলানা মোহাম্মদ আবদুল বারী, এম.এ., ডি.ফিল. (অক্সন) লিখিয়াছেন :

আপনার জীবনকথার পাণ্ডুলিপি মেহের বানী করে আমাকে পড়তে সুযোগ দেওয়ায় আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। অত্যন্ত সহজ ও সুন্দর ভাষায় বিশেষ আন্তরিকতার সাথে আপনি আমাদের আজাদী সংগ্রামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের বিষয়বস্তু লিপিবদ্ধ করেছেন তা ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকদের জন্য পথনির্দেশের কাজ করবে। প্রত্যক্ষদর্শী এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বয়ং জড়িত থাকায় আপনার বিবরণ আরও মূল্যবান বলেই চিরদিন বিবেচিত হবে বলে আমি বিশ্বাস করি। এরূপ আরও জীবনকথার প্রয়োজন আছে। আজাদী সংগ্রামের সকল বীর মোজাহিদ যদি তাঁদের অভিজ্ঞতার কাহিনী এমনি করে কাগজের পাতায় লিখে রাখতেন তবে আমাদের ইতিহাস সত্যই সমৃদ্ধ হত এবং অনেক সমস্যার হত সমাধান।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
১৮ই মে ১৯৬৮

মহম্মদ আবদুল বারী

সূচীপত্র

অতীতের কথা

অর্ধ-শতাব্দী পূর্বের এ দেশের মুসলমান সমাজের কথা লিখিতে বসিয়াছি। অবস্থা তখন অতীব শোচনীয় ছিল। শিক্ষাবিস্তার মোটেই হয় নাই। প্রয়োজনমত উপযুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানও ছিল না। আমার জন্মভূমি দিনাজপুরের কথা বলিতেছি। অন্যান্য জেলার অবস্থাও প্রায় এইরূপ। জেলা ও মহকুমা সদরে একটি করিয়া হাই স্কুল ছিল। মুষ্টিমেয় মুসলমাল ছাত্র ব্যতীত সমস্ত হিন্দু ছাত্র তথায় অধ্যয়ন করিত। মফঃস্বলে হাই স্কুল দূরের কথা, এম্. ই. স্কুলও অনেক থানায় ছিল কিনা সন্দেহ।

দু-একটি গ্রাম্য পাঠশালায় গুরু মহাশয়গণ তালপাতায় ছাত্রগণকে লেখা শিক্ষা দিতেন। রাজহাঁসের পাখা অথবা খাগড়ার কলম, মাটির দোয়াত ছিল লেখনীর প্রধান উপকরণ। ত্রিফলার কষ ও ভূষা কালি যোগে একপ্রকার কালি প্রস্তুত করা হইত। হাতে-প্রস্তুত তুলোট কাগজ বেশী দেখা যাইত না। হাওড়া জেলার বালি নামক স্থানে মেসিনে যে কাগজ প্রস্তুত হইত ইহাই 'বালি কাগজ' নামে বিখ্যাত ছিল।

জনসাধারণ প্রায় নিরক্ষর হইলেও মোটের উপর বেশ স্বাস্থ্যবান ছিল। এখনকার মত সংক্রামক ব্যাধির ব্যাপক আক্রমণ তখন ছিল না। ক্বচিৎ ও কদাচিৎ উহা ব্যাপকভাবে দেখা যাইত। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার না হওয়ায় বিলাসিতাও ছিল না। জীবনসংগ্রামে মানুষকে এত ক্ষতবিক্ষত হইতে হয় নি। জমিতে প্রচুর ফসল হইত। বাগানে পর্যাপ্ত আম, কাঁঠাল, কলা, নারিকেল প্রভৃতি ফল ফলিত। বৃক্ষ-রোপণে তখনকার লোকের প্রচুর আগ্রহ ছিল। জলাশয়ে প্রচুর মাছ পাওয়া যাইত। দু-তিন পয়সা সের দরে খাঁটি দুধ পাওয়া যাইত। পাঁচ সিকা হইতে দেড় টাকা সের দরে খাঁটি ঘি মিলিত। আজকালকার মত ভেজালের প্রচলন তখন ছিল না। মানুষ সাধারণতঃ দীর্ঘজীবী ছিল। শতবর্ষ অতিক্রমকারী অনেক বৃদ্ধ ব্যক্তিকে তখন আমরা দেখিয়াছি।

কিন্তু বিদেশী শাসনের ও শোষণের ফলে ক্রমশঃ অবস্থার অবনতি হইতে লাগিল। ইংরেজ শাসকদের সৃষ্ট জমিদার ও মহাজনগণ জনসাধারণকে নানা ভাবে পীড়ন করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতে লাগিল। চক্রবৃদ্ধিহারে সুদ আদায় তখন আইনসঙ্গত

ছিল। সুদখোর মহাজনগণ প্রজার অভাবের সময় জমি বন্ধক রাখিয়া টাকা কর্জ দিত। অত্যধিক হারে সুদের টাকা পরিশোধ করা প্রজাদের সাধ্য হইত না বলিয়া ঋণের দায়ে জমিজমাগুলি মহাজনদের কবলে চলিয়া যাইত। আমার বাড়ীর সন্নিকটের এক বর্ধিষ্ণু ঘরের প্রজা জনৈক হিন্দু মহাজনের নিকট হইতে একশত টাকা কর্জ করিয়াছিল। কয়েক বৎসর পর উহা সুদে আসলে কয়েক সহস্রে পরিণত হয়। সুদখোর মহাজনটি আদালত যোগে তাহার একশত বিঘা জমি নিলাম বিক্রয় করিয়া হস্তগত করেন। ঐ প্রজাটির ওয়ারিশগণ বর্তমানে দিন মজুর খাটিয়া দিন গুজরান করিতেছে। ধূর্ত মহাজনগণ এইরূপে প্রজার হাজার হাজার বিঘা জমি আত্মসাৎ করিয়া তাহাদিগকে দিন মজুরে পরিণত করিয়াছে। ইহার ফল মারাত্মক রূপে দেখা দিয়াছিল। মহাজনগণ জোতদার সাজিয়া জমি বর্গা দিয়া চাষাবাদি করিতে লাগিল। প্রায় প্রতি বৎসর ইহারা বর্গাদার বদলাইয়া বিভিন্ন ব্যক্তির দ্বারা জমি চাষ করাইত। বর্গাদারের প্রাপ্য ফসলের অর্ধাংশ দিয়া বাকী অংশ নিজেরা গ্রহণ করিত। আঁধিয়ারগণের জমির উপর নিজস্ব স্বত্ব না থাকায় কোন চাষী যত্ন করিয়া চাষাবাদ করিত না। ফলে জমির উর্বরতা দিন দিন কমিয়া যাইতে লাগিল। জমির মালিকগণ কেবল উৎপন্ন ফসলের অংশ গ্রহণ ব্যতীত জমির উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য কিছুই করিতেন না। দুরবস্থার জন্য সবল গরুমহিষ দ্বারা চাষাবাদ করা সম্ভব পর হইত না। ক্রমেই জমির উৎপাদন কমিতে লাগিল। গবর্নমেণ্ট ধ্বংসোন্মুখ প্রজার দুর্দশা দেখিয়াও প্রতিকারের জন্য অগ্রসর হইলেন না।

বিদেশী শাসকগণ কুটিরশিল্পকে নানা কৌশলে ধ্বংস করিয়া নিজ দেশীয় পণ্য আমদানী পূর্বক দেশের শিল্পী ও কারিগরগণকে বেকার করিয়া তুলিল। নিরক্ষর চাষী ইহার কোন প্রতিকার করিতে পারিল না। জমিজমা হারানোর সাথে সাথে দরিদ্রতা নিবন্ধন তাহারা স্বাস্থ্যও হারাইতে লাগিল। শক্তিও হারাইল। সুজলা সুফলা বঙ্গদেশ শ্মশানে পরিণত হওয়ার উপক্রম হইল। খ্রীষ্টান মিশনারীরা এই সুযোগে নানা প্রলোভন দিয়া মুসলমানদিগকে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষা দিতে লাগিল। ক্রমশঃ মহাগৌরবান্বিত মুসলমান জাতি অধঃপতনের চরম সীমায় উপনীত হইল। এতদ্ব্যতীত নিজদের মধ্যে কলহবিবাদ, হানাফী মোহাম্মদীর ঝগড়া, শিয়া-সুন্নীতে মারামারি ইত্যাদি কোন্দলগুলির অলক্ষে মুসলমান সমাজকে পঙ্গু ও ধ্বংসের পথে লইয়া যাইতেছিল।

আমাদের গ্রামের নিকট হানাফী ও মোহাম্মদী জমাতের দুই জন মৌলবী

ছিলেন। দুই জনেরই বহু মুরিদ ও মোকাল্লেদ ছিল। ইহাদের মধ্যে সামান্য বিষয় লইয়া মতভেদ ও তুমুল ঝগড়া চলিত। উভয় দল পরস্পরকে বেদীন ও কাফের বলিয়া গালাগালি দিত। অবশেষে স্থির হইল বিভিন্ন স্থান হইতে মৌলবী মৌলানা আনাইয়া হাদিস ও কোরান দ্বারা এই মতভেদের মীমাংসা করা হইবে।

চারিদিকে ঢোল সহরৎ দিয়া বিজ্ঞাপন বিলি করিয়া এক বিরাট সভার আয়োজন করা হইল। উভয় পক্ষেই নিমন্ত্রিত হইয়া জবরদস্ত সব আলেম ওলামাগণ আসিলেন। প্রায় ২৫।৩০ হাজার লোক সভায় উপস্থিত হইল। শান্তি রক্ষার জন্য পুলিশের বড়কর্তা সদলবলে স্বয়ং উপস্থিত হইলেন। গাড়ী গাড়ী কেতাব আনা হইল। স্থানীয় তিন-চার জন বিশিষ্ট ব্যক্তি ও পুলিশ অফিসার সাহেব মধ্যস্থ নিয়োগ হইলেন। উৎসাহ ও উৎকণ্ঠার মধ্যে তুমুল বাহাছ আরম্ভ হইল। দুই দিন চলিয়া গেল কিন্তু কোন মীমাংসা হইল না। এমনকি মীমাংসার কোন লক্ষণও দেখা গেল না। তৃতীয় দিনে যখন পুরাদস্তর বাহাছ চলিতেছিল তখন কয়েক-জন দুষ্ট প্রকৃতির ছোকরা নিকটের এক বটগাছের মৌচাকে ঢিল ছুঁড়িয়া মারিল। তখন গুরুতর অবস্থা ধারণ করিল। মৌমাছিরা যত বড়ই শিল্পী হউক না কেন ইসলামী জলসার ফজিলত তাহাদের জানা ছিল না এবং আলেমদেরও মর্যাদা তাহারা বুঝিত না। ঢিল খাইয়া ঝাঁকে ঝাঁকে ক্রুদ্ধ মৌমাছিদল উড়িয়া আসিয়া জনসাধারণকে আক্রমণ করিল। মৌলবী সাহেবগণও বাদ গেলেন না। মৌমাছিদের অতর্কিত আক্রমণে মুহূর্তে জনতা ছত্রভঙ্গ হইয়া গেল। মৌলবী সাহেবদের অবস্থা আরো কাহিল হইল। কারণ মৌলবীদের আব্বা জোব্বা, টুপী পাগড়ী দ্বারা শরীর আবৃত, তাহাদের মুখের উপরই আক্রমণ চালাইয়াছিল বেশী। পরদিন 'হাড়িমুখো' হইয়া বাহাছী মৌলবীগণ ভগ্নহৃদয়ে স্ব স্ব স্থানে ফিরিয়া গেলেন। এই ত ছিল তৎকালীন মুসলিম সমাজের দুরবস্থা।

যশোর জেলার পালটি নামক গ্রামের বাহাছের একটি বিরাট সভার আয়োজন করা হইয়াছিল। ঐ সভা তিন দিন ধরিয়া চলিয়াছিল কিন্তু বাহাছের সভায় যে কেলেঙ্কারী পরিণামে ঘটিয়া থাকে, সেই সভায় তাহা ঘটিতে পারে নাই। কারণ সুপ্রসিদ্ধ কর্মবীর মুন্সী মেহেরুল্লাহ্ সাহেব উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি ওজস্বিনী ভাষায় এমন এক যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা দান করেন যে, বাহাছী মৌলবীগণ লজ্জিত হইয়া সভা ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান।

(২)

তখন সমাজ ও জাতির উন্নতিকল্পে দেশের বিভিন্ন স্থানে বড় বড় সভাসমিতি হওয়ার প্রচলন ছিল। সম্ভবতঃ ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে নদীয়া জেলার কুমারখালিতে 'আঞ্জুমান-ই-ইত্তেফাকে ইস্‌লাম' নামক সমিতির বার্ষিক অধিবেশন হয়। মৌঃ আবদুল কুদ্দুস রুমী, মৌঃ কাজী মোমতাজ উদ্দীন আহম্মদ বি.এ. ও বেলগাছির জমিদার আলী-মুজ্জামান চৌধুরী বি.এ. প্রমুখ উদ্যোগী কর্মিগণ এই সভার আয়োজন করেন। নদীয়া জেলার গাঁড়াডোব-নিবাসী প্রসিদ্ধ ইস্‌লাম-প্রচারক ও বাগ্মী মুন্সী শেখ জমিরুদ্দীন বিদ্যাবিনোদ সাহেব আমার পিতৃবন্ধু ছিলেন। তাঁহার আমন্ত্রণে আমার ওয়ালেদ হাজী উমরুদ্দীন চৌধুরী সাহেব আমাকে সঙ্গে লইয়া এই সভায় যোগদান করেন। আমরা পিতাপুত্রে শেখ সাহেবের বাড়ীতে একদিন থাকিয়া একত্রে কুমারখালি রওয়ানা হই। রাত্রির অন্ধকারে পোড়াদহ ষ্টেশনে জনৈক ভদ্রলোককে আত্মগোপনের চেষ্টা করিতে দেখিয়া শেখ সাহেব তাঁহাকে পাকড়াও করিলেন। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়িতেছিল। অর্ধসিক্ত সাধারণ পোশাক-পরিহিত সেই ভদ্রলোককে শেখ সাহেব আমাদের সামনে হাজির করিলেন। পরিচয়ে জানিলাম ইনি বঙ্গ সাহিত্যের খ্যাতনামা কোকিল শান্তিপুর-নিবাসী কবি মোজাম্মেল হক। তাঁহার সহিত পরিচিত হইয়া আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম।

আমি তখন সবে মাত্র কৈশোরে পদার্পণ করিয়াছি। কি জানি কেন যেন তিনি আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতে লাগিলেন। একনিষ্ঠ সাহিত্যসাধকের সান্নিধ্য-লাভ ও স্নেহের পরশ পাইয়া কৃতার্থ বোধ করিলাম। কুমারখালি ষ্টেশনে পৌঁছিলে স্বেচ্ছাসেবক আমাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া গেস্ট হাউসে লইয়া গেল। একটি প্রকাণ্ড আম বাগানে সভার অধিবেশন বসিয়াছিল। সভাপতি ছিলেন অবসর-প্রাপ্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মৌঃ মাহমুদুন্নবী সাহেব। নদীয়ার তদানীন্তন জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ হীজক্যাল সাহেব ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন। কবি মোজাম্মেল হক সভাস্থলে বসিয়াই তৎকালীন সামাজিক অবস্থার উপরে একটি কবিতা রচনা করেন। কবিতাটি সভাস্থলেই পঠিত হয়। স্বয়ং সভাপতি সাহেব কবিতাটির উচ্চ প্রশংসা করেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ সম্পূর্ণ কবিতাটি আমি ভুলিয়া গিয়াছি। পরে ইহা মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছিল। যতটুকু স্মরণ আছে তাহা এই স্থলে উদ্ধৃত করিতেছি :

"কি শুনি রে আজ ভীম প্রভঞ্জন,
হানি বঙ্গভূমি সঘনে চলে।

অশান্তির ঘোর তিমির উচ্ছ্বাস,
বহে চারিদেকে বহে হা হুতাশ,
দয়া ধর্ম ক্ষমা যেন পেয়ে ত্রাস
অদৃশ্য কাহার পাশব বলে।
হিন্দু মুসলমানে ভাই ভাই জ্ঞান,
আর গো কাহার মানসে নাই,
ভুলেছে সকলে ভাই ভাই-এ প্রীতি
ভুলেছে প্রণয় কৃতজ্ঞতা নীতি,
মার কাট ধর এ পতন গীতি,
সবারি বদনে শুনিতে পাই।
আর যে নারকী শয়তান দল,
অকুত মোরগী করিয়া নাশ,
এবে সাধু সেজে কোরবানী ক্রিয়া,
রুধিতে আসিবে সবলে রুখিয়া,
তাদের সকলে দাও রসাতলে,
মিটাও ভবের তাবত আশ।
ওদিকে আবার করো রে শ্রবণ,
প্রবল সমাজ তেজেতে ফুলে,
করিছে মন্ত্রণা, কর নিগৃহীত,
দুরন্ত যবনে।
দিও নাক করজ অর্থ কিংবা ধন,
বাড়াও দ্বিগুণ খাজনার মান,
ছড়াও শতেক মামলা রণে।"

সভায় প্রায় তিন সহস্র লোকের সমাগম হইয়াছিল। অর্দ্ধ-শতাব্দী পূর্বেও হিন্দু ও মুসলমানের সম্বন্ধ প্রীতিপূর্ণ ছিল না। এই কবিতাটির ভাবে তাহাই ব্যক্ত হইতেছে। কবিতাটি পাঠের সময় ঘন ঘন করতালি ধ্বনি হইতেছিল। চট্টগ্রামের এক মৌলবী সাহেব করতালির ধ্বনিতে বিরক্ত হইয়া 'তালি বাজানা কোন্ কেতাব মে হ্যায়' বলিয়া চিৎকার করিতে লাগিলেন। কিন্তু কেহই তাঁহার চিৎকারে কর্ণপাত করিল না। মৌলবী সাহেব আরো ক্ষেপিয়া গেলেন। তিনি সভাপতি সাহেবের সম্মুখে উপস্থিত

হইয়া বিকট চিৎকার করিয়া পূর্বের কথাই আওড়াইতে লাগিলেন : সভাপতি সাহেব নিরস্ত হওয়ার জন্য অনুরোধ করিলেন। কোন ফল হইল না। অবশেষে কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবক তাঁহাকে ধরিয়া সভার বাহিরে লইয়া গেল। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ ইজিক্যাল প্রথমে ব্যাপারটি বুঝিতে পারেন নাই। সভাপতি সাহেবের নিকট শুনিয়া উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন। মুসলমান সমাজের বহু অভাব-অভিযোগ লইয়া এই সভায় অনেক আলোচনা হইয়াছিল। সভায় বিপুল জনসমাগম ও উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখিয়া মনে হইল মৃত সমাজে প্রাণের স্পন্দন জাগিয়াছে।

এক শ্রেণীর ধূর্ত লোক ছিল যাহারা পীর ও মৌলবী সাজিয়া গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়াইত। অনেকে মস্‌জিদ, মাদ্রাসা, মক্তব ইত্যাদির নাম করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিয়া আত্মসাৎ করিত। ইহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া উদীয়মান কবি ইস্‌মাইল হোসেন সিরাজী সাহেব ইস্‌লাম-প্রচারক পত্রিকায় যে কবিতাটি প্রকাশ করিয়াছিলেন, উহার কিয়দংশ যাহা স্মরণ আছে নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম :

"বাহবা বাহবা ধন্য বঙ্গের মৌলবী।
নায়েবে রসুল বলে তোমাদের দাবী।
পিঠে বোঝা দুই চারি চেলা লয়ে সাথে।
ভিক্ষা করি ফেরে সদা গাঁয়েতে গাঁয়েতে।
বাড়ী খান পান্তা শাক আর পোনা পুঁটী,
গ্রামে যেয়ে দম্ভে বলে লাও গোশত্‌ রুটী।
তালাক নেকার কামে অতিশয় পটু,
আহারে মজবুত যেমন ব্রাহ্মণের বটু।
আরবে হইবে রেল শুনিল যখন।
মোল্লাজী ভাবিল বুঝি অদ্ভুত কথন।
মোছলমান হয়ে চালাইবে রেলগাড়ী,
এ বড় তাজ্জব বাত বুঝিতে না পারি।
এসব হেকমত কাম আংরেজ লোকের,
দিও না রেলের চাঁদা সব কিছু ফের।"

তুরস্কের সোলতান আবদুল হামিদের সময় হেজাজে রেল লাইন তৈয়ারির কার্য আরম্ভ হয়। মদীনা শরীফ পর্যন্ত রেলপথ প্রস্তুত হইয়াছিল। এদেশ হইতে আমরাও বহু টাকা সংগ্রহ করিয়া পাঠাইয়াছিলাম। অশিক্ষিত মোল্লাগণ মুসলমানে

রেলগাড়ী চালাইতে জানে না—আংরেজ ব্যতীত এসব হেকমত কাম আর কাহারও দ্বারা হইতে পারে না বলিয়া মনে করিত এবং চাঁদা আদায়ে বাধা দিত। সিরাজী সাহেব এই শ্রেণীর ভণ্ড মৌলবীদিগকে লক্ষ্য করিয়া কবিতাটি লিখিয়াছিলেন।

[৩]

অধঃপতিত মুসলমান সমাজকে উদ্ধারকল্পে যাঁহারা প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়াছেন, যাঁহাদের ঐকান্তিক চেষ্টার ফলে আত্মবিস্মৃত মুসলমান জাতি দুনিয়ার বুকে দুর্বার গতিতে অগ্রসর হইতেছে, তাঁহাদের কথা আমরা ভুলিতে বসিয়াছি। বাংলার মুসলমানদের সব প্রথম সংবাদপত্র 'সুধাকর' মুন্সী শেখ আবদুর রহিম, মুন্সী রেয়াজ উদ্দীন আহম্মদ প্রমুখ সমাজহিতৈষী কর্মিগণের চেষ্টায় প্রকাশিত হয়। পরে উহা 'মিহির ও সুধাকর' নাম লইয়া এণ্টনী বাগান হইতে বাহির হইতে থাকে। মুন্সী শেখ আবদুর রহিম উহার সম্পাদক নিযুক্ত হন। এই একমাত্র সাপ্তাহিক ব্যতীত কোন দৈনিক পত্রিকা তখন আমাদের ছিল না। কিছু দিন পরে মোঃ মুজিবর রহমানের সম্পাদনায় বিখ্যাত ইংরাজী সাপ্তাহিক 'দি মুসলমান' আত্মপ্রকাশ করে। অতঃপর মওলানা ইস্‌লামাবাদী সাহেব সাপ্তাহিক 'সোলতান' ও মওলানা আকরাম খাঁ সাহেব সাপ্তাহিক 'মোহাম্মদী' পত্রিকা-দুইটি প্রকাশ করেন। একমাত্র মাসিক পত্রিকা 'ইস্‌লাম প্রচারক' মুন্সী রেয়াজ উদ্দীন আহম্মদ সাহেবের সম্পাদনায় কড়েয়া রোড হইতে প্রকাশিত হইত। ইহাদিগকে কেন্দ্র করিয়া যে সাহিত্যচক্র গড়িয়া উঠে উহাতে ছিলেন মীর মোশারফ হোসেন, পণ্ডিত রেয়াজ উদ্দীন মাশহাদী, মৌলবী মেরাজ উদ্দীন আহম্মদ, কবি মোজাম্মেল হক, কবি শেখ ফজলুল করিম, কবি ইস্‌মাইল হোসেন সিরাজী, মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্, মুন্সী শেখ জমিরুদ্দীন, মোঃ এয়াকুব আলী চৌধুরী, কবি কায়কোবাদ প্রমুখ সুধীবর্গ। মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্ ও মুন্সী শেখ জমিরুদ্দীন অসাধারণ বক্তৃতা শক্তির অধিকারী ছিলেন। তাঁহাদের জ্বালাময়ী বক্তৃতায় মোসলমান সমাজের মোহনিদ্রা ভঙ্গ হইতেছিল। জনৈক গ্রাম্য কবি তাঁহাদের সম্বন্ধে একটি কবিতা লিখিয়াছিলেন। কবিতাটি এই :

"মুন্সী মেহেরুল্লাহ্ নাম যশোরে মোকাম।
জাহান ভরিয়া যার আছে খোস নাম।
আবেদ জাহেদ তিনি বড়া হুসিয়ার।
হেদায়েতের হাদী প্রাণ দীনের হাতিয়ার।

মুল্লুকে মুল্লুকে ফেরে হেদায়েত লাগিয়া,
হিন্দু খ্রীষ্টান কত লোক ওয়াজ শুনিয়া।
মোসলমান হইল সবে কলেমা পড়িয়া।
অসার অলীক দীন দিল বে ছাড়িয়া।
তার সাথে আর এক ছিল নেককার।
মুন্সী শেখ জমির উদ্দীন গুণের ভাণ্ডার।
সে কোনো জাহেদ সঙ্গ হুসিয়ার হইয়া।
ওয়াজ করিল শুরু এলাহী ভাবিয়া।
এছাহি ওয়াজ হৈল কি কব বয়ান।
হিন্দু মুসলমান শুনি কাঁদিয়া হয়রান।”

রংপুরের একটি বিরাট সভায় মুন্সী সাহেব যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন উহা শুনিয়া তদানীন্তন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় সভা-স্থলে মুন্সী সাহেবের অজস্র প্রশংসা করিয়া আলিঙ্গন করেন। মুন্সী সাহেবের প্রতাপে ও যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতায় খ্রীষ্টান পাদরীগণ স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার রচিত ‘রদ্দে খ্রীষ্টান’, ‘মেহেরুল ইসলাম’, ‘বিধবা গঞ্জনা’, ‘হিন্দুধর্ম রহস্য’ প্রভৃতি পুস্তকাবলী দেশে বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছিল। কবি সিরাজী সাহেবের প্রথম রচনা ‘অনল প্রবাহ’ ও শেখ ফজলুল করিমের ‘পরিত্রাণ কাব্য’ তাঁহারই অর্থ সাহায্যে মুদ্রিত হয়। কয়েকটি সভায় মুন্সী সাহেবের বক্তৃতা শুনিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল।

১৩১০ সালের কথা। আমার ওয়ালেদ মরহুম হাজী উমরদ্দীন চৌধুরী সাহেবের আমন্ত্রণে মুন্সী মেহেরুল্লাহ্ ও শেখ জমিরুদ্দীন সাহেব আমাদের গ্রামের বাড়ীতে আসিয়াছিলেন। সভায় বিরাট জনসমাগম হইয়াছিল। তাঁহাদের অসাধারণ বক্তৃতা শক্তির প্রভাবে স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে একটা নব জাগরণের সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। কবি ইস্মাইল হোসেন সিরাজী সাহেব একাধারে লেখক ও তেজস্বী বক্তা ছিলেন। তাঁহার ‘অনল প্রবাহ’ পুস্তকটি সত্যি সমাজে আগুনের প্রবাহ ছুটাইয়া দিয়াছিল। এইসকল কবি ও সাহিত্যিকগণের মূল্য-বান ও তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ ও উদ্দীপনাময়ী কবিতা উল্লিখিত পত্রিকাগুলিতে ছাপা হইয়া বাহির হইত। ইহাদের সমবেত চেষ্টায় সমাজে নবযুগের আবির্ভাব হইয়াছিল। মোসলমানেরা যেন আত্মসম্বিত ফিরিয়া পাইল। দিকে দিকে প্রাণের

স্পন্দন অনুভূত হইতে লাগিল। প্রবীণ সাংবাদিক মওলানা মনিরুজ্জমান ইস্‌লামাবাদী, মুন্সী শেখ আবদুর রহিম, মওলানা আকরাম খাঁ, মৌলভী মুজিবর রহমান প্রমুখ মনীষীগণ অর্ধ-শতাব্দী পূর্বে দরিদ্র ও হৃতসর্বস্ব মোসলেম সমাজের উন্নতির জন্য যাহা করিয়াছেন সেজন্য জাতি তাঁহাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিবে।

সুদখোর মহাজনদের কথা কিছু বলিয়াছি। এখন জমিদারগণের অত্যাচারের কথা এবং সঙ্গে সঙ্গে আনুষঙ্গিক ঘটনাও কিছু বলিব। তখনকার দিনে জমিদারগণ প্রজাদিগকে মানুষ বলিয়া গণ্য করিত না। জমিদারের কাছারি বাড়ীতে কোন প্রজার উচ্চাসনে বসিবার কোন অধিকার ছিল না। হিন্দু জমিদারগণের এলাকায় মুসলমান প্রজার গরু জবাই নিষিদ্ধ ছিল। পাকা গৃহ-নির্মাণ, পাকা ইঁদারা অথবা পুষ্করিণী খনন করিতে হইলে জমিদারের নজর সেলামী দিয়া হুকুম লইতে হইত। বৃক্ষাদি রোপণ ব্যতীত ছেদন করিতে পারিত না।

একটি সত্য ঘটনার কথা বলিতেছি। দিনাজপুর জেলার জনৈক প্রতাপশালী জমিদার খাজনাবৃদ্ধি তথা প্রজার উপর নাহক জুলুম শুরু করিয়া দিলেন। রাজেন্দ্রলাল গাঙ্গুলী নামক এক কর্মচারী প্রজাদের উপর অযথা অত্যাচার আরম্ভ করিল। প্রজাকে বন্দী করিয়া খাজনা আদায় করা, কথায় কথায় অর্থদণ্ড, জুতামারা, ঘরবাড়ী জ্বালাইয়া দেওয়া, এমনকি স্ত্রীলোকদের শ্লীলতা হানিকর কার্যাদি পর্যন্ত চলিতে লাগিল। জমিদারের কয়েকজন মাতব্বর প্রজা নিজদের হীন স্বার্থসিদ্ধির জন্য এই অত্যাচারমূলক কাজে সাহায্য করিতেছিল। স্থানীয় বিশিষ্ট আলেম মৌলভী আবদুর গফুর ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিখ্যাত ওয়ায়েজ মৌলভী ইউসুফ আলী মাহ্‌মুদী সাহেব সেই অন্ধকার যুগে একটি মাদ্রাসা ও নব-প্রতিষ্ঠিত একটি এম. ই. স্কুল চালাইতেছিলেন। স্কুলটি ধ্বংস করার জন্য জমিদার পক্ষ উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। স্কুলটি চালু থাকিলে ভবিষ্যতে তাহাদের জুলুমের রাজত্ব আর চলিবে না ইহা তাহারা বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

দেশে তখন প্রজা-আন্দোলন চলিতেছিল। বগুড়ার মৌলভী রজিব উদ্দীন তরফদার, ময়মনসিংহের শাহ্ আবদুল হামিদ, কুমিল্লার মোঃ মোখলেসর রহমান প্রভৃতি যুবকগণ এই আন্দোলন পরিচালনা করিতেছিলেন। আমরাও এই আন্দোলনে যোগদান করিয়া জমিদারের অত্যাচারের ঘোর প্রতিবাদ আরম্ভ করি।

গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া প্রজাগণকে সংঘবদ্ধ করিতে থাকি। জমিদার পক্ষ ক্ষেপিয়া উঠিল। কয়েক দফা মিথ্যা ফৌজদারী মোকদ্দমা আমাদের বিরুদ্ধে দায়ের হইল।

[৪]

১৯১৩ সাল। বগুড়া জেলার জয়পুরহাটের নিকট বানিয়াপাড়া গ্রামে 'আঞ্জুমানে ওলামায়ে বাঙ্গালা' নামক একটি সমিতির গঠন উপলক্ষে এক বিরাট জনসভা হয়। বাংলাদেশের বিশিষ্ট আলেম, ফাজেল ও শিক্ষিত ব্যক্তিগণ এই সভায় যোগদান করেন। মওলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁ সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, মওলানা আবদুল্লাহিল বাকী, মৌলভী এফাজ উদ্দীন প্রমুখ বহু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের উপস্থিতিতে এই সভায় জমিদারের প্রজাপীড়নের কাহিনী আমরা বর্ণনা করি। মওলানা আকরাম খাঁন ও ইসলামাবাদী সাহেব সংবাদপত্রে আন্দোলন করার জন্য অত্যাচারের ঘটনাগুলি লিখিয়া নিপীড়িত ব্যক্তিগণের দস্তখত, টিপসহি লইয়া কলিকাতায় তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে বলিলেন। তদনুযায়ী আমি ও মৌলভী ইউসুফ আলী মাহ্‌মুদী সাহেব কতকগুলি দস্তখতী কাগজ লইয়া কলিকাতায় তাঁতী বাগানে মৌঃ এফাজ উদ্দীন সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করি। তাঁতী বাগানে হাজী শেখ আবদুল্লা সাহেবের বাড়ীতে তখন মোহাম্মদী পত্রিকার অফিস ছিল। মওলানা আকরাম খাঁ সাহেব গ্রামের বাড়ীতে চলিয়া যাওয়ায় তাঁহার সহিত দেখা হইল না। আমরা মৌলবী এফাজ উদ্দীন সাহেবকে সঙ্গে লইয়া 'সোলতান' পত্রিকার অফিসে মওলানা ইসলামাবাদী সাহেবের সঙ্গে দেখা করিয়া দস্তখতী কাগজ এক প্রস্ত তাঁহাকে দিলাম এবং 'সোলতান' পত্রিকায় প্রকাশ করিতে অনুরোধ করিলাম। প্রবীণ সংবাদিক মুন্সী শেখ আবদুর রহিম সাহেব তখন 'মোসলেম হিতৈষী' পত্রিকার সম্পাদক। তাঁহাকে আনুপূর্বিক বিবরণ বলিয়া তাঁহার পত্রিকায় প্রকাশ করার জন্য দস্তখতী কপি তাঁহাকেও দিলাম। অতঃপর সঞ্জীবনী পত্রিকার সম্পাদক শ্রীকৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া জমিদারের অত্যাচারের কাহিনী তাঁহাকে শুনাইলাম। এই শুভ্র কেশ, শুভ্র বেশ ও শুভ্রশ্মশ্রুধারী প্রশান্ত পুরুষটি ব্রাহ্মসমাজের নেতা ও বিখ্যাত জননায়ক ছিলেন। আমার অনুরোধ করার পূর্বেই তিনি তাঁহার কাগজে প্রকাশ করিবেন বলিয়া এক কপি চাপিয়া লইলেন। অতঃপর তদানীন্তন মুসলমানদের

একমাত্র ইংরেজী সাপ্তহিক 'দি মোসলমান' পত্রিকার সম্পাদক মৌলভী মুজিবর রহমান সাহেবের খেদমতে হাজির হইলাম। এই চিরকুমার আদর্শকর্মী পুরুষটির খেদমতে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করিয়া এক কপি তাঁহাকেও দিয়া প্রকাশের অনুরোধ করিলাম। মোহাম্মদী অফিসে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম সহকারী সম্পাদক ডাক্তার আবদুল গফুর সিদ্দিকী সাহেব (পরে ডি.লিট. ও অনুসন্ধান-বিশারদ) বসিয়া আছেন। মওলানা সাহেবের অনুপস্থিতিতে তিনি সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করিতেছিলেন। মৌলভী এফাজ উদ্দীন সাহেব তাঁহাকে অত্যাচারের কাহিনী উত্তেজিত ভাষায় জানাইয়া মোহাম্মদী পত্রিকায় তাহার তীব্র আন্দোলন করিতে বলিলেন। যুবক সম্পাদক সিদ্দিকী সাহেব উত্তেজনার বসে এক অগ্নিগর্ভ সম্পাদকীয় মন্তব্য লিখিয়া দিলেন। যথা সময়ে সংবাদপত্রগুলিতে দিনাজপুরের জমিদারের অত্যাচারের কাহিনী প্রকাশিত হইল।

ব্যাপার জানিতে পারিয়া জামদার পক্ষ অতিমাত্রায় বিচলিত হইয়া পড়িল। তাহারা কলিকাতায় ছুটিয়া গেলেন এবং সংবাদপত্র অফিসে গিয়া প্রতিবাদ প্রকাশের জন্য চেষ্টা করিলেন। শ্রদ্ধেয় কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয় আমাকে বলিয়াছিলেন জমিদারের কুকুর আমার দুয়ার পর্যন্ত আসিয়াছিল, কিন্তু তাড়াইয়া দিয়াছি। মোহাম্মদীতে প্রতিবাদ প্রকাশের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা হইয়াছিল। এমনকি, আর্থিক প্রলোভনও ছিল কিন্তু মওলানা সাহেব দৃঢ়তার সহিত উহা প্রত্যাখ্যান করেন। মোহাম্মদী পত্রিকার শৈশব তখনও অতিক্রান্ত হয় নাই। অভাব-অনটনের মধ্য দিয়া পত্রিকাখানি চলিতেছিল। সেরূপ অবস্থায় মোটা আর্থিক প্রলোভন ত্যাগ করা সহজ কথা ছিল না। জমিদার পক্ষের প্রচেষ্টা সফল হইল না দেখিয়া তাহারা মোহাম্মদী পত্রিকার সম্পাদক, মুদ্রাকর ও প্রকাশকের নামে মানহানির মামলা করিবেন বলিয়া নোটিশ দিলেন। নোটিশে বলা হইল যে, জমিদারের উচ্চপদস্থ কর্মচারী বাবু রাজেন্দ্রলাল গাঙ্গুলীর নামে আপনারা মিথ্যা অভিযোগ প্রচার করিয়া তাঁহার সম্ভ্রমের হানি করিয়াছেন। তাঁহার বিরুদ্ধে প্রকাশিত অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। এই মিথ্যা কথা প্রকাশের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা ও ক্ষতিপূরণ আপনাদের করিতে হইবে। অন্যথায় আইন আমলে আসিবেন। নোটিশ পাওয়ার পর তদানীন্তন মোসলেম সমাজের অন্যতম নেতা প্রথিতযশা ব্যারিস্টার মিঃ আবদুল রসুল সাহেবের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া নোটিশের নিম্নরূপ জওয়াব দেওয়া হইল।

যেহেতু মোহাম্মদী পত্রিকার সম্পাদক তাঁহার জ্ঞান ও বিশ্বাস মত যাহা সত্য বলিয়া

জানিতে পারিয়াছেন তাহাই তিনি তাঁহার কাগজে প্রকাশ করিয়াছেন সেইহেতু তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করিতে বা ত্রুটি স্বীকার করিতে রাজী নহেন। জমিদার পক্ষ অতঃপর দিনাজপুরের এস. ডি. ও. সাহেবের কোর্টে মানহানির মামলা দায়ের করিলেন। যথা সময়ে সম্পাদক আকরাম খাঁ, প্রকাশক হাজী আলতাফ হোসেন, মুদ্রাকর মৌলবী আব্বাস আলী সাহেবের নামে সমন আসিল। বলা বাহুল্য এই মামলায় মওলানা সাহেবের কোন দায়িত্ব ছিল না। প্রবন্ধটির লেখক ছিলেন ডাক্তার আবদুল গফুর সিদ্দিকী কিন্তু ন্যায় ও সত্যের মর্যাদা রক্ষাকল্পে তিনি যাবতীয় প্রলোভন অগ্রাহ্য করিয়া সমস্ত দায়িত্ব নিজ স্কন্ধে তুলিয়া লইলেন। এই নিঃস্বার্থপরতা ও চারিত্রিক দৃঢ়তা পরবর্তী জীবনে মওলানা সাহেবকে নেতৃত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল সন্দেহ নাই।

(৫)

মানহানির মামলা

কলিকাতার তাঁতী বাগান নিবাসী হাজী শেখ আবদুল্লার বদান্যতায় তখন মোহাম্মদী পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছিল। এই নিরক্ষর হাজী সাহেব অতি সামান্য অবস্থা হইতে ভাগ্যগুণে লক্ষপতি হইয়াছিলেন। তাঁতী বাগানের মস্‌জিদ ও মাদ্রাসা লক্ষাধিক টাকা ব্যয়ে নির্মাণ করিয়া তিনি ওয়াকফ করিয়া দেন। তাঁহার বাড়ীতে মোহাম্মদী অফিস এবং তাঁহার আলতাফী প্রেস হইতে মোহাম্মদী ছাপা হইয়া বাহির হইত। মওলানা সাহেবের যোগ্য সম্পাদকতায় পরবর্তী কালে ইহাই মুসলমান জাতির মুখপত্ররূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

নির্ধারিত দিনে মাওলানা আকরাম খাঁন, মৌলবী আব্বাস আলী সাহেব ও হাজী আলতাফ হোসেন দিনাজপুর এস ডি. ও. কোর্টে হাজির হইলেন। উত্তর-বঙ্গের অন্যতম জননায়ক মৌলানা আবদুল্লাহিল বাকী মওলানা সাহেবের বিশিষ্ট বন্ধু বলিয়া দিনাজপুরে থাকা খাওয়া ইত্যাদির ব্যয়ভার তিনিই বহন করিতেন। স্থানীয় নামজাদা উকীলগণ জমিদার পক্ষ সমর্থন করায় আমরা অসুবিধায় পড়িলাম। অবশ্য একমাত্র মুসলমান উকীল খান বাহাদুর একিনুদ্দীন আহমদ সাহেব আমাদের পক্ষে ছিলেন। কিন্তু বাদী পক্ষের জাঁদরেল উকীলদের সঙ্গে মুকাবিলা করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইবে বলিয়া আমরা মনে করিতে পারিলাম না। ডাঃ সিদ্দিকীর পরামর্শ-মত কলিকাতা পুলিশ কোর্টের বিখ্যাত উকীল প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক মনোজমোহন বসুকে নিয়োজিত করা স্থির করিলাম। কিন্তু কথা হইল, তাঁহার ন্যায় একজন

প্রথিতযশা সাহিত্যিক ও ব্যবহারজীবী সুদূর মফঃস্বল শহরে লওয়ার মত আর্থিক সংস্থান আমাদের জুটিবে কি না ?

সাহিত্যসেবী হিসাবে ডাক্তার সাহেবের সহিত মনোজবাবুর সৌহার্দ ছিল। সেই ভরসায় আমি, ডাক্তার সাহেব ও মওলানা সাহেব শিয়ালদহ পুলিশ কোর্টে গিয়া মনোজবাবুর সহিত দেখা করিলাম। মামলার আনুপূর্বিক বিবরণ অবগত হইয়া ডাক্তার সিদ্দিকীর বিশেষ অনুরোধে তিনি মামলা চালাইতে রাজী হইলেন। পর পর দুই তারিখ গত হওয়ার পর আসামীদের জবাব দাখিলের দিনে মনোজবাবু দিনাজপুর এস. ডি. ও. সাহেবের কোর্টে আসামী পক্ষে হাজির হইলেন। মওলানা সাহেব জওয়াবে বলিলেন : আমার নাম আকরাম খাঁ। ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাট মহকুমার অধীন হাকিমপুর গ্রামে আমার বাড়ী। বর্তমানে কলিকাতায় হক লেনে থাকি। আমি নিদোষ। অপর দুই জনের পক্ষ হইতেও অনুরূপ জবাব দাখিল হইল। মোহাম্মদী পত্রিকার সহিত আসামীদের সম্পর্কের উল্লেখ না থাকায় ফরিয়াদী পক্ষের জবরদস্ত উকীল ললিতমোহন সেন হুঙ্কার দিয়া উঠিলেন।—আপনি মোহাম্মদীর সম্পাদক সে কথা জবাবে বলেন নি কেন ? বলুন আপনি সম্পাদক কিনা ?

প্রতিবাদে আমাদের উকীল মনোজবাবু বলিলেন—আসামীগণ তাঁহাদের লিখিত জবাব দাখিল করিয়াছেন। আসামীদিগকে তদতিরিক্ত কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার অধিকার বাদীপক্ষের উকীলের নাই। লিখিত বক্তব্যের অতিরিক্ত একটি কথাও তিনি বলিবেন না। কে সম্পাদক, কে মুদ্রাকর উহা আপনাদের প্রমাণ করিতে হইবে।

উভয়পক্ষে তুমুল বিতর্ক শুরু হইল। এস. ডি. ও. সাহেব কোন নির্দেশ দিতেছেন না—বোধহয় তাঁহার কোর্টে এরূপ মামলা আর হয় নাই। মনোজবাবু কলিকাতা হাইকোর্টের বসুমতী, অমৃতবাজার প্রভৃতি পত্রিকার মানহানির মামলার নজীর পেশ করিলেন। বোম্বে ও এলাহাবাদ হাইকোর্টের নজীর উপস্থিত করা হইল। সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া এস. ডি. ও. সাহেব মনোজবাবুর যুক্তি গ্রহণ করিলেন। এই আকরাম খাঁ মোহাম্মদী পত্রিকার সম্পাদক কিনা তাহা প্রমাণের দায়িত্ব বাদী পক্ষের উপরে পড়িল। আইনের ফ্যাকড়ায় মামলার গতি পরিবর্তন হইল।

মওলানা সাহেব আসামী হিসাবে দিনাজপুরে আগমন করিয়াছেন—এ সংবাদ প্রচারিত হওয়ায় প্রতি তারিখে আদালত প্রাঙ্গণে বিপুল জনসমাবেশ হইত। শান্তিরক্ষার জন্য অতিরিক্ত পুলিশের ব্যবস্থা থাকিত। স্থানীয় উকীল-মোক্তারগণ

দর্শক হিসাবে অনেকেই উপস্থিত থাকিতেন। অম্বিকাবাবু নামক তখনকার ছাত্র-বৃত্তি পাস এক বৃদ্ধ মোক্তার আমাদের পক্ষে তদবিরকারক ছিলেন। তাঁহার আইন জ্ঞান কতটা ছিল জানি না। কিন্তু 'দোহাই হুজুর', 'দোহাই ধর্মাবতার' ইত্যাদি চিৎকার করিয়া তিনি বিচারকের মনোযোগ আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিতেন।

বিচারের দিনে কলিকাতা হইতে ডাক্তার সিদ্দিকী ও মৌলবী এফাজ উদ্দীন সাহেব আসামীদের সঙ্গে আসিলেন। মৌলানা বাকী সাহেব ও আমি দলবল সহ উপস্থিত থাকিলাম। অত্যধিক ভীড় ও গোলোযোগের দরুন ফরিয়াদী পক্ষ যদি কোন লোককে সরাইয়া দিত, তক্ষণি অম্বিকাবাবু চিৎকার করিয়া উঠিতেন 'হুজুর দোহাই, হুজুর। আপনি একটু লক্ষ্য করুন হুজুর'। অপর পক্ষকে শুনাইয়া অম্বিকাবাবু বলিতেন—হুজুর ধর্মাবতার, নিশ্চয়ই আমাদের পক্ষে রায় দিবেন। আমরা মোকদ্দমা জিতিয়া যাইব। বৃদ্ধের কথায় সকলেই হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিত। অম্বিকা-বাবুর এইরূপ আচরণের কথা উল্লেখ করার একমাত্র উদ্দেশ্য এই যে, তিনি সত্যি মন প্রাণ দিয়া আমাদের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন।

আদালতের সিদ্ধান্তের পর বাদী পক্ষ হঠাৎ ডাক্তার আবদুল গফুর সিদ্দিকী সাহেবকে সাক্ষী মানিয়া কাঠগড়ায় তুলিলেন। তিনি মামলার তদবিরের জন্য কোর্টে উপস্থিত ছিলেন। বাদী পক্ষের আশা ছিল ডাক্তার সাহেবের সাক্ষীতে এই আকরাম খাঁ মোহাম্মদীর সম্পাদক প্রমাণ হইবে। বাদী পক্ষের কৌশলী অনেক চেষ্টা করিয়াও তাঁহার মুখ হইতে তাঁহাদের অনুকূল জওয়াব বাহির করিতে পারিলেন না। তখন বাদী পক্ষ কলিকাতার কয়েকজন বিখ্যাত সাংবাদিককে সাক্ষ্য মান্য করিলেন। মোহাম্মদীর স্বত্বাধিকারী হাজী শেখ আবদুল্লাহ, সঞ্জীবনী পত্রিকার সম্পাদক বিখ্যাত জননায়ক কৃষ্ণকুমার মিত্র, দৈনিক নায়ক পত্রিকার সম্পাদক হাস্যরসিক শ্রী পাঁচকড়ি বন্দোপাধ্যায়, ইণ্ডিয়ান এম্পায়ার সম্পাদক রাজেন্দ্রনাথ আচার্য প্রভৃতি বিখ্যাত ব্যক্তিগণকে সাক্ষী মানা হইল।

মামলা-সংক্রান্ত ব্যাপারে আমি ও মৌলবী ইউসুফ আলী মাহমুদী সাহেব প্রায়ই কলিকাতায় যাতায়াত করিতাম। সেবার ফজর আলী পণ্ডিত নামক এক গ্রাম্য শিক্ষক আমাদের সঙ্গে কলিকাতায় গেলেন। উৎপীড়িতদের মধ্যে তিনিও ছিলেন একজন। আমরা প্রয়োজন বোধে ব্যারিস্টার রসুল সাহেবের নিকট যাইতাম ও তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতাম। একদিন মওলানা আকরম খাঁ ও 'দি মোসলমান' সম্পাদক মৌলবী মুজিবর রহমান সাহেব সহ আমরা রসুল সাহেবের বাড়ীতে যাই।

তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। রসুল সাহেব বাহিরে কোথাও যাওয়ার জন্য তৈয়ারি হইয়াছেন। আমাদিগকে দেখিয়া আবার তিনি ড্রইং রুমে প্রবেশ করিলেন। বেয়ারা সুইস্ টিপিয়া বিজলী বাতি জ্বালাইয়া দিল। সুমার্জ্জিত ড্রইং রুমটি বিদ্যুৎ আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। পণ্ডিত সাহেব অবাক বিস্ময়ে চারিদিকে তাকাইতে লাগিলেন। দেওয়ালের গায়ে ছাদে কেমন করিয়া এই উজ্জল আলোক ফুটিয়া উঠিল তাহা তিনি ঠাওর করিতে পারিলেন না। মফঃস্বলে তখন বিজলী বাতির প্রচলন হয় নাই। বার বার ফিস ফিস করিয়া আমাকে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন—বাতিটা কি করিয়া জ্বলিয়া উঠিল? এই বিশিষ্ট ব্যক্তির নিকট বসিয়া সরল গ্রাম্য লোকটিকে লইয়া বিব্রত বোধ করিলাম। ইশারায় তখনকার মত তাহাকে নিরস্ত করা গেল। জীবনে এই প্রথম তিনি কলিকাতায় আসিয়াছেন। কলিকাতায় সব-কিছু তাহার নিকট রহস্যপূর্ণ ও বিস্ময়কর মনে হইতেছিল।

[৬]

মামলা-সংক্রান্ত কথাবার্তার পর রসুল সাহেব তাঁহার বিলাত প্রবাসের গল্প আরম্ভ করিলেন। তিনি বলিলেন, আমি কুমিল্লার অধিবাসী। মাত্র ১৬ বৎসর বয়সে বিলাত যাই। আমরা তখন ১৪।১৫ জন ভারতীয় মুসলমান একত্রে অধ্যয়ন করিতাম। একদিন শুনিলাম মুসলমানদের জন্য সেখানে একটি মসজিদ আছে। কৌতুহলী হইয়া অনুসন্ধান করিয়া একদিন তথায় উপস্থিত হইলাম। একটি সাধারণ ঘর। দেখিলাম তথায় ২০।২৫ জন লোক সমবেত হইয়াছেন। সেদিন ছিল শুক্রবার। চেয়ার টেবিল সাজাইয়া নামাজের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। জনৈক দাড়িয়ালা লম্বা কোট ও তুর্কী টুপী পরিহিত প্রৌঢ় ব্যক্তি ইংরাজীতে খোৎবা পাঠ করিলেন। আমরাও তাহাদের সঙ্গে যোগদান করিলাম। সকলেই জুতা ও মোজা পরিহিত অবস্থায় দাঁড়াইয়া টেবিলে সেজদা দিয়া নামাজ আদায় করিলেন। কেরাৎ অবশ্য আরবীতে পড়া হইল। নামাজ অন্তে আমরা ইমাম সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলমে—নামাজ পড়ার এরূপ পদ্ধতি আপনি কোথায় পাইলেন? তিনি গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—তোমরা কোন্ দেশীয় লোক? উত্তরে বলিলাম—ইণ্ডিয়ান। তিনি আমাদিগকে লইয়া একটি নির্জন স্থানে উপবেশন করিয়া বলিলেন, বন্ধুগণ এটা তোমাদের দেশ নয়। এদেশে ইস্লামের নূতন প্রচার হইতেছে। এই প্রচণ্ড শীতের দেশে অনভ্যস্ত জনসাধারণকে বার বার অজু করিয়া ঢিলাঢালা পোশাকে নামাজ পড়িতে বলিলে ইহাদিগকে ইস্লামের দিকে আকৃষ্ট করা সহজ

হইবে না। এখানে কৌশলে কাজ করিতে হইবে। তাই আমি উপাসনার সহজ পদ্ধতির দ্বারা ইস্‌লামের মাহাত্ম্য প্রচার করিয়া ইহাদিগকে আকৃষ্ট করিতে চেষ্টা করিতেছি। যখন ইহারা ইস্‌লামের প্রকৃত সৌন্দর্য উপলব্ধি করিতে পারিবে তখন আপনা হইতেই শরিয়তের উপদেশ পালন করিবে। আগামী দশ বৎসরের মধ্যে দেখিবে এইখানেও তোমাদের দেশের মতই নামাজ আদায় হইতেছে।

বস্তুতঃ ইমাম সাহেবের ভবিষ্যৎ বাণী সফল হইয়াছিল। তিনি হইলেন বিলাতে প্রথম ইস্‌লাম-প্রচারক আমেরিকা-নিবাসী মিঃ আবদুল্লাহ্ কুইলিয়ম। পরবর্তী কালের প্রসিদ্ধ ইংরেজ মুসলিম খালেদ শীলড্রেক, মর্মাডিউক পিকথল, লর্ড হিতলে প্রমুখ ইংরেজ মনীষীরা তাঁহারই ধর্মপ্রচারের ফলে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। আজ ইংলণ্ড ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ইস্‌লাম প্রচারের চেষ্টা হইতেছে। বিভিন্ন স্থানে মসজিদ স্থাপিত হইয়া তৌহিদের জয় ঘোষণা করিতেছে। দূরদর্শী মনীষী আবদুল্লা কুইলিয়মের সাধনা জয়যুক্ত হইতে চলিয়াছে। বিলাতে ইস্‌লাম প্রচারের মনোজ্ঞ বিবরণ রসুল সাহেবের মুখে শ্রবণ করিয়া অলক্ষে কুইলিয়াম সাহেবের প্রতি কৃতজ্ঞতায় আমাদের মনপ্রাণ ভরিয়া উঠিল।

মানহানির মামলার কথা বলিতে গিয়া আনুষঙ্গিক দু-একটি কৌতুকপ্রদ ঘটনার কথা না বলিয়া পারিতেছি না। একদিন বর্ধমান জেলার কলস্থম গ্রাম নিবাসী মোহাম্মদী জামাতের বিখ্যাত পীর মওলানা নেয়ামত উল্লাহ্ সাহেব মোহাম্মদী অফিসে আসিলেন। ইনি ছিলেন মওলানা আকরাম খাঁ সাহেবের উস্তাদ। বয়স বার্ধক্যের সীমা অতিক্রম করিয়াছে। অফিস টেবিলে মওলানা আবুল কালাম আজাদ সাহেব সম্পাদিত 'আল হেলাল' পত্রিকা মোড়ক করা অবস্থায় ছিল। পীর সাহেব মোড়ক খুলিয়া ফেলিলেন। দেখিলেন প্রথম পৃষ্ঠাতে কতকগুলি মানুষের ফটো মুদ্রিত হইয়াছে। উহা দেখিয়া পত্রিকাখানা আবার তাড়াতাড়ি মোড়ক করিয়া ফেলিলেন। অতঃপর মওলানা সাহেবকে ডাকিয়া বলিলেন—আকরাম খাঁ, শুনিয়াছিলাম মওলানা আবুল কালাম আজাদ একজন জবরদস্ত আলেম, তবে তাঁহার পত্রিকায় মানুষের তছবীর ছাপান হইল কেন? বলা বাহুল্য, ছবিগুলি ছিল কানপুরের মসজিদ ভাঙ্গার জন্য হিন্দু-মুসলমানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় আহত কতিপয় মুসলমানের ছবি। মওলানা সাহেব কানপুরের মসজিদ ভাঙ্গার কাহিনী পীর সাহেবকে শুনাইলেন। হিন্দুগণ কর্তৃক দাঙ্গায় আহত মুসলমানগণের পক্ষে মামলা মোকদ্দমায় অজস্র অর্থ ব্যয় হইতেছে। তজ্জন্য দুস্থ, আহত মুসলমানগণকে অর্থ সাহায্য করা প্রয়োজন। কাগজে

প্রকাশিত তছবীরগুলি সেই দাঙ্গার আহত মুসলমানদিগের। জনসাধারণকে উত্তেজিত করিয়া চাঁদা সংগ্রহের জন্য ফটোগুলি ছাপান হইয়াছে। সদুদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোন কারণে এই ছবিগুলি ছাপান হয় নাই। এবার পীর সাহেব পুনরায় পত্রিকাখানা খুলিয়া মনোযোগ সহকারে তাহা পড়িতে লাগিলেন।

পীর সাহেব সহ একত্রে মধ্যাহ্ন ভোজনে বসিয়াছি। পীর সাহেব আমার পাশে এবং মওলানা আকরাম খাঁ সাহেব সম্মুখের দিকে বসিয়াছেন। সেদিন শুক্রবার ছিল। জুম্মার পূর্বে আহার শেষ করিতে হইবে। আমি আহারে মনোনিবেশ করিয়াছি। অকস্মাৎ মস্তকে কিসের স্পর্শ অনুভব করিলাম। ফিরিয়া দেখি পীর সাহেব বাম হস্তে আমার মাথার চুল সম্মুখে ও পশ্চাতের দিকে টানিয়া হ্রস্ব দৈর্ঘ্যের পরিমাণ করিতেছেন। চুল সামনের দিকে কিছুটা লম্বা ও পিছনের দিকে খাট করিয়া ছাটা ছিল। আমি তখন ২৩।২৪ বৎসরের যুবক। পীর সাহেব বলিলেন—বাবা, তুমি বেদাতী চুল কাটিয়াছ কেন? ইহা নাজায়েজ। আমি কোন জবাব না দিয়া নীরবে আহার করিতে লাগিলাম। আকরাম খাঁ বলিলেন—হানাফী জামাতের লোক, তাতেও আবাব যুবক। সুতরাং ছোট খাটো বেদাতে উহারা ততটা খেয়াল করে না। পীর সাহেব চরম বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিলেন—হানাফী জামাতের লোক! আবার তোমার সহিত খাতিরও বেশ দেখিতেছি, কেমন করিয়া এই সম্পর্ক হইল? আহার শেষ হইয়াছিল। মস্‌জিদে আজান পড়িয়াছিল। কাজেই প্রসঙ্গটি ঐ পর্যন্ত ছেদ পড়িয়া রহিল।

নমাজ শেষ হওয়ার পর মস্‌জিদে স্থানীয় মৌলবী মওলানাগণ পীর সাহেবের সহিত বসিয়া আলাপ করিতেছিলেন। আমার সহকর্মী মৌলবী ইউসুফ সাহেব পান খাইয়া মুখে জর্দা ফেলিলেন। পীর সাহেব উহা লক্ষ্য করিয়া বিরক্তি সহকারে বলিলেন—আপনি একজন আলেম মানুষ। আপনি হারাম জিনিস খান এ কেমন কথা? জর্দা, তামাক প্রভৃতি নেশার জিনিস বিলকুল হারাম। স্বনামখ্যাত আলেম মৌলবী একাজউদ্দীন সাহেব তথায় উপস্থিত ছিলেন। আহলে হাদিস জমাতে 'বাহাছী' মৌলবী বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল। ইউসুফ সাহেব তাঁহাকে দেখাইয়া বলিলেন—জর্দা শুধু আমিই খাই না, অনেক মৌলবী সাহেব খাইয়া থাকেন। যেমন এই মৌলবী একাজউদ্দীন, তিনি ত জর্দা খান। জলন্ত আগুনে যেন ঘৃতাহুতি পড়িল। উর্দুভাষী একাজউদ্দীন সাহেব তৎক্ষণাৎ দাঁড়াইয়া বলিলেন—'কভি নেহী', জর্দা কভি হারাম নেহী হো সাক্‌তা। পীর সাহেব শুইয়া ছিলেন, উত্তেজিতভাবে

উঠিয়া বলিয়া উঠিলেন—'আলবৎ হারাম হায়। তুমুল কলহ আরম্ভ হইল। স্থানীয় মৌলবী মওলানাগণ কেহ পীর সাহেবের পক্ষ, কেহ মৌলবী এক্কাজউদ্দীন আহ্‌মদের পক্ষ অবলম্বন করিলেন। বহু লোক মস্‌জিদে জমা হইয়া গেল। তাড়াতাড়ি সংবাদ দিয়া মিছরীগঞ্জ কলুটোলার আহলে হাদিস জমাতের মৌলবী সাহেবগণকে আনান হইল। সকলের পরামর্শ মত মেটিয়াবুরুজ হইতে জনৈক বিচক্ষণ মৌলবী সাহেবকে আনয়ন করিয়া তাঁহার উপর মীমাংসার ভার দেওয়া হইল। তুমুল হট্টোগোলের মধ্যে মস্‌জিদে বসিয়াও আছরের নামাজ কাজা হইল। মধ্যস্থ মওলানা সাহেব দুই পক্ষের বক্তব্য শুনিলেন। তারপর পান ও জর্দা খাইয়া মীমাংসায় বসিলেন। মওলানা সাহেব জর্দা কখনো হারাম নহে নানা যুক্তি তর্কের দ্বারা বর্ণনা দিয়া এই বিতর্কের অবসান ঘটাইলেন।

(৭)

এইবার মামলার কথা বলি। বিপক্ষের সাক্ষিগণ দিনাজপুরে সাক্ষী দিতে যাইবেন এইজন্য তাঁহাদের সহিত দেখা করিয়া আমাদের অনুরোধ জ্ঞাপন করা উচিত বলিয়া মনে করিলাম। নায়ক পত্রিকার সম্পাদক পাঁচকড়ি বাবুর সহিত দেখা করিলে তিনি বলিলেন,—ভায়া এটা জ্যৈষ্ঠ মাস। আমের মৌসুম। দিনাজপুরের গোপালভোগ প্রসিদ্ধ। সুতরাং উহা উপভোগের জন্য দিনাজপুরে যাইতেই হইবে। সাক্ষীর জন্য নহে। রসনা তৃপ্তির জন্য এ সুযোগ হারান চলিবে না। শ্রদ্ধেয় কৃষ্ণকুমার বাবুর সহিত দেখা করিলে তিনি বলিলেন—বৃদ্ধ বয়সে অন্যায়ের পক্ষ অবলম্বন করিতে কৃষ্ণকুমার মিত্র কখনই দিনাজপুরে যাইবে না। কৃষ্ণকুমার বাবু তাঁহার কথা রাখিয়াছিলেন। বাদী পক্ষ তাঁহার নামে ওয়ারেণ্ট দিয়াও তাঁহাকে দিনাজপুর কোর্টে হাজির করিতে পারেন নাই। প্রধান সাক্ষী হাজী শেখ আবদুল্লাহ্‌ বৃদ্ধ ও অসুস্থ বলিয়া তিনি কোর্টে হাজির হন নাই।

নায়ক পত্রিকার সম্পাদক পাচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় তখনকার দিনে সংবাদপত্র জগতে একজন দিকপাল ছিলেন। কলিকাতা হইতে প্রকাশিত প্রসিদ্ধ পত্রিকাগুলির মধ্যে কয়েকটির সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। হাস্যরস পরিবেশনে তাহার পারদর্শিতা ছিল সর্বজনবিদিত। তিনি নির্দিষ্ট দিনে দিনাজপুরের এস. ডি. ও. কোর্টে হাজির হইলেন। বৃদ্ধ সম্মানিত ব্যক্তি বলিয়া এস. ডি. ও. সাহেব কোর্টে

চেয়ারে বসিয়া সাক্ষী দিতে অনুমতি দিলেন। পাঁচকড়ি বাবু তাঁহার কথা রক্ষা করেন নাই। তিনি সাক্ষী দিতে গিয়া বলেন—এই আকরাম খাঁ-ই মোহাম্মদীর সম্পাদক। আমি ইহাকে বিশেষরূপে চিনি ও জানি। বুঝিলাম, গোপালভোগের মিষ্ট মধুর আস্বাদন ব্যতীত অন্য কোন কিছু তাঁহাকে সংকল্পচ্যুত করিয়াছে। আমাদের উকীল জেরা করিতে গিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—দেখুন আপনার একটা উপনাম আছে, আপনি জানেন কি ?

সাক্ষী (বিস্ময় প্রকাশ করিয়া)—উপনাম ? সে কি হে ? আমি উপনদী, উপদ্বীপ উপসাগর প্রভৃতি বাংলা শব্দের সহিত পরিচিত। কিন্তু নামের যে একটা 'উপ' হয় তাহা ত শুনি নাই। এটা কি তোমার নূতন আবিষ্কার ? উকীল—আপনি উপদ্বীপ, উপনদী ইত্যাদি জানেন তবে উপনাম না জানার কোন কারণ দেখা যায় না। আমরা সচরাচর আপনাকে যে নামে ডাকিয়া থাকি উহা কি ? সাক্ষী—ও হোঃ—তোমরা যে আমাকে 'পাঁচুদা' বলিয়া ডাক, উহাই বুঝি আমার উপনাম। বেশ আমি তা' স্বীকার করিতেছি। তাহাতে তোমার কি লাভ হইবে ? উকীল—সেটা পরের কথা। আপনি কি মোহাম্মদী অফিসে কোন দিন গিয়াছেন ?

সাক্ষী—না।

উকীল—এই আকরাম খাঁকে আপনি কি এডিটারি করিতে দেখিয়াছেন ?

সাক্ষী—না। তবে আমি জানি উনি সম্পাদক। উকীল—ও, আপনার শোনা কথা। এই আকরাম খাঁ-ই যে সম্পাদক তাহার প্রমাণ কি ? কলিকাতায় কি আকরাম খাঁর অভাব আছে ?

সাক্ষী পাকা উকীলের জেরায় খেই হারাইয়া ফেলিলেন। জেরার মুখে তাঁহার চরিত্রের উপর কোন অবাঞ্ছিত ঘটনার কথা প্রকাশ পাওয়ার কারণ ঘটিতে পারে ভাবিয়া তিনি আর কিছু বলিবেন না বলিয়া তাড়াতাড়ি সরিয়া পড়িলেন।

তারপর ইণ্ডিয়ান এম্পয়ার সম্পাদক রাজেন্দ্রলাল আচার্য সাক্ষী দিতে উঠিলেন। তিনিও পূর্বোক্ত সাক্ষীর ন্যায় এই আকরাম খাঁকে মোহাম্মদীর সম্পাদক বলিয়া উক্তি করিলেন। কিন্তু জেরার মুখে ইঁহাকেও নাজেহাল হইতে হইল। মোট চার জন সাক্ষীর পর মোকদ্দমার আবার দিনান্তর ধার্য হইল। সাক্ষী হাজী শেখ আবদুল্লাহ্ ও কৃষ্ণকুমার মিত্র হাজির না হওয়ায় তাঁহাদের নামে ওয়ারেণ্ট দেওয়া হইল।

মাস খানেক পর আবার মামলার দিন ধার্য হইল। হাজী শেখ আবদুল্লার পক্ষে কোর্টে অনুপস্থিতির কারণ দর্শাইবার জন্য কলিকাতা হাইকোর্টের বিখ্যাত ব্যারিস্টার

অশ্বিনীকুমার চক্রবর্তী দিনাজপুরে আসিলেন। তখনকার দিনে মফঃস্বল কোর্টে হাইকোর্টের ব্যারিস্টারের আগমন একটা অভাবনীয় ব্যাপার ছিল। প্রায় তিন-চার হাজার লোক মামলার আর্গুমেণ্ট শুনিবার জন্য আদালতে হাজির হইল। ব্যারিস্টার সাহেব এস. ডি. ও. সাহেবকে সম্বোধন করিয়া গুরুগম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন—হাজী শেখ আবদুল্লা ৬৫ বৎসরের বৃদ্ধ। বর্তমানে তিনি অত্যন্ত অসুস্থ। সুদূর দিনাজপুরে আসিয়া তাঁহার পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়া সম্ভব নহে। ডাক্তারের সার্টিফিকেট দাখিল করা সত্ত্বেও এই সম্মানিত অসুস্থ বৃদ্ধকে ওয়ারেণ্ট দেওয়া বাদী পক্ষের দুষ্ট মনোবৃত্তি ব্যতীত আর কিছু নহে।

হাজী সাহেব একজন কোটিপতি। কলিকাতায় তাঁহার ১৪টি বিরাট বাড়ী আছে। ২৫ হাজার টাকা তিনি মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স দিয়া থাকেন। তাঁহার ইনকাম ট্যাক্সের পরিমাণ প্রায় ৬০ হাজার টাকা। তিনি বৃদ্ধ ও অসুস্থ। আমার প্রার্থনা—সাক্ষীর তালিকা হইতে হাজী সাহেবের নাম বাদ দেওয়া হউক।

অতঃপর কৃষ্ণকুমার মিত্র সম্বন্ধে বলিলেন, তিনি বৃদ্ধ ও দেশবরেণ্য নেতা। তাঁহাকে কে-না জানেন। সম্প্রতি দামোদর নদে ভীষণ প্লাবনে বিপন্ন জনসাধারণকে সাহায্য দান করিতে তিনি দলবলসহ বর্ধমানে চলিয়া গিয়াছেন। এক অত্যাচারী জমিদারের পক্ষে অন্যায় সাক্ষ্য দেওয়ার অপেক্ষা অগণিত দুস্থ নরনারীর সেবা করা মহৎ কর্তব্য বলিয়া তিনি মনে করেন। জমিদার পক্ষের ধৃষ্টতার ক্ষমা নাই। তাঁহার নামেও ওয়ারেণ্ট দেওয়া হইয়াছে। আমার অনুরোধ উঁহারও নাম সাক্ষীর তালিকা হইতে কাটিয়া দেওয়া হউক। এস. ডি. ও. সাহেব তাহাই করিলেন। অতঃপর আরো কয়েক জনের সাক্ষ্য লওয়া হইল। উকীলের জেরায় তাহারাও তালগোল পাকাইয়া ফেলিল। অবশেষে মামলার রায়ে আসামীরা নির্দোষ হিসাবে খালাস পাইয়াছিলেন।

জমিদার পক্ষ নাছোড়বান্দা। তাঁহারা কলিকাতা হাইকোর্টে আপিল করিয়াছিলেন। পাঁচ-ছয় মাস পর জাস্টিস হাসান ইমাম ও চাপ্‌ম্যান সাহেবের এজলাসে আপিলের শুনানি হয়। ব্যারিস্টার আবদুর রসুল ও মৌলবী এ. কে. ফজলুল হক আমাদের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন। আপিল ডিস্‌মিস হইয়া সাবেক রায় বহাল থাকে। এই মামলার ফলাফল লইয়া সাময়িক পত্রিকাগুলিতে যথেষ্ট আলোচনা হইয়াছিল। বহু অত্যাচারী জমিদার দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। প্রজা-আন্দোলনকারীরাও যথেষ্ট প্রেরণা পাইয়াছিলেন।

ধর্মসভায় গণ্ডগোল

১৯১৪ সালে মালদহ জেলায় দাদন চক গ্রামে একটি বিরাট ধর্মসভার অধিবেশন হয়। দক্ষিণ মালদহের এম. পি. এ. দাদন চক হাইস্কুল ও কলেজের প্রতিষ্ঠাতা কর্মবীর মোঃ ইদ্রিস আহম্মদ বি.এ. সাহেবের আমন্ত্রণে আমার আত্মীয় কফিলউদ্দীন মিয়াকে লইয়া উক্ত সভায় যোগদান করি। মওলানা আবদুল্লাহিল বাকী সাহেব এই সভায় যোগদান করিবেন বলিয়া কথা ছিল। কিন্তু তিনি বিশেষ কোন কারণে যাইতে পারেন নাই। ইদ্রিস আহ্‌ম্মদ তখন রাজশাহী কলেজের ছাত্র। মধ্যে মধ্যে সংবাদপত্রে তাহার লেখা দেখিতাম, আমার একটু ঐ অভ্যাস ছিল। বিশেষ করিয়া শ্রদ্ধেয় শেখ জমিরুদ্দীন বিদ্যাবিনোদ সাহেবের আমরা উভয়ে স্নেহের পাত্র ছিলাম। পরিচয়ের সূত্র ইহাই। দেখাসাক্ষাৎ না হইলেও চিঠিপত্রের মধ্য দিয়া আমাদের ভাবের আদান-প্রদান চলিত। একটা বিরাট সভায় যোগদানের আমন্ত্রণ, বিশেষ করিয়া অচেনা বন্ধুর সহিত প্রথম সাক্ষাতের আনন্দ আমাকে উৎফুল্ল করিয়া তুলিল। আমরা মালদহ পৌঁছিয়া তৎকালীন প্রসিদ্ধ সমাজসেবক মোক্তার আবদুল গণি সাহেবের আতিথ্য গ্রহণ করিলাম। মোক্তার সাহেবের সঙ্গে পূর্বে পরিচয় ছিল। জয়পুর হাট ওলামা কনফারেন্সে তাঁহার সহিত প্রথম সাক্ষাত হয়। তিনি অত্যন্ত কর্মঠ ও সহৃদয় ব্যক্তি ছিলেন। অতি প্রত্যূষে মালদহ হইতে ষ্টীমার যোগে মহানন্দা নদী দিয়া ভোলাহাট নবাবগঞ্জ বারঘরিয়া প্রভৃতি মালদহের প্রসিদ্ধ স্থানগুলি অতিক্রম করিয়া বেলা প্রায় ৪টার সময় মহানন্দার মোহনায় পৌঁছাই। গন্তব্যস্থল তথা হইতে প্রায় ১৪ মাইল দূরে। শুনিলাম আমাদের জন্য গরুর গাড়ী আসিয়াছিল, কিন্তু যথাসময়ে পৌঁছিতে না পারায় উহা ফেরত চলিয়া গিয়াছে। এই যাত্রাপথে আহারের কোন সুযোগ সুবিধা না থাকায় সারাদিন আমাদিগকে অভুক্ত অবস্থায় থাকিতে হইয়াছে। আমার কিশোর বন্ধুটির জীবনে এই প্রথম প্রবাস। তাহার শুষ্ক মুখের দিকে তাকাইয়া বড় দুঃখ হইল, কিন্তু উপায় কি? ষ্টীমার স্টেশন নাম মাত্র একটি কুঁড়ে ঘর। দোকানপশার তো দূরের কথা নিকটে লোকজনের বসতি পর্যন্ত নাই।

অগ্রহায়ণের প্রথম সপ্তাহ। শীত পড়িয়াছে। আমরা নিকটে একটি গ্রামে গো গাড়ীর চেষ্টায় গিয়া জনৈক গৃহস্থের বাটিতে উঠিলাম। বাড়ীর মালিক স্নেহপ্রবণ এক বৃদ্ধ আমাদিগকে দেখিয়া বলিলেন—বাবা, তোমাদের ত আহার হয় নাই। চেহারা দেখিয়াই বুঝিতেছি। বৃদ্ধ আমাদিগকে যত্নের সহিত আহার করাইয়া গো

গাড়ী যোগে সভাস্থলে রওনা হইলেন। গাড়ী ভাড়া আমরা যাহা দিব তাহাতে তিনি সন্তুষ্ট হইবেন। আজ প্রায় ৫০ বৎসর পরে এই সরল গ্রাম্য লোকটির কথা স্মরণ করিয়া শ্রদ্ধায় মন ভরিয়া উঠিতেছে। ভোরে আমরা দাদন চক পৌঁছিলাম। মওলানা মোঃ আকরাম খাঁ, মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, মৌলবী ফজলে রহমান নেজামী, সুফি মধুমিঞা প্রভৃতি নেতৃবর্গের সহিত সাক্ষাৎ হইল। বন্ধু ইদ্রিস আহম্মদ জড়াইয়া ধরিলেন। আলিঙ্গন ও প্রীতিসম্ভাষণের পর নাস্তা করিয়া আমরা বিশ্রাম লইতে লাগিলাম। বৈঠকখানায় প্রায় ২০।২৫ জন মৌলবী মওলানা উপস্থিত ছিলেন। বৈকালে সভা আরম্ভ হইল ; বিরাট জনসমুদ্র। প্রায় ২০ হাজার লোকের সমাগম ; ২।৩ শত মৌলবী মওলানা ছিলেন। মওলানা আকরাম খাঁ সাহেব সভাপতি হইলেন। সুফি মধুমিঞা ওরফে ময়জুদ্দীন আহম্মদ সাহেব হযরত রসুলে করিমের (দঃ) জীবনী আলোচনা করিতে যাইয়া কাঁদিয়া অস্থির হইলেন। তাহাকে ধরাধরি করিয়া সভার বাহিরে লইয়া যাওয়া হইল। কিছুক্ষণ পর তিনি সুস্থ হইয়া আমার সহিত সমাজ সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা করিতে লাগিলেন। মুসলমান সমাজকে লক্ষ্য করিয়া তিনি আমাকে দুঃখের সহিত বলিলেন—মুসলমান সমাজ আমাদের মর্যাদা বুঝিল না। আমরা সমাজের জন্য কতখানি ত্যাগ স্বীকার করিয়াছি কেহই তাহা উপলব্ধি করিল না। আমরা যদি হিন্দুসমাজে জন্মগ্রহণ করিতাম, তাহা হইলে আমাদের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হইত। আমাদের কর্মজীবনের ইতিহাস রচিত হইত। কিন্তু হায়! দুর্ভাগ্য সমাজ আমাদিগকে চিনিল না। তাঁহার এই খেদোক্তি চিরকাল আমার স্মরণ থাকিবে। যে-সমস্ত অক্লান্ত কর্মীর প্রাণপাত পরিশ্রমে সাধারণ মৃত সমাজে পুনর্জীবন লাভ হইয়াছে তাহাদের উপযুক্ত মর্যাদা আজও আমরা দিতে পারি নাই। ইহা আমাদের পক্ষে লজ্জার কথা।

সভার কার্য চলিতেছে। বন্ধু ইদ্রিস মিঞা আমাকে সঙ্গে লইয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে বাসায় আসিলেন। মেহমানদের রাত্রির আহারের ব্যবস্থা করিতে হইবে। বৈঠকখানার আসিয়া দেখিলাম ১০।১৫ জন মৌলবী বসিয়া আছেন। ইহারা মোহাম্মদী জামাতের আলেম। সভা শেষ হইবার পূর্বেই চলিয়া আসিয়াছেন। ক্রমশঃ ২।১ জন করিয়া আরও আসিতে লাগিলেন। এই সময় বহরমপুর কলেজের আরবী ভাষার অধ্যাপক মিশরের সুবিখ্যাত জামে আজহারের ডিগ্রি প্রাপ্ত জনাব মওলানা মাহ্‌মুদ সাহেব সভাস্থল হইতে তথায় উপস্থিত হইলেন। ইদ্রিস মিঞা ইহার ছাত্র ছিলেন। ভদ্রলোকের অপরাধের মধ্যে দাড়ি কিছু ছাঁটা ছিল। রাজশাহী জেলার জনৈক লম্বা

চুল দাড়ি ও পাগড়ী-পরা এক মৌলবী মওলানা মাহ্‌মুদ সাহেবকে বলিল—তুমি একজন মৌলবী হইয়া দাড়ি ছাঁটিয়াছ কেন? কাফের কোথাকার! তোমাকে মৌলবী বলে কোন্ আহম্মক?

আমরা ত শুনিয়াই অবাক! কোন শিক্ষিত ভদ্রলোককে যে জনসমক্ষে কেহ অহেতুক ঐরূপ অসম্মান করিতে পারেন ইহা কল্পনার অতীত। বেচারা মাহ্‌মুদ সাহেব কিছু বলিতে চেষ্টা করিতেছিলেন কিন্তু মূর্খ মৌলবী এরূপ অভদ্র ভাষায় তাঁহাকে গালাগালি করিতে লাগিল যে ভদ্রলোক বৈঠকখানা পরিত্যাগ করিয়া মস্‌জিদে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। আমরা অত্যন্ত মর্মাহত হইয়াছিলাম। কয়েকজন মৌলবীকে দেখিলাম মূর্খ মৌলবীকে সমর্থন করিতেছে। আমি উত্তেজিতভাবে এই ইতরামির প্রতিবাদ করিতেছিলাম। ইতিমধ্যে মওলানা আকরাম খাঁ ও ইসলামাবাদী প্রমুখ কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি তথায় উপস্থিত হইলেন, এবং ঘটনা শুনিয়া যারপরনাই মর্মাহত হইলেন। মওলানা আকরাম খাঁ সাহেব হজরত পয়গম্বর সাহেব, ইহুদী, খ্রীষ্টান এমনকি কাফেরদের সঙ্গে কিরূপ ভদ্র ব্যবহার করিয়াছিলেন পবিত্র কোর্‌আন শরীফের নির্দেশ কি বিশেষরূপে বুঝাইয়া দিলেন। মওলানা মাহ্‌মুদ সাহেবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া তাঁহাকে মস্‌জিদ হইতে না আনিলে তাঁহারা অভুক্ত রহিবেন বলিয়া মত প্রকাশ করিলেন। আমি ও ইদ্রিস আহমদ সাহেব মস্‌জিদে গিয়া অনেক অনুরোধ করিয়া তাঁহাকে লইয়া আসিলাম। মওলানা আকরাম খাঁ এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ দুঃখ প্রকাশ করিয়া মূর্খ মৌলবীকে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে বলিলেন। কথায় বলে "মূর্খস্য লাঠ্যৌষধি"। ক্ষমা প্রার্থনা দূরের কথা মূর্খ মৌলবী পুনরায় ভীষণ উত্তেজিত হইয়া মওলানা মাহ্‌মুদ সাহেবকে গালাগালি করিতে লাগিল। পুনরায় অপমানিত ও লাঞ্ছিত হইয়া মাহমুদ সাহেব আবার মস্‌জিদে চলিয়া গেলেন। মওলানা আকরাম খাঁ ও ইসলামাবাদী প্রমুখ কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা তখনই কলিকাতা চলিয়া যাইবার সংকল্প করিলেন। মহা বিভ্রাট আরম্ভ হইল, কেহই কাহার কথা শুনিতেছেন না, বিষম গণ্ডগোল চলিতেছে; ঠিক এই সময় চৌধুরী লুৎফর রহমান নামক একজন প্রভাবশালী স্থানীয় জমিদার তথায় উপস্থিত হইলেন। ভদ্রলোকের চেহারাও যেমন বিরাট, তাঁহার সঙ্গের চাপরাসীটিও তদনুরূপ। তিনি ঘটনার বিষয় অবগত হইয়া তৎক্ষণাৎ চাপরাসীকে হুকুম দিলেন 'ও বদমাশকো পাকড় কর দশ জুতি লাগাও, যাও আভি যাও।' তাঁহার এ বজ্রগম্ভীর স্বর ও ভীষণ মূর্তি দেখিয়া সকলেই স্তব্ধ হইয়া গেলেন। সমস্ত

গোলমাল আপনা হইতে থামিয়া গেল। চাপরাসী গোঁপে তা দিয়া দাঁড়াইয়া উঠিতেই মূর্খ মৌলবী ছুটিয়া আমার ও ইদ্রিস মিঞার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। জোড়হস্তে সকলের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিল। এই বাহাদুরী বীরের অবস্থা দেখিয়া আমরা হাসিব না কাঁদিব বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। অবশেষে সকলের অনুরোধে চাপরাসীর নাগরা জুতার কবল হইতে অব্যাহতি হইল বটে কিন্তু নিজের নাক কান মলিয়া তওবা করিয়া মামুদ সাহেবের পা ধরিয়া মার্জনা ভিক্ষা করিতে হইল। নেতাদের ওয়াজ নছিহত যেখানে কার্যকরী হইল না, চাপরাসীর নাগরা জুতা মুহূর্তে তাহা সাধন করিল। পরদিন মূর্খ মৌলবীকে আর দেখা যায় নাই।

(৮)

স্বাধীনতা আন্দোলন

প্রায় আটশত বৎসর দোর্দণ্ড প্রতাপে ভারতের উপরে শাসনদণ্ড পরিচালনা করিয়া বিলাসিতার ও আত্মকলহের ফলে মুসলমানগণ রাজ্যহারা হইলেন। এ বেদনা তাঁহারা বুঝিতে পারেন নাই। তাই স্বাধীনতা পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য সমগ্র ভারতে ও ভারতের বাহিরেও তাঁহাদের চেষ্টার অন্ত ছিল না। সৈয়দ জামালুদ্দীন আফগানী, সুফী আবদুদ্ প্রমুখ মনীষিগণের প্যান-ইসলামিক আন্দোলন, সৈয়দ আহম ব্রেলবী, ইসমাইল হোসেন শহীদ প্রভৃতি মুজাহিদগণের সশস্ত্র বিদ্রোহ ও বালাকোর্টের যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জন মুসলমানদের স্বাধীনতার ইতিহাসে স্বাক্ষর বহন করিতেছে।

১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে বেইমান মুনাফেকদের ষড়যন্ত্রে স্বাধীনতার অগ্রদূত নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে নিহত করিয়া ইংরেজ বণিক দেশের মালিক হইয়া বসিলেন। মুক্তিপাগল মুসলমানগণ তখনও পরাজয়ের গ্লানি ভুলিতে পারেন নাই। সৈয়দ নেসার আহ্‌মদ ওরফে তীতুমীর তাঁহার হাজার হাজার অনুচরসহ শহীদ হইলেন। স্বাধীনতা-হরণকারী ইংরেজ জাতির প্রতি বিদ্বেষবশতঃ মুসলমানগণ ইংরাজী শিক্ষাকেও বর্জন করিলেন। হিন্দুগণ ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণ করিয়া ক্রমশঃ আত্মচেতনা লাভ করিতে লাগিলেন। তখন ইংরেজ সরকার তাঁহাদের অনুকূলে সর্বভারতীয় একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠনের কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন। মিঃ এলেন অক্টেভিয়াস্ হিউম নামক একজন অবসরপ্রাপ্ত ইংরেজ সিভিলিয়ান তদানীন্তন বড়লাট লর্ড ডাফরিনের সঙ্গে

পরামর্শ করিয়া হিন্দু নেতাগণকে ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠনের পরামর্শ দেন। তদনুযায়ী উক্ত প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়।

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ২৮শে ডিসেম্বর বোম্বাই নগরে বিখ্যাত ব্যারিস্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে নবগঠিত ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতির প্রথম অধিবেশন হয়। অতঃপর প্রতি বৎসর ডিসেম্বর মাসের শেষভাগে ভারতের বিভিন্ন স্থানে কংগ্রেসের অধিবেশন হইয়া আসিতেছে। সরকারের দুয়ারে আবেদন-নিবেদনের ডালি লইয়া ধর্ণা দেওয়াই তখন কংগ্রেসের উদ্দেশ্য ছিল। একদল যুবক উহা পছন্দ করিত না। ক্রমশঃ একটি প্রবল বিরোধী দলও গড়িয়া উঠিল। অবশেষে ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে সুরাটের কংগ্রেস অধিবেশনে তুমুল বাদানুবাদের পর পুরাতন দলকে হটাইয়া দিয়া নব্যদল কংগ্রেস দখল করিয়া বসে। কংগ্রেসের মাধ্যমে আবেদন-নিবেদনের পালাও এইখানেই শেষ হয়। সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠানরূপে দাঁড় করাই-বার জন্য হিন্দু ও পার্শী নেতাগণ ব্যতীত নবাব সৈয়দ মহাম্মদ রহিমতুল্লা দিয়ানী, বদরুদ্দীন তাইয়েবজী প্রভৃতি মুসলমান নেতাগণকেও কংগ্রেসের সভাপতি করা হইয়াছিল।

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হয়। মুসলমানদের খলিফা তুরস্কের সুলতান ইংরেজ জাতির বিপক্ষে জার্মানীর সঙ্গে যোগদান করে। দক্ষিণ আফ্রিকায় কার্য উপলক্ষে সহস্র সহস্র ভারতীয় হিন্দু ও মুসলমান তখন তথায় বাস করিত। তথাকার স্বেচ্ছাচারী সরকার তাহাদের উপর অমানুষিক অত্যাচার করিত। মিঃ গান্ধী ছিলেন তখন আফ্রিকার প্রবাসী ব্যারিস্টার। তিনি ইহার প্রতিবাদ শুরু করিলেন। ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন শুরু হইল। এইজন্য গান্ধীজীকে বহু নিগ্রহ ভোগ করিতে হইল। অবশেষে তাঁহার প্রাণপাত চেষ্টার ফলে সরকারের সহিত একটা মীমাংসার কথাবার্তা চলিতে থাকে। ইতিমধ্যে মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইল। ভারতীয়দের আহ্বানে দক্ষিণ আফ্রিকার কার্যভার তথাকার নেতাগণের উপর ন্যস্ত করিয়া গান্ধীজী এদেশে চলিয়া আসিলেন।

অতঃপর কংগ্রেসের দায়িত্ব গান্ধীজীর উপর অর্পিত হয়। মহাযুদ্ধে বিপন্ন ইংরেজ জাতি গান্ধীজীর নিকট যুদ্ধের সাহায্য ও সহযোগিতা লাভের জন্য আবেদন করেন। ভারতবাসী যুদ্ধে সাহায্য করিলে তাহার পুরস্কারস্বরূপ তাহাদের দাবী-দাওয়া অপূর্ণ থাকিবে না বলিয়া ঘোষণা করা হইল। গান্ধীজী ছিলেন মানবদরদী ঋষিকল্প মানুষ। তিনি ইহাকে একটা সুযোগ মনে করিলেন। যুদ্ধে সাহায্য

করিলে কৃতজ্ঞতায় আবদ্ধ ইংরেজ জাতি দেশ শাসনের অধিকার ভারতবাসীর হাতে না দিয়া পারিবেন না। তিনি অতিমাত্রায় উৎসাহিত হইয়া নেতাদের সাথে পরামর্শ আরম্ভ করিলেন। মাদ্রাজে ভারতীয় জাতীয় মহাসভার অধিবেশন আহূত হইল। মহাত্মাজী উচ্চাশা লইয়া ইংরেজ জাতিকে সাহায্যের জন্য আকুল আবেদন জানাইলেন। তাঁহার প্রস্তাব গৃহীত হইল। দেশের ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্য বিপন্ন ইংরেজ জাতিকে সাহায্য করা হইবে বলিয়া স্থিরীকৃত হইল।

কংগ্রেসের এই সিদ্ধান্তের ফলে দলে দলে হিন্দু যুবক সৈন্যদলে ভর্তি হইতে লাগিল। মুসলমানগণ কিন্তু মহা সমস্যায় পড়িয়া গেলেন। ইংরেজের পক্ষাবলম্বন করিয়া পবিত্র আরব ভূমির রক্ষক তুরস্কের খলিফার বিরুদ্ধে কেমন করিয়া অস্ত্র ধারণ করা যায়? সুচতুর ইংরেজ মুসলমানদের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া ঘোষণা করিলেন—যুদ্ধের ফলাফল যাহাই হউক, তুরস্কের খলিফার কোন ক্ষতি করা হইবে না। মুসলমানদের পবিত্র স্থানগুলি ও খলিফার মর্যাদা পূর্ববৎ অক্ষুণ্ণ থাকিবে।

হিন্দুগণ পূর্ণ উদ্যমে যুদ্ধে যোগদান করিয়াছেন। এবার মুসলমানরাও দলে দলে সৈন্যবাহিনীতে ভর্তি হইতে লাগিল। প্রায় ২৫ লক্ষ হিন্দু ও মুসলমান যুবক ও দেড়শত কোটি টাকা দিয়া ইংরেজ সরকারকে সাহায্য করা হইল। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে মহাযুদ্ধের অবসান হইল। ইংরেজ পক্ষ যুদ্ধে জয়লাভ করিল। কোটি কোটি টাকা ও লক্ষ লক্ষ ভারতীয় যুবকের প্রাণের বিনিময়ে গান্ধীজী পুরস্কার স্বরূপ পাইলেন 'কাইছার-ই হিন্দ' মেডেল আর ভারতবাসীর ভাগ্যে জুটিল 'মণ্টেগু চেমস্‌ফোর্ড' শাসনসংস্কার। ইংরেজ জাতিকে সাহায্য করিয়া পবিত্র ভূমি মক্কা ও মদীনার রক্ষক খলিফার সর্বনাশ এবং স্বজাতি আরবের মুসলমানদের পুণ্য ভূমিকে কলঙ্কিত করাই শুধু মুসলমানদের সার হইল।

গান্ধীজী তাঁহার সৌভাগ্যের মেডেল আস্তাকুঁড়ে ফেলিয়া দিলেন। সরকার-প্রদত্ত শাসনসংস্কার হিন্দু মুসলমান কেহই গ্রহণ করিতে রাজী হইল না। তুরস্কের স্বাধীনতা ও আরবের তীর্থস্থানগুলির পবিত্রতা হানি করা হইবে না বলিয়া যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল, তাহাও রক্ষিত হইল না। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের সন্ধির শর্ত প্রকাশিত হইলে দেখা গেল 'ম্যাণ্ডেট শাসন'-এর নাম করিয়া ইংরেজ ও ফরাসী জাতি তুরস্ক সাম্রাজ্যকে নিজদের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা করিয়া লইবার ব্যবস্থা করিয়াছে। পবিত্র ভূমি মক্কা ও মদীনার শাসন ইংরেজ-আশ্রিত শেরিফ হোসেনের উপর অর্পিত

হইয়াছে। আরব রাষ্ট্রকে বহু ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করিয়া তাঁবেদারী শাসন প্রবর্তন করা হইয়াছে।

ইংরেজ-আশ্রিত শেরিফ হোসেনের দুই পুত্র ছিলেন। ফয়সল ও তালাল। ফয়সলকে ইরাকের এবং তালালকে নবগঠিত জর্ডনের শাসন ভার দেওয়া হইল। দুর্ধর্ষ আরব জাতিকে শায়েস্তা করার জন্য ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী উর্বর অঞ্চল লইয়া ইহুদীদের জন্য 'ইস্‌রাইল রাষ্ট্র' প্রতিষ্ঠিত করা হইবে বলিয়া ইংলণ্ডের পররাষ্ট্র মন্ত্রী ব্যালফোর সাহেব ঘোষণা করিলেন।*

ইংরেজ জাতির কাণ্ড দেখিয়া মুসলিম জগৎ হাহাকার করিয়া উঠিল। সুসভ্য ইংরেজ জাতির প্রতিশ্রুতির পরিণাম দেখিয়া ভারতীয় হিন্দু-মুসলমানগণ হতবাক হইয়া গেলেন। চারিদিকে প্রবল বিক্ষোভ ও আন্দোলনের ঝড় উঠিল। বিক্ষুব্ধ জনসাধারণকে শায়েস্তা করার জন্য গভর্নমেণ্ট রাউলাট আইন পাস করিলেন। এই আইনের বলে যে-কোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিয়া যতদিন ইচ্ছা কয়েদ করিয়া রাখিবার অধিকার ইংরেজ সরকার ঘোষণা করিলেন। গান্ধীজী এই অন্যায় আইন পাস না করার জন্য বড়লাটকে অনুরোধ জানাইলেন। গত মহাযুদ্ধে ভারতীয় যুবকগণের রক্ত দানের কথা তাঁহাদিগকে স্মরণ করিয়া দিলেন। কিন্তু সমস্ত প্রতিবাদ ব্যর্থ হইল। 'রাউলাট আইন' পাস হইয়া গেল।

---

* ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার একটু কাহিনী আছে। ব্যালফোর ঘোষণার প্রায় ৩১ বৎসর পর ১৯৪৯ সালের ১৪ই মে ইস্‌রাইল রাষ্ট্র কায়েম হয়। ২য় মহাযুদ্ধের সময় বিস্ফোরক দ্রব্য প্রস্তুত করিতে গিয়া ইংরেজরা মুস্কিলে পড়িল। এসিটোন নামক একটি পদার্থ না হইলে উহা প্রস্তুত হয় না। অথচ যুদ্ধে বিস্ফোরক দ্রব্য একান্ত প্রয়োজন। ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী এসিটোন প্রস্তুতের জন্য বৈজ্ঞানিকদিগকে আহ্বান করিলেন এবং উপযুক্ত পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিলেন। প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক ডাঃ ওয়াইজম্যান মাত্র কয়েক দিনের চেষ্টায় এসিটোন প্রস্তুত করিয়া দিয়া ইংরেজ জাতির ইজ্জত রক্ষা করিলেন। এ সম্পর্কে একটি পুরাতন প্রসঙ্গ মনে পড়িল।

সম্রাট শাহ্‌জাহানের কন্যা জাহানারা অগ্নিদগ্ধ হইয়া কঠিন রোগাক্রান্ত হইয়া পড়িলে ইংরেজ ডাক্তার বৌটন তাঁহাকে রোগমুক্ত করেন। সম্রাট প্রচুর অর্থ দিয়া ডাক্তারকে পুরস্কৃত করিতে চাহিলে ডাক্তার উহা লইলেন না। তিনি স্বজাতির স্বার্থরক্ষার্থে সম্রাটের নিকট বিনা শুল্কে বাণিজ্য করার অধিকার প্রার্থনা করিলেন। উহা মঞ্জুর হইল। ডাক্তার বৌটনের স্বার্থত্যাগের ফলে পরবর্তী কালে বণিকের মানদণ্ড যে রাজদণ্ডে পরিণত হইয়াছিল ইহা সকলেই জানেন।

এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইল। ডাক্তার ওয়াইজম্যান নিজের জন্য কিছুই চাহিলেন না। এই ইহুদী বৈজ্ঞানিক যাযাবর ইহুদী জাতির জন্য একটি নিজস্ব আবাসভূমি প্রার্থনা করিলেন।

বেচারা মুসলমান জাতি হতাশ হইয়া দিশাহারা হইলেন। অবশেষে মাননীয় আগা খাঁন, মিঃ জিন্না, মওলানা মোহাম্মদ আলী প্রমুখ কতিপয় মুসলিম নেতৃবৃন্দ বৃটিশ সরকারের মনোভাব পরিবর্তনের আশা লইয়া বিলাতে গমন করিলেন। বিলাতের কর্তাদের সঙ্গে দেখা করিয়া যুদ্ধকালীন সাহায্যের কথা, তুরস্কের স্বাধীনতার কথা, আরব ভূমির পবিত্রতা রক্ষার প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করাইয়া ন্যায়বিচার প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু ফল কিছুই হইল না। কর্তারা যেন কথা শুনিয়াও শুনিলেন না। প্রতিনিধি দল ব্যর্থ মনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। ফলে মুসলমানদের মধ্যে বিক্ষোভের মাত্রা বাড়িয়া গেল। রাউলাট আইনের প্রতিবাদে ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে ৬ই এপ্রিল সমগ্র দেশব্যাপী হরতাল পালনের জন্য গান্ধীজী আবেদন জানাইলেন। নিরুপদ্রবে হরতাল পালিত হইল। মিঃ মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ্, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য প্রভৃতি নরমপন্থী নেতারা ব্যবস্থা পরিষদের সভ্যপদ ত্যাগ করিলেন। বিশ্ব-কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, হাকিম আজমল খাঁ প্রমুখ অনেকেই তাঁহাদের সরকার-প্রদত্ত উপাধি পরিত্যাগ করিলেন। পাঞ্জাবের জননায়ক সইফুদ্দীন কিচলু ও ডাক্তার সত্যপালকে গ্রেপ্তার করিয়া কোন এক অজ্ঞাত স্থানে লইয়া যাওয়া হইল। চারিদিকে ভীষণ ধরকাপড় আরম্ভ হইল।

জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড

ইংরেজ জাতির একটি বর্বরোচিত কাজে সমগ্র ভারত শঙ্কিত হইয়া উঠিল। প্রতি বৎসরের মত ১৩ই এপ্রিল অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগে বৈশাখী মেলা বসিল। মেলায় প্রায় ২৪।২৫ হাজার লোকের সমাগম হইয়াছিল। কংগ্রেসের পক্ষ হইতে এই সমাগমে রাউলাট আইন ও ধর পাকড়ের বিরুদ্ধে একটি আলোচনাসভার বন্দোবস্ত হইয়াছিল। কিন্তু সরকার উক্ত সভা বেআইনী ঘোষণা করায় সভা হয় নাই। তীর্থ সমাবেশে শুধু বেচাকেনা হইয়াছিল। কিন্তু এতদসত্ত্বেও সেনাপতি ডায়ার কতিপয় সশস্ত্র সৈন্য লইয়া অতর্কিতে জালিয়ানওয়ালাবাগের ফটকের নিকট উপস্থিত হন এবং পাঁচ মিনিটের মধ্যে স্থানটি জনশূন্য করার আদেশ দেন। জনসাধারণ কেহই এই আদেশ শুনিতে পাইল না। তাহারা আবাল-বৃদ্ধ-স্ত্রী-পুরুষ-নির্বিশেষে এবং নিরুদ্বেগে মেলার বেচাকেনা ও আমোদ আহ্লাদে রত ছিলেন। এমন সময় মেসিনগানগুলি ভীষণভাবে গর্জন করিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে অনেক লোক ধরাশায়ী হইল। ভয়চকিত নরনারীর দল ফটকের দিকে দৌড়াইতে

লাগিল। বলা বাহুল্য ঐ একমাত্র ফটক ব্যতীত আর-কোন দিক দিয়া পলায়ন করিবার অন্য কোন পথ ছিল না। তীর্থমেলায় যোগদান করিতে আসিয়া দিশাহারা নরনারীগণ শৃগাল কুকুরের ন্যায় গুলির মুখে প্রাণ বিসর্জন দিল। প্রায় ৫ হাজার গুলিবর্ষণের পর পিশাচ ডায়ারের আদেশে সৈন্যরা নিরস্ত হইল।

পরবর্তী সময়ে জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের একটি তদন্ত কমিটি বসিয়াছিল। ডায়ার সাক্ষ্য দিতে গিয়া দর্পভরে বলিয়াছিলেন—"গুলি শেষ না হইলে আমি একটি প্রাণীকেও জীবিত ফিরিতে দিতাম না।" কিছু লোক জীবিত ফিরিতে পারিয়াছিলেন দেখিয়া ডায়ার সাহেব নাকি খুব আফসোস করিয়াছিলেন। সরকারী হিসাবে নিহতের সংখ্যা ছিল ৩৭৯ জন এবং আহতের সংখ্যা ছিল দেড় হাজার জন। বেসরকারী তদন্তে জানা যায়—নিহতের সংখ্যা ছিল এক হাজার এবং আহতের সংখ্যা ছিল প্রায় তিন হাজার।

জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ড জাতির ভাগ্যাকাশে এক চরম বেদনার টিকা রাখিয়া গেল। পাঞ্জাবের অধিবাসিগণসহ সমগ্র ভারতবাসী আসন্ন বিপদাশঙ্কায় ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল। বৃটিশ সরকার তাড়াতাড়ি লাহোর, অমৃতসর এবং আরও কয়েকটি স্থানে সামরিক আইন জারী করিলেন। এই লোমহর্ষক হত্যাকাণ্ডের সংবাদ যাহাতে লোকে জানিতে না পারে তাহার জন্য সংবাদপত্রগুলির উপর কঠোর নির্দেশ দেওয়া হইল। বাহিরের লোকের পাঞ্জাব প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হইল। এত কড়াকড়ি সত্ত্বেও হত্যাকাণ্ডের সংবাদ গোপন রহিল না।

বিলাতের হাউস অব কমনস-এ এই হত্যাকাণ্ডের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইল। সদস্যরা দাঁড়াইয়া মামুলী দুঃখ প্রকাশ করিলেন। লর্ডসভা ডায়ারের বীর কর্মের প্রশংসা করিলেন। বিলাতের রমণীরা চাঁদা তুলিয়া প্রায় তিন লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিয়া সেনাপতি ডায়ারকে পুরস্কৃত করিলেন।

এই দুর্ঘটনার প্রায় ছয় বৎসর পর অভিশপ্ত জালিয়ানওয়ালাবাগ দেখার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল। একটা ফাঁকা জায়গা। চারিদিক অট্টালিকা ও উচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। প্রবেশদ্বার মাত্র একটি। ভিতরে একটি বৃহৎ ইঁদারা। প্রাচীরের গায়ে অসংখ্য বুলেটের দাগ দেখিলাম। শুনিলাম গুলিবর্ষণের সময় বহু লোক ইঁদারার মধ্যে আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতে গিয়া পানিতে ডুবিয়া মরিয়াছে। এইরূপ অভাবনীয় দুর্ঘটনা দুনিয়ার স্বাধীনতার ইতিহাসে আর কোথাও ঘটিয়াছে কি-না জানি না। ইংরেজ শাসনের এই কলঙ্ককাহিনী স্বাধীন পাক-ভারতের

ইতিহাসে মসিলিপ্ত হইয়া থাকিবে। মাইকেল ওডায়ার তখন পাঞ্জাবের গবর্নর। তিনি এই পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড সমর্থন করায় তাঁহাকে হত্যা করার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু সুযোগ হয় নাই। ওডায়ার চাকুরি ত্যাগ করিয়া বিলাত চলিয়া যাওয়ার পর উধম সিং নামক এক বিপ্লবী বিলাতে গিয়া তাঁহাকে হত্যা করেন। বিচারে উধম সিংহের ফাঁসী হয়।

(৯)

দুর্দিনের কর্তব্য-নির্ধারণ

তুরস্কের অস্তিত্ব বিপন্ন, আরব ভূমির পবিত্রতা হানি ইত্যাদি কারণে মুসলমানগণ অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা এলাহাবাদে এক সম্মিলন আহ্বান করিলেন। মওলানা আবুলকালাম আজাদ, মওলানা শওকত আলী, মওলানা মোহাম্মদ আলী, ডাঃ আনসারী, হাকিম আজমল খাঁ, মওলানা হজরত মোহানী প্রভৃতি মুস্‌লিম নেতাগণ ব্যতীত আমন্ত্রিত অতিথি হিসাবে মহাত্মা গান্ধী এই সভায় যোগদান করেন। বহু আলোচনার পর মওলানা আজাদ 'তর্কে মওয়ালাত' অর্থাৎ সরকারের সহিত সহযোগিতা বর্জনের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। মওলানা আজাদের অসাধারণ প্রজ্ঞা ও রাজনৈতিক দূরদর্শিতা দর্শনে মহাত্মা গান্ধী চমৎকৃত হন। তাঁহার সত্যাগ্রহ নীতি অসহযোগ আন্দোলনের সহিত সংযুক্ত হইয়া নবরূপে আত্মপ্রকাশ করে। খেলাফত আন্দোলন পরিচালনা করার জন্য নিখিল ভারত খেলাফত কমিটি গঠন করা হইল। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাই নগরে খেলাফত কমিটি গঠিত হয়। মওলানা শওকত আলী উহার কর্ণধার নিযুক্ত হন।

সারা ভারতব্যাপী অসহযোগ আন্দোলন গড়িয়া তোলার উদ্দেশ্যে কলিকাতায় বিশেষ কংগ্রেস অধিবেশন বসে। পাঞ্জাবের জননায়ক লালা লাজপত রায় উহাতে সভাপতিত্ব করেন। তর্কে মওয়ালাতের প্রস্তাব গৃহীত হইল। সত্যাগ্রহ, খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন একসঙ্গে চলিবে বলিয়া স্থিরীকৃত হইল। বিলাতী দ্রব্য, অফিস আদালত, স্কুল, কলেজ ইত্যাদি বয়কট করার নির্দেশ দেওয়া হইল। নূতন আশা উদ্দীপনা লইয়া দেশ মাতিয়া উঠিল।

বিখ্যাত ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন দাস, মতিলাল নেহেরু, শ্রী নিবাস আয়েঙ্গার, ভুলাভাই দেশাই প্রমুখ ভারতের প্রসিদ্ধ আইনজীবিগণ মাসিক ৪০/৫০ হাজার টাকার আয়ের আইন ব্যবসা ত্যাগ করিয়া অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া

পড়িলেন। ইঁহাদের ত্যাগের মহিমায় দেশবাসী মুগ্ধ হইয়া গেল। চারিদিকে অভূতপূর্ব উৎসাহ ও উত্তেজনার সৃষ্টি হইল। উকীল মোক্তারগণ আদালত ত্যাগ করিলেন। ছাত্রগণ স্কুলকলেজ পরিত্যাগ করিয়া বাহির হইয়া আসিল। অনেক সরকারী চাকুরে চাকুরি ত্যাগ করিলেন। চারিদিকে গণবিক্ষোভ অগ্নিমূর্তি ধারণ করিল। এত দিন অহিংসভাবে আন্দোলন চলিতেছিল। ধরপাকড়, জুলুম, আর অন্তরীণের বাড়াবাড়ির ফলে আন্দোলন আর অহিংসার মধ্যে সীমাবদ্ধ রহিল না। বাংলা, বিহার, পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ প্রভৃতি স্থানের জনগণের মধ্যে প্রকাশ্যে বিদ্রোহ দেখা দিল। গোরক্ষপুর জেলার চৌরাচৌরি থানার অধিবাসী পুলিশের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া থানায় অগ্নি সংযোগ করিল। ফলে দারোগাসহ কয়েকজন কনেস্টবল অগ্নিদগ্ধ হইয়া মারা গেল। এই দুর্ঘটনায় গান্ধীজী অত্যন্ত মর্মাহত হইয়া সত্যাগ্রহ আন্দোলন স্থগিত রাখিবার নির্দেশ দিলেন। আন্দোলন সাময়িকভাবে স্তিমিত হইয়া পড়িল। অনেকের মনোবল ভাঙ্গিয়া গেল।

একদিকে স্বাধীনতা আন্দোলনের বেগ মন্দীভূত হইল বটে কিন্তু অন্য দিকে বিপ্লববাদীরা পুনরায় কর্মতৎপর হইয়া উঠিল। তাহারা কলিকাতার শাখারীতলার পোস্টমাস্টারকে হত্যা করিয়া সরকারী তহবিল লুণ্ঠন করিল। গোপীনাথ সাহা নামক একজন বিপ্লবী পুলিশ কমিশনার টেগার্ট সাহেবকে হত্যা করিতে গিয়া ভুলক্রমে আরনেমট ডে নামক কীলবর্ন কোম্পানীর ম্যানেজারকে হত্যা করিয়া বসিলেন। ভারতের বহু স্থানে বিপ্লবীরা ভীষণ সন্ত্রাসের সৃষ্টি করিল।

মোপলা বিদ্রোহ

দক্ষিণ ভারতে মালাবার অঞ্চলে মোপলা মুসলমানদের বাস। ইহারা আরব বংশোদ্ভূত বলিয়া কথিত। অত্যন্ত তেজস্বী ও স্বাধীন চিত্তের মানুষ ইহারা। মোপলাগণ স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দিয়া বহু পূর্ব হইতেই সরকারের বিষ নজরে পড়িয়াছিল। সরকার নানা ভাবে ইহাদের উপর নির্যাতন চালাইতেছিল। অত্যাচারে ইহারা ইংরেজ শাসন অস্বীকার করিয়া বসিল। বিদ্রোহী মোপলাগণকে শায়েস্তা করার জন্য সরকার সৈন্য পাঠাইয়া অমানুষিক বর্বরতার সহিত তাহাদিগকে দমন করিবার ব্যবস্থা করিলেন। মোপলারাও মাসাধিক কাল ধরিয়া পাল্টা সংগ্রাম করিয়া চলিল। অবশেষে তাহারা আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইল। ২ হাজার ২ শত ২৩ জন নিহত এবং ১৬৫০ জন মোপলা ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া আহত হইল।

৫৬৬৮ জনকে বন্দী করিয়া বিভিন্ন স্থানে নির্বাসিত করা হইল। যে সুসভ্য ইংরেজ জাতি অতীতে অন্ধকূপ হত্যার অলীক কাহিনী রচনা করিয়া নবাব সিরাজউদ্দৌলার নির্মল চরিত্রে অযথা কলঙ্ককালিমা লেপন করিতে কুণ্ঠাবোধ করেন নাই তাঁহারাই আবার সত্যকার অন্ধকূপ সৃষ্টি করিয়া বর্বরতার চূড়ান্ত নিদর্শন স্থাপন করিলেন। নির্বাসনের সময় প্রায় শতাধিক মোপলা বন্দীকে আন্দামানে পাঠানোর উদ্দেশ্যে মালগাড়ীতে ভর্তি করিয়া চালান দেওয়া হইল। ট্রেনখানা গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইলে দেখা গেল, হতভাগা বন্দীগণের ৭০ জন শ্বাসরুদ্ধ হইয়া ইহধামের খেলাধূলা সাঙ্গ করিয়া পরপারের ডাকে চলিয়া গিয়াছে। বদ্ধ মালগাড়ীতে আলো-বাতাস প্রবেশের ব্যবস্থা না থাকায় এই পৈশাচিক মৃত্যুকাণ্ড সংঘটিত হইয়াছিল। উন্নত সভ্যতার দাবীদারগণের এই অমানুষিক কীর্তি ইতিহাসের পৃষ্ঠায় মসিলিপ্ত হইয়া রহিবে।

অ্যানি বেশান্ত

সুবিখ্যাত ইংরেজ মহিলা মাদ্রাজ থিওসোফিক্যাল সোসাইটির প্রতিষ্ঠাত্রী ডাঃ অ্যানি বেশান্ত হোমরুল লীগ গঠন করিয়া দক্ষিণ ভারতে পূর্ণ উদ্যমে স্বাধীনতা আন্দোলন চালাইতেছিলেন। ডাঃ বেশান্ত ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা জাতীয় মহাসভার অধিবেশনে সভানেত্রী নির্বাচিত হইয়াছিলেন। এই তেজস্বিনী মহিলা ভারতবাসীর পক্ষ সমর্থন করিতে গিয়া কারাদণ্ড পর্যন্ত ভোগ করিয়াছিলেন। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে লক্ষ্ণৌ চুক্তির পর নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের স্রোত প্রায় একই খাতে প্রবাহিত হইতেছিল। কংগ্রেস, খেলাফত, মুসলেম লীগ প্রভৃতি স্বাধীনতাকামী প্রতিষ্ঠানগুলির নেতাগণ মিলিতভাবে একই লক্ষ্যে অগ্রসর হইতেছিলেন।

বিপ্লববাদিগণ নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। ১৯২৮ সনের ১৭ই নবেম্বর পাঞ্জাবের জননায়ক লালা লাজপাত রায় পুলিশের লাঠির আঘাতে মৃত্যুবরণ করায় বিপ্লববাদীরা অত্যন্ত উৎক্ষিপ্ত হইয়া উঠে। হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার জন্য ভকৎ সিং ও তাঁহার দল মিঃ স্যাণ্ডার্সকে গুলি করিয়া নিহত করে। তাহারা কেন্দ্রীয় আইন পরিষদ ভবনের উপর বোমা নিক্ষেপ করে। সারা ভারতের বহু বাঙ্গালী ও ইংরেজ সরকারী কর্মচারীকে বিপ্লববাদীরা নির্বিচারে হত্যা করে। চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করিয়া বিপ্লবীরা স্বাধীনতা অর্জনের ইতিহাসে চরম দুঃসাহসিক কীর্তির পরিচয় দেয়।

(১০)

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের যুবরাজ ভারতভ্রমণে আসিতেছেন জানিতে পারিয়া তাঁহার প্রতি বিরাগ প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে ১৭ নভেম্বর সমগ্র ভারতব্যাপী হরতাল ঘোষণা করা হইল। এমন সাফল্যকর হরতাল ইতিপূর্বে আর কখনও অনুষ্ঠিত হয় নাই। সম্রাট-নন্দনের প্রতি অশ্রদ্ধা এতবড় গোস্তাকী সরকার মোটেই সহ্য করিতে পারিলেন না। সরকারের রুদ্ররোষে ভারত সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। সহস্র সহস্র রাজনৈতিক কর্মী কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, মওলানা আকরাম খাঁ, মৌলবী তমিজউদ্দীন খাঁ, মৌলবী মুজিবর রহমান, পীর বাদশাহ্ মিঞা, মওলানা ভাসানী, মওলানা আবুল কালাম আজাদ, জে. এম সেনগুপ্ত প্রভৃতি নেতাগণ কারাগারের অন্তরালে প্রেরিত হইলেন। স্বেচ্ছাসেবক-দলগুলি বেআইনী ঘোষিত হইল।

ইংরেজ সরকারের এই চণ্ড নীতির ফল কিছু হইল না। অসন্তোষ ও বিক্ষোভের তীব্রতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। পরিস্থিতির তীব্রতা এমনই গুরুতর হইয়া উঠিল যে, ইংরেজ সরকারের ভিত্তিমূল নড়বড়ে হইয়া উঠিল। শাসকগোষ্ঠী প্রমাদ গণিতে লাগিলেন। এই সময় ইহুদী বড়লাট লর্ড রিডিং ভারতে আসিয়া কূটনীতির নূতন খেলা শুরু করিলেন। তিনি হিন্দুমহাসভার নেতাগণকে ডাকিয়া বুঝাইলেন—খেলাফতের দাবী পূরণ করা হইলে এদেশে আবার মুসলমান রাজত্ব কায়েম হইবে। আবার মিশর, ইরান, কাবুল পার্শ্ববর্তী মুসলমান রাষ্ট্রগুলি তুরস্কের সহিত একত্র হইয়া ভারত আক্রমণ করিবে। এদেশের মুসলমানরা আবার তোমাদিগকে দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ করিবে। অনুরূপভাবে 'জীহুজুর' মুসলমান নেতাগণকে বুঝাইলেন আমরা এই দেশ হইতে চলিয়া গেলে ২৫ কোটি হিন্দু তোমাদিগকে গোলাম করিয়া রাখিবে। বড়লাটের এই ভেদনীতির বেড়াজালে অনেকেই আটকা পড়িলেন। ডাঃ মুঞ্জে, জয়াকর, সাভারকর প্রমুখ হিন্দু-নেতাগণ কংগ্রেস ত্যাগ করিয়া হিন্দুমহাসভায় যোগদান করিলেন। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের ন্যায় প্রভাবশালী কতিপয় নেতা হিন্দুমহাসভার প্রধান পৃষ্ঠপোষক হইয়া উঠিলেন। মুসলমান বড়লোকেরা পূর্ব হইতেই সরকারের একান্ত বশংবদ ছিলেন। বড়লাটের প্ররোচনায় আরও কিছু নেতৃস্থানীয় মুসলমান তাঁহাদের সঙ্গে যোগদান করিলেন।

আর্যসমাজের নেতা স্বামী শ্রদ্ধানন্দ কংগ্রেসের আন্দোলনে যোগ দিয়া লাহোর জেলে কারাদণ্ড ভোগ করিতেছিলেন। পাঞ্জাবের একদল উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মচারী লাহোর জেলে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া গোপন আলোচনা করার পর কারাদণ্ডের মেয়াদ শেষ না হইতেই তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হইল। কারামুক্তির পর তাঁহার অদ্ভুত পরিরবর্তন ঘটিল। যে মুসলমানগণ একদিন তাঁহাকে দিল্লীর ঐতিহাসিক জামে মসজিদে ইমামের জায়গায় দাঁড় করাইয়া বক্তৃতা করার অধিকার দিয়াছিলেন —তিনিই প্রচার করিতে লাগিলেন যে, এদেশের মুসলমানগণের পূর্বপুরুষগণ হিন্দু ছিলেন। নবাব বাদশাগণের প্ররোচনায় পড়িয়া ইহারা মুসলমান হইয়াছিলেন। ইহাদিগকে 'শুদ্ধি' করিয়া আবার হিন্দুধর্মে ফিরাইয়া আনিতে হইবে। তিনি পূর্ণ উদ্যোমে 'শুদ্ধি আন্দোলন' আরম্ভ করিয়া দিলেন।

মধ্যভারতের রাজপুত মুসলমানরা দুর্বল প্রকৃতির লোক। সেই সমস্ত মুসলমানকে নানা প্রলোভন দিয়া এবং কোন কোন ক্ষেত্রে অত্যাচারের ভয় দেখাইয়া কয়েক সহস্র লোককে হিন্দু করিয়া লওয়া হইল। আর্যসমাজপতিদের ধর্মীয় আক্রমণ সংখ্যালঘু মুসলমানদিগকে সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিল। পাঞ্জাবের খ্যাতনামা জননায়ক ও ব্যারিস্টার সইফুদ্দীন কিচলু আর্যসমাজীদের প্রতিবাদে 'তানজীম' আন্দোলন শুরু করিলেন। মুসলমান জমিদারগণ ও সরকারী অনুগতের দল এতদিন নীরব দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। লর্ড রিডিং-এর প্ররোচনায় তাঁহারা নেতৃত্বের লোভে এইবার সরকারী মেগাফোনের কাজ করিতে লাগিলেন। ইংরেজের ভেদনীতি কিছুটা সফল হইল।

এইরূপ একটি অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির উদ্ভবের জন্য ভারতের মুক্তি-আন্দোলন অনির্দিষ্ট কালের জন্য পিছাইয়া পড়িল। তবুও প্রকৃত নেতাগণ হতদ্যোম হইলেন না। বিরাট প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও মহাত্মা গান্ধী, মওলানা মোহাম্মদ আলী প্রমুখ নেতাগণ সমগ্র ভারত পরিভ্রমণ করিয়া জনসাধারণকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতে লাগিলেন। তাঁহাদের এক একটি জনসভায় লক্ষ লক্ষ লোকের সমাগম হইত। নূতন নূতন মুক্তিপাগল কর্মিগণ দলে দলে স্বাধীনতামন্ত্রে দীক্ষা লইয়া আন্দোলনের শক্তি বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। একই সময় স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে প্রজা আন্দোলন, খেলাফত আন্দোলন, শুদ্ধি আন্দোলন, তানজীম, হোমরুল, মুসলিম লীগ আন্দোলন পাশাপাশি চলিতেছিল।

১৯২০ সাল

এইবার নিজ জন্মভূমি দিনাজপুরের কথা কিছু বলিব।

উত্তরবঙ্গের দিনাজপুর জেলা সব দিক দিয়া তখন পশ্চাৎপদ ছিল। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে গুড-ফ্রাইডের বন্ধে স্থানীয় নেতাগণ একটি শিক্ষা-সম্মেলন আহ্বান করেন। একই সময় যুক্তভাবে মুসলিম লীগ ও আহলে হাদিস সম্মেলন আহ্বান করা হয়। শিক্ষা-সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত স্কুল ইনস্পেক্টর বিখ্যাত শিক্ষাবিদ মৌঃ আবদুল করিম সাহেব। মুসলমান শিক্ষা সম্বন্ধে তিনি যে যুক্তিপূর্ণ অভিভাষণ পাঠ করেন উহাকে মুসলমানদের ভবিষ্যৎ শিক্ষার পূর্ণ নির্দেশের আলোর দিশারী বলা যাইতে পারে। মুসলিম লীগ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন স্বনামধন্য "দি মুসলমান" পত্রিকার সম্পাদক মৌঃ মুজিবুর রহমান সাহেব। তাঁহার যুক্তিপূর্ণ অভিভাষণটি অতি চমৎকার হইয়াছিল। আহলে হাদিস কনফারেন্সের সভাপতি ছিলেন মওলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁ। সাংবাদিক ও সাহিত্যিক মওলানা আকরাম খাঁ অসাধারণ বক্তৃতাশক্তির অধিকারী ছিলেন। তাঁহার বক্তৃতায় দিনাজপুরবাসীরা নূতন করিয়া প্রাণের স্পন্দন অনুভব করিয়াছিল। জনৈক মিশরবাসী মওলানার আরবী বক্তৃতার সঙ্গে সঙ্গে বাংলায় তরজমা করিয়া শুনান মৌলানা আবদুল্লাহিল বাকী। গোলকুঠি ময়দানে পাঁচ দিন ধরিয়া এই সম্মেলন চলে। আহলে হাদিস সম্মেলন লালবাগে বসিয়াছিল। দিনাজপুরের উদীয়মান জননায়ক মওলানা আবদুল্লাহিল বাকী, মৌঃ হাসান আলী, মৌঃ কাদের বক্‌স্‌, মৌঃ আমীর উদ্দীন চৌধুরী, মৌঃ ফজলে হক ও আরো বহু যুবক কর্মীর প্রাণপাত পরিশ্রমের ফলে অধিবেশনগুলি শৃঙ্খলার সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছিল। কয়েক দিনের অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে আমি নিজে অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলাম। সভায় বিপুল জনসমাগম হইয়াছিল। এতবড় বিরাট উৎসাহ ও উদ্যম ইতিপূর্বে দিনাজপুরে আর দেখা যায় নি। এই সভার পর হইতে দিনাজপুরে অভূতপূর্ব কর্মচাঞ্চল্য দেখা দেয়।

তখন শিক্ষার দিক দিয়া দিনাজপুর জেলা অত্যন্ত পশ্চাৎপদ ছিল। দক্ষিণ দিনাজপুরে কর্মবীর শুকুরুদ্দীন চৌধুরী ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে নিজ গ্রাম রাজরামপুরে একটি হাই স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। তখনকার দিনে গ্রাম্য দলাদলি ও হিংসা-বিদ্বেষের

মধ্যে যে অসাধারণ ধৈর্য ও নিষ্ঠার সহিত স্কুল পরিচালনা করিয়া তিনি যে কৃতিত্বের পরিচয় দেন তাহা চিন্তা করিলে অবাক হইতে হয়। তখন কতকগুলি অশিক্ষিত মাতব্বর লোক শিক্ষার ব্যাপক প্রচারের বিরোধী ছিল। সাধারণ লোকের ছেলে-পিলে স্কুলে শিক্ষা লাভ করিলে কর্মবিমুখ ও অহঙ্কারী হইবে, আমাদিগকে মানুষ বলিয়া গণ্য করিবে না, আমাদের সম্মান-প্রতিপত্তি সমস্ত বিনষ্ট হইয়া যাইবে—এইরূপ ভুল ধারণার বশবর্তী হইয়া অনেকে স্কুলটির ক্ষতিসাধানের চেষ্টায় লাগিয়াছিল। হঠাৎ এক গভীর রাত্রে দেখা গেল বৃহৎ স্কুল ঘরটি দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে। প্রজ্বলিত অগ্নিশিখা দেখিয়া ভীত ও বিহ্বল জনসাধারণ হায় হায় করিয়া ছুটিয়া আসিল! প্রতিষ্ঠাতা শরফুদ্দীন চৌধুরী প্রস্তরমূর্তিবৎ দাঁড়াইয়া এই হৃদয়বিদারক দৃশ্য অবলোকন করিলেন। স্কুলের আসবাবপত্র, অফিস সব পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল। কিন্তু তিনি দমিলেন না। ইটের গাঁথুনী দিয়া নূতন করিয়া স্কুল ঘর তৈয়ার করিলেন। আবার নূতন উদ্যমে স্কুল চলিতে লাগিল। অর্ধ-শতাব্দী পূর্বে গভীর আত্মবিশ্বাস ও অক্লান্ত পরিশ্রমে যে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানটি তিনি গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, তাঁহার সুযোগ্য পুত্র নুরুল হুদা চৌধুরী কর্তৃক আজও তাহা সুচারুরূপে পরিচালিত হইয়া আসিতেছে।

এই স্কুলটির স্থাপনাকালে আমি ও সৈয়দ মোজাহার হোসেন সাহেব ছায়ার ন্যায় প্রতিষ্ঠাতার অনুসরণ করিয়া চলিয়াছিলাম। জনসাধারণের সহানুভূতি-আকর্ষণ ও চাঁদা-সংগ্রহ উদ্দেশ্যে আমরা ফরফুরায় গিয়া হজরত মওলানা আবুবকর সাহেবকে আনিয়া বিরাট সভা করিয়াছি। মিঃ ইজিকেল সাহেব তখন জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট। স্কুলটি পরিদর্শনের জন্য আমরা তাঁহাকে সাদর আহ্বান জানাই। তিনিও সম্মত হন। পরিদর্শনের নির্ধারিত দিনে ভীষণ ঝড়বৃষ্টি আরম্ভ হয়। কিন্তু কর্তব্যপরায়ণ ইংরেজ সিভিলিয়ান সমস্ত দুর্যোগ অগ্রাহ্য করিয়া রাজারামপুরে আসিয়া হাজির হইলেন। ইজিকেল সাহেবের নামেই স্কুলটির নামকরণ করা হয়। আজকালকার দিনে একটা কলেজ প্রতিষ্ঠার চেয়েও তখনকার দিনে একটা হাই স্কুল স্থাপন করা কঠিনতর কাজ ছিল। খাঁন বাহাদুর আমিনুর রহমান তাঁহার শিক্ষকতার প্রথম জীবনে এই হাই স্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন। বহু ভাষাবিদ পণ্ডিত স্বনামধন্য মনীষী ডাঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ্ সাহেবও কিছুদিন এই স্কুলের প্রধানশিক্ষকের আসন অলঙ্কৃত করিয়া স্কুলটিকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন।

পূর্বে বলিয়াছি যে, হুলাইজানার মৌলবী আবদুল গফুর সাহেব ও তদীয়

ভ্রাতা প্রসিদ্ধ ওয়ায়েজ মৌলবী ইউসুফ আলী মাহমুদী সাহেব স্বগ্রামে একটি মাদ্রাসা ও তৎসঙ্গে একটি মাইনর স্কুল পরিচালনা করিয়া আসিতেছিলেন। মওলানা আবদুল্লাহিল বাকী সাহেবের ওয়ালেদ মরহুমের প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসাটি অতি যোগ্যতার সহিত পরিচালিত হইতেছিল। জেলার বিভিন্ন স্থানে আরও কয়েকটি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছিল। সেই অন্ধকার যুগে যাঁহারা অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া দিকে দিকে জ্ঞানের আলো প্রজ্বলিত করিয়াছিলেন আজ শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁহাদের নাম স্মরণ করা আমাদের কর্তব্য।

পণ্ডিত ভুবনমোহন কর বিদ্যারত্ন

এই প্রসঙ্গে দিনাজপুরের ঋষি-পণ্ডিত ভুবনমোহন কর বিদ্যারত্ন মহাশয়ের কথা বলি। ইনি ছিলেন একেশ্বরবাদী ব্রাহ্ম হিন্দু। শুভ্রকেশ, আবক্ষ লম্বমান শুভ্রশ্মশ্রু, শুভ্রবেশ পরিহিত তাঁহার সৌম্য চেহারাটি আপামর সকলের শ্রদ্ধার পাত্র ছিল। জাতিধর্ম-নির্বিশেষে মানুষের সেবা করাই ছিল তাঁহার দৈনন্দিন কার্য। ইনি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ছিলেন। রোগ-নির্ণয় ও ঔষধ-নির্বাচনে তাঁহার অসাধারণ দক্ষতা ছিল। প্রতিদিন বহু রোগী তাঁহার বাড়ীতে সমাগত হইত। তিনি বিনা মূল্যে তাহাদিগকে ঔষধ দান করিতেন। মহারাজা গিরিজানাথ তাঁহাকে একটি ঘোড়ার গাড়ী দিয়াছিলেন। অক্ষম দরিদ্র রোগী যাহারা আসিতে পারিত না তিনি সেই গাড়ীতে চড়িয়া প্রত্যেকের বাড়ী বাড়ী যাইয়া ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া আসিতেন। মহারাজা তাঁহার ব্যয়-ভার বহন করিতেন। দরিদ্রের পর্ণকুটির হইতে রাজপ্রাসাদ পর্যন্ত তাঁহার অবাধ গতি ছিল।

একবার এক ঘটনার কথা মনে পড়িল। তিনি সেইবার জিলা স্কুলের ছাত্রদের বার্ষিক মিলাদসভায় সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন। সভায় হজরতের জীবনী সম্বন্ধে আমিও বক্তৃতা করি। সভাপতি মহাশয় আমার বক্তৃতার প্রশংসা করিয়া সভাস্থলে দাঁড়াইয়া আমাকে আলিঙ্গন করেন। আরও কয়েকজন বক্তৃতা করার পর সভাপতির ভাষণে তিনি হজরতের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। অশ্রুসজল চক্ষে তিনি হজরতের মহান চরিত্র আলোচনা করিয়া সকলকে তাহা অনুসরণ করিতে আহ্বান জানান। ছাত্রগণকে সম্বোধন করিয়া

তিনি বলেন তোমরা পাঠ্য পুস্তকে যে সমস্ত মহৎ লোকের জীবনী পাঠ কর, তাঁহাদের অনুসরণ করিয়া নিজেদের চরিত্র গঠন কর। প্রকৃত মনুষ্যত্ব অর্জন করিয়া দেশ ও জাতিকে ধন্য কর। এই চিরকুমার সদানন্দ মুক্তপুরুষ বাংলা ১৩২৭ সালে ১৩শে ভাদ্র দিনাজপুরবাসীকে কাঁদাইয়া ৯০ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেন।

(১১)

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দ। আমি সেইবার গ্রামের বাড়ী হইতে হিলিতে বাস করিতে শুরু করি। হিলি তখন বগুড়া জেলার অধীনে উত্তরবঙ্গের প্রসিদ্ধ ব্যবসাকেন্দ্র ছিল। ১৬টি ধানের কলে লক্ষ লক্ষ মন চাউল প্রস্তুত হইয়া বিভিন্ন স্থানে রপ্তানি হইত। মিলগুলি ছিল হিন্দু ও মাড়োয়ারীদিগের। মুষ্টিমেয় কয়েকজন মুসলমান ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ব্যতীত অধিকাংশ মুসলমান ছিল কুলী মজুর। সামাজিক মর্যাদা বলিতে ইহাদের কিছুই ছিল না। কোন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানও এখানে ইতিপূর্বে গঠিত হয় নাই। স্থানীয় কয়েকজন যুবককে লইয়া প্রথম হিলি কংগ্রেস কমিটি গঠন করিলাম। কোন বড়লোক ইহার সদস্য হইতে সম্মত না হওয়ায় যুবকগণকে লইয়াই কার্যারম্ভ করিলাম। আমি কমিটির সেক্রেটারি ও বসন্তকুমার দাস সহকারী সেক্রেটারি হইলেন। চরকায় সূতা কাটিয়া হাতে কাপড় প্রস্তুত করা আরম্ভ হইল। বিলাতী দ্রব্য বর্জন ও মদের দোকানে পিকেটিং চলিল। চারিদিকে হৈ চৈ আরম্ভ হইল। এক গাঁজাখোর প্রশ্ন করিল, গাঁজা আমাদের জিনিস, তোমরা উহা বন্ধ করিতে চাও কেন? স্বরাজ আমরা বুঝি না। যে স্বরাজে গাঁজা খাওয়া চলিবে না সে স্বরাজ আমরা চাই না।

কংগ্রেসে নাম দিলে জেলে যাইতে হইবে এই ভয়ে সাধারণ লোক প্রথম প্রথম আমাদের নিকট ঘেঁসিত না। কংগ্রেসের উদ্দেশ্য কি উহা জনসাধারণকে অবগত করান দরকার মনে করিয়া এক বিরাট সভার আয়োজন করা হইল। বিদেশী শাসকের নাগপাশ হইতে দেশকে মুক্ত করা আমাদের উদ্দেশ্য সভায় ইহা প্রচার করা হইল।

বগুড়া জেলার কংগ্রেস কমিটির কর্মকর্তা যতীন্দ্রমোহন রায়, সুরেশচন্দ্র দাসগুপ্ত দিনাজপুরের মওলানা আবদুল্লাহিল বাকী, মওলানা মনিরুদ্দীন আনোয়ারী প্রমুখ বহু জননায়ক নানা স্থানে সভা করিয়া কংগ্রেসের উদ্দেশ্য প্রচার করিতে লাগিলেন। সুরেশ বাবু ছিলেন বগুড়ার একজন বিখ্যাত উকীল ও একজন প্রসিদ্ধ বক্তা। যতীন

বাবু একজন সুশিক্ষিত ও নীরব কর্মী। মওলানা সাহেব তখন সমগ্র দেশে একজন খ্যাতিমান বাগ্মী। তাঁহাদের বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া জনসাধারণ কংগ্রেসের প্রতি ক্রমে ক্রমে আকৃষ্ট হইতে লাগিল। দেশের সর্বত্র এইরূপ প্রচারকার্য চলিল।

জনসাধারণের কল্যাণকার্যে আমরা আত্মনিয়োগ করিলাম। ক্রমে মানুষ আমাদিগকে প্রীতির চক্ষে দেখিতে লাগিল। বিলাতী দ্রব্য বর্জন করিতে গিয়া মাড়োয়ারীগণ আমাদিগকে নাজেহাল করিতেছিল। বহু অনুরোধ-উপরোধ করিয়াও কোন ফল হইল না। বিলাতী দ্রব্য আমদানি চলিতে লাগিল। অবশেষে উহাদিগকে সামাজিকভাবে বয়কট করা স্থির হইল। বয়কট ঘোষণা করার পর উহাদের খুব অসুবিধা হইল। তরি-তরকারি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সংগ্রহ করা কঠিন হইয়া পড়িল। প্রত্যুষে মাঠে জমিনে মাড়োয়ারীদের পায়খানা করার অভ্যাস। মাঠে যাহাতে তাহারা অন্যের জমিতে পায়খানা করিতে না পারে তাহার ব্যবস্থা করা হইল। মাড়োয়ারীগণ থানায় অভিযোগ করিয়াও সফলকাম হইল না। অবশেষে তাহারা বিলাতী বস্ত্র আমদানী করিবে না বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় তাহাদের বিরুদ্ধে বয়কট প্রত্যাহার করিয়া লওয়া হইল।

হিলির অন্যতম কংগ্রেস কর্মী ছিলেন প্রতাপচন্দ্র মজুমদার। বিপ্লবী দলভুক্ত সন্দেহে সরকার তাঁহাকে কারারুদ্ধ করেন। কাজেই তিনি আমাদের সঙ্গে থাকিয়া কাজ করিতে পারেন নাই। বসন্তকুমার দাস হিলিতে সুপারির ব্যবসা করিতেন। তিনি জনসাধারণের কাজে একান্তভাবে আত্মনিয়োগ করায় তাঁহার ব্যবসায় যথেষ্ট ক্ষতি হইতে লাগিল। তিনি উহা গ্রাহ্য না করিয়া কর্তব্য কার্য চালাইয়া যাইতে লাগিলেন। চরকায় সুতা কাটিয়া তাঁতে কাপড় প্রস্তুত চলিতে লাগিল। এই কাপড়ের নাম হইল খদ্দর। কংগ্রেস-সেবী প্রত্যেককেই খদ্দর পরিতে হইত। স্থানীয় জনহিতকর প্রতিষ্ঠানগুলি পরিচালনা করা এবং জনসাধারণের সেবা করাই ছিল আমাদের প্রধান কর্তব্য। মধ্যে মধ্যে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণকে আনাইয়া সভা করিয়া কংগ্রেসের উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দেওয়া হইত। কংগ্রেস-ভীতি ক্রমশঃ মানুষের মন হইতে সরিয়া যাইতে লাগিল। আমরা জনসাধারণের প্রীতিভাজন হইতে লাগিলাম।

(১২)

উত্তরবঙ্গে বন্যা

বাংলা ১৩২০ সালের ৪ঠা আশ্বিন। ভীষণ বন্যায় বগুড়া ও রাজশাহী জেলা

ভাসিয়া গিয়াছিল। সান্তাহার বগুড়া রেল-লাইন প্রায় নিশ্চিহ্ন এবং সান্তাহার হিলি লাইনের জামালগঞ্জের নিকট ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। টেলিগ্রাফের তার ছিন্ন হইয়া সংবাদ আদান-প্রদান বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। হিলির স্টেশন মাস্টার সুরেন্দ্রনাথ বসু আমাদিগকে জানাইলেন, জামালগঞ্জ স্টেশনে ২।৩ হাজার লোক আশ্রয়হীন হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। আপনারা যত শীঘ্র সম্ভব পারেন অভুক্ত নরনারীদের আহারের ব্যবস্থা করুন। পার্বতীপুর হইতে দুইটি মালগাড়ী পাঠাইবার জন্য আমি ফোন করিয়াছি। আপনারা চাল-চিড়া, মুড়ি-মুড়কি যাহা পারেন সংগ্রহ করিয়া যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হউন। আমরা এই দারুন সংবাদ শুনিয়া বাজার হইতে ২৪।২৫ মণ চাল-চিড়া, মুড়ি-মুড়কি সহ দশ-বার জন স্বেচ্ছাসেবক মালগাড়ীতে জামালগঞ্জে রওনা হইলাম। পথে পাঁচবিবি ও জয়পুরহাটে আরও ৩০।৩২ মণ চাউল পাওয়া গেল। রেল-লাইনের উপর দিয়া বন্যার স্রোত যাইতেছিল। ইঞ্জিন অতি সতর্কতার সহিত আমাদিগকে লইয়া জামালগঞ্জ স্টেশনে পৌছিল। জ্যোৎস্না রাত ছিল। চারিদিকে বন্যার যে ভয়াবহ দৃশ্য দেখিলাম তাহার বর্ণনা দেওয়া অসম্ভব। স্টেশনের উভয় পার্শ্বে সিকি মাইল পরিমাণ রেল-লাইন জাগিয়া আছে। আর কোন দিকে স্থলের কোন চিহ্নমাত্র দেখা যাইতেছে না। জামালগঞ্জ বাজারের উপর দিয়া বন্যার স্রোত বহিয়া যাইতেছে। চারিদিকে অথৈ পানি ব্যতীত ঘরবাড়ীর চিহ্নমাত্র দেখা যায় না। আমরা পৌছিবার সঙ্গে সঙ্গে বুভুক্ষু নরনারীর দল আমাদিগকে ঘিরিয়া ধরিল। আমরা সারা রাত্রি ধরিয়া খাদ্যদ্রব্য বিতরণ করিলাম। আগুন জ্বালাইবার কোন উপায় না থাকায় ক্ষুধার্ত মানুষেরা কাঁচা চালগুলি পানিতে ভিজাইয়া চিবাইয়া খাইতে লাগিল।

ট্রেন যাত্রিগণের মধ্যে অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং বিশিষ্ট পরিবারের লোক ছিলেন। তাঁহারাও সমানই দুর্দশার সম্মুখীন। ভিজা চাল তাঁহারাও খাইতে লাগিলেন। আমরা পরদিন হিলিতে ফিরিয়া আসিলাম। হিলির বদান্য মিল মালিক ও মহাজনগণের নিকট হইতে আরও একশত মণ চাউল সংগ্রহ করিয়া জামালগঞ্জে পৌছিলাম। আমাদের স্বেচ্ছাসেবকগণ কলা গাছের ভুর তৈয়ার করিয়া তাহাতে চড়িয়া গ্রামে গ্রামে যাইয়া চাউল বিতরণ করিতে লাগিল। তিন দিন পর টেলিগ্রাম ও ডাক চলাচলের ব্যবস্থা হইল। আমি চারিদিকে এই ভয়াবহ বন্যার সংবাদ পাঠাইতে লাগিলাম। সংবাদপত্রে প্রবন্ধ লিখিয়া বন্যাপীড়িত নরনারীদের অবর্ণনীয় দুর্দশার কথা প্রকাশ করিতে লাগিলাম। আমাদের স্বেচ্ছাসেবকগণ পার্বতীপুর জংশনে প্রতি ট্রেন ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেশ কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া আনিতে

লাগিল। সংবাদপত্রে বন্যার ভয়াবহ সংবাদ প্রকাশ হওয়ার ফলে দেশে একটা চাঞ্চল্য ও উৎকণ্ঠার সৃষ্টি হইল। চারিদিক হইতে মনিঅর্ডারে টাকা আসিতে লাগিল। কলিকাতার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি প্রসিদ্ধ দেশনেতা বীরেন্দ্রনাথ শাসমল ও সেক্রেটারি সাতকড়িপতি রায় আমার টেলিগ্রামের জবাবে জানাইলেন—কাজ চালাইতে থাকুন। শীঘ্রই ব্যবস্থা হইতেছে।

(১৩)

রিলিফ কমিটি

কলিকাতায় রিলিফ কমিটি গঠিত হইল। দেশবরেণ্য মনীষী আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় সভাপতি ও তরুণ যুবক প্রিয়দর্শন সুভাষচন্দ্র বসু সেক্রেটারি নির্বাচিত হইয়াছেন। ইতিমধ্যে বরিশালের ব্রজমোহন কলেজ, রাজশাহী কলেজ ও রংপুর কারমাইকেল কলেজের ছাত্রগণ সেবাকার্যে অংশ গ্রহণ করিতে আসিয়াছেন। প্রায় দুই সপ্তাহ পর কলিকাতা হইতে রিলিফ কমিটি দলবল সহ সান্তাহারে পৌঁছিল। রেল স্টেশনের উপরে বিরাট তাঁবুতে অফিস বসিল।

৪২টি সেণ্টার ভাগ করিয়া সেবাকাজ চলিতে লাগিল। নওগাঁ অঞ্চলে রামকৃষ্ণ মিশন ২।৩টি সেবাকেন্দ্র চালাইতে ছিলেন। মুসলিম লীগের পক্ষ হইতে মওলানা মুনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী ও সৈয়দ জামালউদ্দীন হাসেমী আত্রাই অঞ্চলে একটি সেবাকেন্দ্র খুলিয়া কাজ চালাইতে লাগিলেন। আমরা পূর্ব হইতেই জামালগঞ্জ অঞ্চলে কাজ করিতেছিলাম। এখন বেঙ্গল রিলিফ কমিটির অধীনে জামালগঞ্জ, সোনামুখী ও পাঁচবিবির সেবাকেন্দ্রের কাজের ভার আমার উপর পড়িল। প্রায় ৩০ জন স্বেচ্ছাসেবক আমার কাজের সহযোগিতা করিতেছিল। বেঙ্গল রিলিফ কমিটির কেন্দ্রগুলির সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য ইনস্পেকটরগণ প্রতি সপ্তাহে হিসাব-নিকাশ পরিদর্শন করিতেন।

বিলাত হইতে সদ্য আই.সি.এস. পাস শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু স্বেচ্ছায় এই জনসেবার কাজে আগাইয়া আসিয়াছেন। তাঁহার এত কর্মদক্ষতা ও নিঃস্বার্থ সেবাকাজ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। আমার সহকর্মী স্বেচ্ছাসেবক দলের মধ্যে অধিকাংশই কলেজের ছাত্র। এই শিক্ষিত ভদ্রঘরের সন্তানগণ শারীরিক ক্লেশ ও বহু অসুবিধার মধ্য দিয়া আমার নির্দেশমত গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া দুঃস্থ জনসাধারণের সেবা করিয়াছেন। সেই কথা চিন্তা করিলে শ্রদ্ধায় মন ভরিয়া উঠে।

বেঙ্গল রিলিফ কমিটির সভাপতি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক, কলিকাতা বিজ্ঞান কলেজের রসায়নের অধ্যাপক ও সুবিখ্যাত নেতা। তিনি প্রতি সপ্তাহে তাঁহার অসংখ্য কাজ পরিত্যাগ করিয়া রিলিফ কার্য পরিদর্শনের জন্য সান্তাহারে আসিতেন। প্রথম যেদিন তিনি সান্তাহারে আসেন, আমরা তাঁহার সঙ্গে দেখা করার জন্য যাই। প্রত্যেক কেন্দ্র হইতেই কর্মকর্তাগণ আসিয়াছিলেন। এই বিশ্বব্যাপী খ্যাতির অধিকারী অকৃতদার সর্বজনশ্রদ্ধেয় বিরাট পুরুষকে দেখিবার আগ্রহ বহুদিন হইতেই ছিল। একটি ফার্স্ট ক্লাস সেলুনে তিনি বসিয়াছিলেন। বগুড়ার জননেতা যতীন্দ্রমোহন রায় কর্মীদের সহিত তাঁহার পরিচয় করিয়া দিতেছিলেন। দেখিলাম দর্শনপ্রার্থী যুবকগণকে তিনি সস্নেহে দু-একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া আন্তরিকতার সঙ্গে গায়ে মাথায় হাত বুলাইয়া দিতেছেন। শুভ্র খদ্দরের ধুতি ও গায়ে একটি জামা, অযত্ন বিস্রস্ত চুল, দীর্ঘশ্মশ্রুবিশিষ্ট একটি আপন ভোলা মানুষকে দেখিলাম। আশা করিয়াছিলাম যেমন বিশ্বব্যাপী খ্যাতি, তেমনি পোশাক-পরিচ্ছদের পরিপাট্য ও চেহারার জৌলুষ থাকিবে নিশ্চয়ই। কিন্তু সেদিক দিয়া নিরাশ হইলেও যাহা দেখিলাম তাহাতে আত্মা তৃপ্ত হইল, শ্রদ্ধায় মন ভরিয়া উঠিল।

জামালগঞ্জের ডাক পড়িতেই আমি কম্পিত হৃদয়ে তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইলাম। তিনি প্রশ্ন করিলেন—আফতাবউদ্দীন কাহার নাম। আমি এক সেলাম দিয়া তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতেই—'বাবা এস' বলিয়া তিনি আমাকে কাছে ডাকিয়া লইয়া পাশে বসাইলেন। সস্নেহে গায়ে মাথায় হাত বুলাইয়া বলিলেন—সংবাদপত্রে তোমার লিখিত বন্যার ধ্বংসলীলার কাহিনী পাঠ করিয়া আমি বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিলাম। তোমরাই সর্বপ্রথম বিপন্ন মানুষকে রক্ষা করিতে অগ্রসর হইয়াছিলে। তোমার প্রচারের ফলেই এত সত্বর ব্যাপকভাবে সাহায্যের ব্যবস্থা করা সম্ভবপর হইয়াছে। এই বলিয়া তিনি আমার প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং বাম হস্তে গলদেশ বেষ্টন করিয়া আরও কাছে টানিয়া লইলেন। তাঁহার স্নেহের পরশ পাইয়া নিজকে ধন্য মনে করিলাম।

সকলের পরিচয়ের পালা শেষ হইলে নিকটের একটি পল্লীতে বন্যার ধ্বংসলীলা স্বচক্ষে দর্শন করিবার জন্য তিনি সদলবলে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার গায়ের সাধারণ খদ্দরের কোটটির একদিকের পকেট ঝুলিয়া পড়িয়াছে। বোতামগুলি অসংলগ্নভাবে আটকান। দক্ষিণ হস্তে তাঁহার চেহারার অনুরূপ বাঁশের একখানা লাঠি। বাম হস্ত আমার কণ্ঠবেষ্টিত। দলে দলে লোক আমাদের পিছনে চলিয়াছে। রিলিফ-

ক্যাম্পের তাঁবুর নিকট আসিয়া আমাকে বলিলেন—চল সুভাষের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দেই। তাঁবুতে ঢুকিয়া হাঁক দিলেন—আরে সুভাষ, একে তুমি চেন? সুভাষ বাবু ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—আজ্ঞে। হাঁ, বেশ ভাল করেই চিনি।

তবে ত আমার পরিচয় করিয়ে দেওয়া বৃথা। বেশ, বেশ, কাজ করে যাও। ও বেটা সিভিল অফিসের গর্দভ। সরকারী চাকুরি, মোটা বেতন, আরাম আয়েশ সব ছেড়ে দেশ উদ্ধার করতে এসেছে। অতঃপর সুভাষ বাবুর গাল টিপিয়া, চুল টানিয়া সস্নেহে গায়ে মাথায় হাত বুলাইয়া নিষ্ঠার সহিত কাজ করিয়া যাইতে উপদেশ দিলেন। অন্যান্য কর্মীদিগকেও গায়ে মাথায় হাত বুলাইয়া মনোযোগ-সহকারে কাজ করিতে বলিলেন।

গ্রামের দিকে অগ্রসর হইতেই বগুড়ার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আভূমি প্রণত হইয়া সম্মুখে দাঁড়াইলেন। আচার্যদেব তাঁহাকে মৃদু ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন—তোমার কার্যে আমি সুখী নই। তুমি জেলার কর্তা, অথচ বন্যাপীড়িত দুঃস্থদের সময়মত কোন খোঁজখবর তুমি লও নাই। কোন দুর্গত এলাকাতেও তুমি যাও নাই।

জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বলিলেন—স্যার, এ অপরাধ আমার ইচ্ছাকৃত নয়। এদেশে নৌকা নাই। রেল-লাইন নষ্ট হইয়া যাওয়ায় কোন দিকেই যাওয়ার কোন উপায় ছিল না।

আচার্যদেব তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন—তুমি আমার ছাত্র। দুর্গত মানবের সেবায় আত্মনিয়োগ করাই এখন তোমার প্রধান কর্তব্য। সেবাকাজে নিয়োজিত কর্মিগণের প্রতি দৃষ্টি রাখিও। তাদের কোন অসুবিধা না হয়। অতঃপর বন্যাবিধ্বস্ত গ্রামটির অবস্থা দেখিয়া তিনি অশ্রুসজল নেত্রে ফিরিয়া আসিলেন।

প্রায় প্রতি সপ্তাহে তিনি সান্তাহারে আসিতেন ও আমাদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করিয়া সমস্ত অবস্থা অবগত হইতেন। কর্মজীবনে এই মহা মনীষীর সাহচার্য লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছি। প্রায় ছয় মাস ধরিয়া রিলিফ কার্য চলিয়াছিল। গৃহনির্মাণ, বীজধানের জন্য অর্থ সাহায্য দেওয়া হইতেছিল। এই সময় রামকৃষ্ণ মিশনের পক্ষ হইতে সংবাদপত্রে প্রকাশ করা হইল যে, বন্যাপীড়িতদের সাহায্যের আর কোন প্রয়োজন নাই। এখন ইহাদিগকে সাহায্য করার অর্থ মানুষকে শ্রমবিমুখ করিয়া অলসতার প্রশ্রয় দেওয়া। রামকৃষ্ণ মিশন একটি দায়িত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। অন্নবস্ত্র ও গৃহহীন মানুষকে সাহায্য দেওয়ার প্রয়োজন নাই কেমন করিয়া তাঁহারা এই কথা বলিলেন আমরা ভাবিয়া অবাক হইলাম। সুভাষ বাবুর সঙ্গে পরামর্শ

করিয়া এই অন্যায় উক্তির প্রতিবাদ করিতে হইবে বলিয়া স্থির হইল। আমার উপরেই প্রতিবাদ লিখিয়া সংবাদপত্রে প্রকাশের ভার পড়িল।

এই সময় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির এক সভায় যোগদান উপলক্ষে সুভাষ বাবুসহ ১৫।১৬ জন কলিকাতা রওয়ানা হইলাম। একটি তৃতীয় শ্রেণীর কামরাতে সারা রাত্রি হৈহল্লা করিয়া ও সুভাষ বাবুর বিলাত প্রবাসের গল্প শুনিতে শুনিতে ভোরে কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিলাম। রামকৃষ্ণ মিশনের উক্তির প্রতিবাদ পত্রখানা সঙ্গে আনিয়াছিলাম। সায়েন্স কলেজে গিয়া আচার্য রায়কে উহা দেখাইয়া প্রেসে দেওয়া উচিত মনে করিলাম। কলিকাতা হাইকোর্টের বিখ্যাত ব্যবহারজীবী ডাঃ রাসবিহারী ঘোষ ও স্যার তারকনাথ পালিতের বহু লক্ষ টাকা দানের ফলে সুবিশাল বিজ্ঞান কলেজ ভবনটি নির্মিত হইয়াছে। কলেজ ভবনের দ্বিতলে সন্ধান লইয়া আচার্য রায়ের কামরার সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম রাশিকৃত পুস্তক ও সংবাদপত্রবেষ্টিত একটি সাধারণ খাটিয়ার উপর কম্বল বিছাইয়া অর্ধশায়িত অবস্থায় তিনি সংবাদপত্র পাঠ করিতেছেন। পদশব্দে আমার দিকে তাকাইয়া উঠিয়া বসিলেন। ঈষৎ কোপিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদপত্রে কি লিখিয়াছে, দেখিয়াছ? তোমরা কি ঘুমাইয়া আছ? তুমিই বল, লোকগুলির সাহায্যের প্রয়োজন আছে কি না? উত্তরে বলিলাম—হাঁ স্যার, নিশ্চয়ই প্রয়োজন আছে। তিনি বিরক্তি প্রকাশ করিয়া বলিলেন—প্রয়োজন আছে তবে চুপ করিয়া বসিয়া আছ কেন? প্রতিবাদ করা উচিত ছিল না? আমি বিনীতভাবে বলিলাম—প্রতিবাদপত্র লিখিয়া আনিয়াছি। উহা আপনাকে দেখাইয়া প্রেসে দিব। তিনি বলিলেন—কৈ, কি লিখিয়াছ দেখি? আমাকে পাশে বসাইয়া পড়িতে বলিলেন। আমি পড়িতে লাগিলাম। তিনি উহা শুনিয়া আমার পিঠ চাপড়াইয়া বলিলেন—বাঃ, বেশ হইয়াছে। মুখের মত জবাব দিয়াছ। ইহার ইংরাজী কপি কোথায়? আমি মাথা নীচু করিয়া বলিলাম—স্যার, ইংরাজী জানি না। যেটুকু জানি, তাহা দিয়া প্রবন্ধ রচনা করা চলে না। তিনি আমার মুখের দিকে তাকাইয়া বলিলেন—ইংরাজী শিখ নাই, লিডার হইতে চলিয়াছ, এ কেমন কথা? পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—তোমার বয়স কত? বলিলাম—৩২ বৎসর। তিনি বলিলেন—তুমি তো এখনও বালক। আমার বয়স কত জান? ৭০ অতিক্রম করিয়াছে। আমি এখনও ছাত্র। নিয়মিত পড়াশুনা করিয়া থাকি। তুমি পড়, জ্ঞান সঞ্চয়ের জন্য বয়সের সীমা বাধা হইতে পারে না কখনই। চেষ্টা করিলেই শিখিতে পারিবে।

আচার্যদেবের সেই উক্তি স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া রাখিবার যোগ্য। আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে আজিও উহা স্মরণ করিয়া থাকি। অতঃপর কলেজের একটি ছাত্রকে ডাকিয়া প্রবন্ধটির ইংরাজী অনুবাদ করিতে বলিলেন। ইংরাজী, বাংলা ৫।৬ কপি লিখাইয়া আমার দস্তখত লইয়া প্রেসে পাঠাইয়া দিলেন। পরদিন দেখি প্রধান প্রধান বাংলা ইংরাজী কাগজে উহা প্রকাশিত হইয়াছে।

মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী ও সৈয়দ জালালউদ্দীন হাশেমীর কথা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। মওলানা ইসলামাবাদী স্বনামধন্য দেশসেবক, সাংবাদিক ও বক্তা ছিলেন। অধঃপতিত মুসলিম সমাজের উন্নতির জন্য এই আত্মত্যাগী পুরুষ যাহা করিয়া গিয়াছেন তাহার তুলনা নাই। হাসেমী সাহেব অ্যাসেমব্লির ডেপুটী স্পিকার, কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার ও তেজস্বী বক্তা ছিলেন। বাঘ শিকার করিতে গিয়া তিনি এক পা হারাইয়া ফেলেন। এক পা লইয়া তিনি ক্রাচের সাহায্যে সারা দেশ ঘুরিয়াছেন। তাঁহার স্পষ্টবাদিতার জন্য সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিত। আইনপরিষদে তাঁহার বক্তৃতা সরকারের পক্ষে ভীতির কারণ ছিল। রিলিফ কার্য উপলক্ষে তাঁহাদের সহিত দেখাসাক্ষাৎ ও আলাপ-আলোচনার ফলে যথেষ্ট সৌহার্দ জন্মিয়াছিল। পরবর্তী কালে কলিকাতার কড়েয়া রোডে তাঁহার বাড়ীতেই আমাদের আস্তানা বসিয়াছিল। মওলানা ইসলামাবাদী সাহেব ও হাসেমী সাহেব কয়েকবার আমার বাড়ীতে আসিয়াছিলেন। হাসেমী সাহেব অকালে ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে পরলোক গমন করেন।

রায় বাহাদুর জানকীনাথ বসু কটকের সরকারী উকীল ও জমিদার ছিলেন। তাঁহার কৃতী পুত্রগণের মধ্যে সুভাষচন্দ্র অন্যতম। ২৬ বৎসর বয়সের এই পরম সুন্দর যুবকটির অমায়িক প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার দেখিয়া সকলেই আকৃষ্ট হইল। দীর্ঘ ছয় মাস একত্রে সহকর্মিরূপে কার্য করিয়া তাঁহার কর্মদক্ষতা ও মধুর ব্যবহার আমাকে মুগ্ধ করিয়াছিল।

রিলিফ কেন্দ্রের লক্ষ লক্ষ টাকার হিসাব শেষ না করিয়া তিনি ক্ষান্ত হইতেন না। পৌষের শীতের রাত্রে কোন দিন শুইতে তাঁহার দুইটা বাজিয়া যাইত। ১৫।১৬ জন অফিসকর্মী তাঁহাদের কাজ শেষ করিয়া আহারাদির পর ঘুমাইতেছেন, অথচ সুভাষচন্দ্র তখনও হিসাবের খাতায় মগ্ন হইয়া আছেন। একদিনের কথা বলিতেছি। সেদিন কলিকাতা হইতে টাকা আসে নাই বলিয়া আমাকে সান্তাহারে থাকিতে হইল। রাত্রি ১টার সময় সুভাষ বাবু আমাকে সঙ্গে লইয়া লঙ্গরখানার দিকে চলিলেন।

আমার খাবার প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু আমাকে ছাড়িয়া কিছুতেই তিনি খাইবেন না। অগত্যা তাঁহার সঙ্গে চলিলাম। সান্তাহার স্টেশন হইতে খাবার স্থানটি বেশ খানিকটা দূরে বাজারে এক জমিদারের কাছারি বাড়ীতে ছিল। দুই জনে আহারে বসিলাম। ডাল, মোটা চালের ভাত ও একটা নিরামিষ তরকারি। মুসলমান বাবুর্চিরা রান্না করে। তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, আহারের এই একমাত্র সনাতন ব্যবস্থা। কদাচিৎ ক্ষুদ্র মাছের ঝোল হয়। আশ্চর্য হইয়া ভাবিতে লাগিলাম—ধনীর দুলাল বিলাতফেরত একজন সিভিলিয়ন কি করিয়া এই-রূপ সাধারণ আহারে দিন কাটাইতেছেন।

উভয়ে তাঁবুতে ফিরিয়া আসিতেছি। প্রায় নিকটে আসিয়া সুভাষ বাবু হঠাৎ বলিলেন—ও হোঃ! ভুল হইয়াছে। আবার আমাকে বাবুর্চি খানায় ফিরিয়া যাইতে হইবে। আপনি তাঁবুতে যান, আমি আসিতেছি। তিনি তৎক্ষণাৎ চলিয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পর দেখি একটা পোঁটলা ঘাড়ে করিয়া সুভাষ বাবু আসিতেছেন। জিজ্ঞাসা করিলাম—ঘাড়ে ওটা কি? তিনি বলিলেন—আপনার জন্য কম্বল। তখন আনিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম। আমি বলিলাম—আমিই তো ছিলাম, আমাকে আনিতে বলিলেন না কেন? তিনি বলিলেন—তাকি আর হয়? আপনি আমার অতিথি। সুতরাং অতিথিসেবা আমার কর্তব্য।

পৌষের প্রচণ্ড শীতে রিলিফের জন্য সাধারণ পশমী কম্বলগুলি মেজেতে খড়ের উপর ডবল করিয়া বিছাইয়া ঐ কম্বল গায়ে দিয়া দু-জনেই শুইয়া পড়িলাম। তাঁবুর মধ্যে সকলের একই ব্যবস্থা। মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম রাজপুত্রের এই কৃচ্ছ-সাধনা কেন? তুমি তো সামান্য লোক নও?

(১৪)

গয়া কংগ্রেস—১৯২২

অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেসের গয়া অধিবেশন নিকটবর্তী হইয়া আসিল। কথা হইল—সুভাষ বাবু কলিকাতায় গিয়া টেলিগ্রাম করিবেন। সেই অনুযায়ী আমরা রওয়ানা হইব। আমরা পূর্বেই ডেলিগেট নির্বাচিত হইয়াছিলাম। যথা সময় টেলিগ্রাম পাইয়া বসন্ত বাবু ও বগুড়ার কয়েকজন ডেলিগেট একত্রে কলিকাতা পৌঁছিলাম। পরদিন ২৯শে ডিসেম্বর দেশবন্ধু দাশ, সুভাষ বাবু ও বিভিন্ন জেলা হইতে

আগত ডেলিগেটগণ সহ গয়া এক্সপ্রেসে রওয়ানা হইলাম। আমরা ট্রেনে বসিয়া ছুটিয়া চলিয়াছি। আসানসোল জংশনের পর পার্বত্য পথে প্রাকৃতিক দৃশ্য বড় সুন্দর। অনেকগুলি পাহাড় ভেদ করিয়া রেল-লাইন চলিয়া গিয়াছে। শোন নদের উপর ভারতের দীর্ঘতম রেল সেতু 'শোন ব্রীজ' অতিক্রম করিয়া গয়া পৌঁছিলাম ২৯শে ডিসেম্বর। আমার সহকর্মী বসন্তকুমার বাবু হিলির একজন নিষ্ঠাবান কংগ্রেস কর্মী। বসন্ত বাবু আমাকে গুরুজী বলিয়া সম্বোধন করিতেন। স্থানীয় যাবতীয় জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত তাঁহার যোগ ছিল। এই সদানন্দযুক্ত ব্যক্তি অকালে ইহলোক ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন।

গয়া হিন্দুতীর্থ। একজন পাণ্ডা ঠাকুর আমাদিগকে তীর্থযাত্রী মনে করিয়া ঘিরিয়া ধরিল। পুরাদস্তুর জাতীয় পোশাকে সজ্জিত থাকা সত্ত্বেও আমাকে তাহারা পিণ্ডিদানকারী মনে করিয়া টানাটানি করিতে লাগিল। আমরা কংগ্রেস ডেলিগেট, বিশেষতঃ আমি এবং এই বন্ধুরা মুসলমান, এই কথা বুঝাইয়া বলিলে তাহারা আমাদিগকে ছাড়িয়া দিল।

গয়া শহরের অনতিদূরে অন্তঃসলিলা ফল্গু নদীর তীরে জাতীয় মহাসমিতির বাৎসরিক অধিবেশন বসিতেছে। লক্ষ লোকের সমাবেশে এক নূতন ধরনের অস্থায়ী শহর গড়িয়া উঠিয়াছে। এ শহরে দালান কোঠা নাই। অস্থায়ী পোস্ট অফিস, টেলিগ্রাফ অফিস ও হাসপাতাল বসিয়াছে। সমস্তই পর্ণকুটির। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে আগত ডেলিগেটদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ক্যাম্প চিহ্নিত করা হইয়াছে। বোম্বে, মাদ্রাজ, সিন্ধু, পাঞ্জাব, বাংলা, বিহার, আসাম, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি প্রদেশের বিভিন্ন জাতি ও ভিন্ন ভাষাভাষী নানা রঙের লক্ষ লক্ষ খদ্দর-পরিহিত জনগণের একত্র সমাবেশে কংগ্রেস নগর মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। বিদেশী শাসকের রক্ত চক্ষুকে ভ্রূকুটি দেখাইয়া বন্দেমাতরম ও আল্লাহ আকবর ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত হইতেছে। মুক্তিপাগল নরনারীর এই অভূতপূর্ব মিলনদৃশ্য ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভব নহে।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন। রেল স্টেশন হইতে রাজকীয় অভ্যর্থনা সহকারে তাঁহাকে সভাস্থলে আনয়ন করা হইল। ডাঃ আনসারী, ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ, পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু প্রমুখ নেতাগণ তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। মওলানা মোহাম্মদ আলী, মওলানা শওকত আলী অন্তরীণে আবদ্ধ থাকায় সভায় যোগদান করিতে পারেন নাই। প্রচণ্ড শীতের রাত্রে ফল্গু নদীর

তীরে আলী ভ্রাতৃদ্বয়ের মাতা অশীতিবর্ষবয়স্কা বি. আম্মা লক্ষ লোকের সমাবেশে বক্তৃতায় বলিলেন—আমার দুই পুত্র আজ ইংরেজদের কারাগারে বন্দী। মাতৃভূমির মুক্তিকামনায় তাহাদিগকে আমি উৎসর্গ করিয়া দিয়াছি। আমার আরও দশটি পুত্র থাকিলে তাহাদিগকেও আমি এই মহৎ কাজে নিয়োজিত করিতাম। তোমরা আমার সন্তান। মায়ের আদেশে অকুতোভয়ে অগ্রসর হও। পরাধীনতার নাগপাশ হইতে দেশকে মুক্ত কর। আল্লাহ্ আমাদের সহায়।

এই তেজস্বিনী মহিলার বক্তৃতায় সভায় ভীষণ উত্তেজনার সৃষ্টি হইল। লক্ষ কণ্ঠের মুহুর্মুহু 'মাইজীকা জয়' ধ্বনিতে সভাস্থল মুখরিত হইতে লাগিল। লক্ষাধিক লোকের বসিবার উপযোগী বিরাট প্যাণ্ডেল প্রস্তুত হইয়াছে। বিভিন্ন প্রদেশের ডেলিগেটগণ তাহাদের জন্য নির্দিষ্ট স্থানে বসিয়াছেন। চেয়ার টেবিলের কারবার নাই। মাটি কিছু উঁচু করিয়া খড়ের উপরে চাটি বিছাইয়া বসিতে দেওয়া হইয়াছে। বক্তৃতামঞ্চের নিকট বিভিন্ন দেশ হইতে আগত সংবাদপত্রের প্রতিনিধিগণ ও সরকারী রিপোর্টারগণ নিজেরা বসার জন্য চেয়ার টেবিলের ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছেন। উর্দু, ইংরাজী ও হিন্দী ভাষায় মুদ্রিত সভাপতির অভিভাষণ ডেলিগেটগণের মধ্যে বিতরিত হইল। অবিলম্বে তিনি বলিলেন—সরকারী ধামাধরা মেম্বরদের সমর্থনে অ্যাসেমব্লী ও কাউন্সিলে দমনমূলক আইনগুলি পাস করিয়া আইনের দোহাই দিয়া কর্মীদের উপর সরকার অত্যাচার চালাইতেছে। একদল কংগ্রেসীকে নির্বাচনে দাঁড় করাইয়া আইনসভাগুলি দখল করিতে হইবে বলিয়া মত প্রকাশ করেন। দেশের স্বার্থবিরোধী বেআইনী আইনগুলি যাহাতে আইনসভায় পাস হইতে না পারে, তজ্জন্য প্রবল বাধার সৃষ্টি করিতে হইবে।

(১৫)

পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু, ডাঃ আনসারী ও আরও অনেকে দেশবন্ধুর মত সমর্থন করিলেন। কিন্তু রাজা গোপালআচারী, ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রমুখ নেতাগণ বিরুদ্ধে দাঁড়াইলেন। দেশবন্ধু তাঁহার সমর্থনকারীদের লইয়া গয়াতেই স্বরাজ্য পার্টি গঠন করার সিদ্ধান্ত করিলেন। বাংলা কংগ্রেসের শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, হরদয়াল নাগ প্রমুখ নেতাগণ দেশবন্ধুর বিরুদ্ধে দাঁড়াইলেন। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, সুভাষচন্দ্র বসু, কিরণশঙ্কর রায়, বসন্ত মজুমদার প্রভৃতি দেশবন্ধুর সঙ্গেই যোগদান করেন। দুই দলে প্রবল বিরোধ আরম্ভ হইল। মত দ্বৈধতার

মধ্য দিয়া কংগ্রেসের অধিবেশন শেষ হইল। আমরা গয়ার দর্শনীয় স্থানগুলি দেখিবার উদ্দেশ্যে আরও দুই দিন থাকিয়া গেলাম।

হিন্দুর প্রধান তীর্থস্থানগুলির মধ্যে গয়া অন্যতম। পিতৃপুরুষদের পারলৌকিক কল্যাণ কামনায় হিন্দুগণ এখানে পিণ্ড দান করেন। প্রধান মন্দির ব্যতীত শহরের অলিতে গলিতে বহু মন্দির রহিয়াছে। কয়েকটি সুন্দর মসজিদও দেখিলাম। ফল্গু নদী অন্তঃসলিলা বলিয়া কথিত। বিস্তীর্ণ বালুকারাশির মধ্য দিয়া ফল্গুর ক্ষীণ রজত-ধারা ঝির ঝির করিয়া বহিয়া চলিয়াছে। হাত দিয়া বালি সরাইয়া লইলে স্নানের উপযোগী পরিষ্কার পানি পাওয়া যায়। পৌষের প্রচণ্ড শীতে ফল্গুর পানিতে গোসল করিয়া উঠিলে মনে হয় শরীরের রক্ত যেন জমাট হইয়া গিয়াছে।

বুদ্ধগয়া

গয়া শহরের ৬ মাইল দক্ষিণে বৌদ্ধ তীর্থ বুদ্ধগয়া অবস্থিত। দলে দলে লোক বুদ্ধগয়া দর্শনে যাইতেছে। আমরাও একটি দল মহাপুরুষ গৌতম বুদ্ধের সাধনার স্থান দেখিতে চলিলাম। দূর হইতে মন্দিরের সুউচ্চ চূড়া দেখা যাইতেছে। আমরা যখন ইতিহাসপ্রসিদ্ধ বোধিবৃক্ষের তলায় পৌঁছিলাম সূর্য তখন পশ্চিম আকাশে ঢলিয়া পড়িয়াছে। পুরাতন বোধিবৃক্ষ বহুদিন হইল লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। বর্তমান বটগাছটি সেই প্রাচীন বৃক্ষটির নাকি বংশধর। বৌদ্ধধর্মপ্লাবিত ভারতবর্ষে মহাত্মা শঙ্করাচার্যের আবির্ভাব এক বিস্ময়কর ঘটনা। এই স্বল্পজীবী অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসীর অসাধারণ প্রভাবে বৌদ্ধধর্ম নিজ জন্মভূমি হইতে নির্বাসিত হইয়া ব্রহ্ম, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, খুব সম্ভব ঐ সময় হইতে সুদীর্ঘকাল যাবত মন্দিরটি অযত্নে অরক্ষিত অবস্থায় ছিল। কালের অপ্রতিহত প্রভাবে উহার নিম্নাংশ মৃত্তিকায় প্রোথিত হইয়া যায়। বহু বৎসর পর মৃত্তিকা সরাইয়া উহা উদ্ধার করা হইয়াছে।

আমরা নিম্নাভিমুখে সোপানশ্রেণী অতিক্রম করিয়া ইহার ভিত্তিমূলে উপস্থিত হইলাম। সম্মুখেই প্রস্তরনির্মিত গৌতম বুদ্ধের বিরাট ধ্যানমগ্ন মূর্তি। মুণ্ডিত মস্তক গৈরিকবসন-পরিহিত পুরোহিত পালিভাষায় মন্ত্রপাঠ করিতেছেন। চীন ও ব্রহ্মদেশ হইতে আগত অনেক ভক্ত স্ত্রী-পুরুষ দেখিলাম। তাহাদের অবস্থানের জন্য দ্বিতল অতিথিশালা নির্মিত হইয়াছে। মন্দিরগাত্রে ও আশেপাশে অসংখ্য বৌদ্ধ মূর্তি খোদিত রহিয়াছে। মন্দিরের গঠনপ্রণালী হিন্দুস্থাপত্যের অনুরূপ নহে।

তাহা কতকটা শিয়া মুসলমানদের মহরমের তাজিয়ার আকারে সুদৃঢ় প্রস্তরের দ্বারা নির্মিত। অদূরে মোহন্ত মহারাজের প্রাসাদ। সামান্য একটা বাজার ও পোস্ট অফিস ব্যতীত তথায় দর্শনীয় আর কিছুই নাই।

আমরা প্রাসাদ দেখিতে গেলাম। জনৈক কর্মচারী আমাদিগকে মোহন্ত মহারাজের সমীপে লইয়া গেলেন। প্রাসাদের দ্বিতলে একটি প্রশস্ত কক্ষে মেঝেতে গদির উপরে তাকিয়া ঠেস দিয়া মোহন্ত মহারাজ বসিয়া আছেন। বয়স পঞ্চাশোর্ধ। মোহন্তসুলভ দিব্য নাদুস-নুদুস চেহারা, মুণ্ডিতমস্তক, পরিধানে গৈরিক বসন। আমরা অভিবাদন জানাইয়া কংগ্রেস ডেলিগেট বলিয়া পরিচয় দিলাম। আদেশ হইল "বইঠ, যাও বাবা, কাঁহাছে তশরীফ লায়ে হোঁ?" "জি কলকাত্তাসে"। "বহুত খুশীকা বাত হ্যায়, তবিয়ত তো আচ্ছা হ্যায় বাবা?" "জী হ্যাঁ, আপকা দোওয়া।" পার্শ্বে দণ্ডায়মান জনৈক পরিচারিকার প্রতি আদেশ হইল—"বাবা লোক কো কুচ খেলা দো।" প্রায় এক পোয়া ওজনের একটি করিয়া সুস্বাদু লাড্ডু ও পেড়া সহকারে অতিথিসৎকার করা হইল। অতঃপর আমরা বিদায় লইলাম।

মন্দিরের বহু দেবত্তোর সম্পত্তি আছে। বৌদ্ধমন্দির হইলেও মোহন্ত হিন্দু ধর্মাবলম্বী। বৌদ্ধগণ এইজন্য অত্যন্ত অসন্তুষ্ট। একজন বৌদ্ধ ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হইল। তাহার নিকট জানিতে পারিলাম বৌদ্ধ নেতাগণ হিন্দু মোহন্তের নিকট হইতে মন্দিরের সম্পত্তি ও কর্তৃত্ব উদ্ধারের জন্য চেষ্টা করিতেছেন। ভারত ও ভারতের বাহিরের বৌদ্ধ নেতাগণ ইংরেজ সরকারের নিকট আবেদন জানাইয়াছেন। ভদ্রলোক যুক্তি দিয়া বলিলেন—আমাদের ধর্ম-মন্দিরের কর্তৃত্ব আমাদের হাতে থাকিবে। অন্য ধর্মাবলম্বী সেখানে কর্তা হইয়া বসিবেন কেন? আমরা আর কি বলিব, দুনিয়ার সর্বত্র যদি ন্যায়-অন্যায়ের বিচার থাকিত তাহা হইলে ভারতে আজ ইংরেজ শাসন চলিতেছে কেন? ইংরেজের কারাগার ও ফাঁসির মঞ্চ উপেক্ষা করিয়া প্রচণ্ড শীতে গয়ার ফল্গুতীরে আজ লক্ষ লোকের সমাবেশ কেন? পরদিন ১লা জানুয়ারি দেশবন্ধুর আহ্বানে বেঙ্গল ক্যাম্পে একটি আলোচনা-বৈঠক বসিল, পণ্ডিত মতিলাল নেহরু, সুভাষচন্দ্র বসু প্রভৃতি নেতাগণ উপস্থিত ছিলেন। বর্তমানে কাউন্সিল ও অ্যাসেম্বলিতে সরকারী ধামাধরা মেম্বরগণের সাহায্যে দেশের স্বার্থবিরোধী আইনগুলি পাস করাইয়া ভারতের জনমতের নামে মিথ্যা প্রচার চালাইতেছে। উহা বন্ধ করিতে হইবে। আগামী ইলেকশনে আমরা প্রার্থী দাঁড় করাইব। অন্যায় ও স্বার্থবিরোধী আইনগুলি যাহাতে পাস হইতে না পারে তজ্জন্য চেষ্টা করা আমাদের প্রধান কার্য

হইবে। কিন্তু কংগ্রেস নেতাগণ অনেকেই কাউন্সিল প্রবেশের বিরোধী। সুতরাং আমাদিগকে একটি স্বতন্ত্র দল গঠন করিতে হইবে। উহা কংগ্রেসের আওতাভুক্ত থাকিয়া আগামী নির্বাচনে প্রার্থী দাঁড় করাইবে। ঐদিনই স্বরাজ্য পার্টি গঠন হইল। বিরোধী দল তুমুল হৈ চৈ আরম্ভ করিলেন। দেশবন্ধুর সঙ্কল্প টলিল না। পণ্ডিত নেহরু ও সুভাষ বাবু প্রমুখ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি স্বরাজ্য দলে যোগ দিলেন। মতদ্বৈধতার জন্য দেশবন্ধু কংগ্রেসের সভাপতিপদ ত্যাগ করিলেন। মোক্ষধাম বলিয়া কথিত গয়ায় মোক্ষলাভের পরিবর্তে বিষম দলাদলির সৃষ্টি করিয়া আমরা কলিকাতায় ফিরিলাম।

(১৬)

স্বরাজ্য দলের বৈঠক

৪ঠা জানুয়ারি (১৯২৩) দেশবন্ধুর রসা রোডের বাড়ীতে স্বরাজ্য দলের প্রথম বৈঠক বসিল। কুমিল্লার বসন্তকুমার মজুমদার তাঁহার সহধর্মিণী হেমপ্রভা মজুমদার (প্রসিদ্ধ সিনেমা-প্রযোজক সুশীলকুমার মজুমদারের পিতামাতা), ব্যারিস্টার কিরণ-শঙ্কর রায়, তুলসীচরণ গোস্বামী, শরৎচন্দ্র বসু, সুভাষচন্দ্র বসু, প্রতাপচন্দ্র গুহরায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (ঔপন্যাসিক), নলিনীরঞ্জন সরকার, সৈয়দ জালালউদ্দীন হাশেমী, সামসউদ্দীন আহমদ, গিয়াসুদ্দীন আহমদ, সৈয়দ নওসের আলী প্রভৃতি বহু বিখ্যাত ব্যক্তি বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

উত্তরবঙ্গের মুসলমান কর্মীদের মধ্যে সর্বপ্রথম আমি স্বরাজ্য দলে যোগদান করি। সারা ভারতে স্বরাজ্য দল গঠন উদ্দেশ্য প্রচারের জন্য কতিপয় বিশিষ্ট নেতার উপরে ভার দেওয়া হইল। দেশবন্ধু স্বয়ং মাদ্রাজ অঞ্চলে প্রচারে যাইবেন বলিয়া স্থির করিলেন। সভাশেষে উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণকে ভুরিভোজে আপ্যায়িত করা হইল। দেশবন্ধুর সুযোগ্যা সহধর্মিণী শ্রদ্ধেয়া বাসন্তী দেবী ও ভগিনী উর্মিলা দেবী উপস্থিত থাকিয়া তত্ত্বাবধান করিতেছিলেন। তাঁহাদের অনাবিল স্নেহের পরশ বহুবার পাইয়াছি।

দলের উদ্দেশ্যে প্রচার ও জনমত গঠনের জন্য দেশবন্ধু মাদ্রাজ গমন করিলেন। মাদ্রাজের জননায়ক রাজা গোপালাচারী স্বরাজ্য দলের বিরুদ্ধে ছিলেন। তিনি পাল্টা প্রচারের উদ্দেশ্যে সদলবলে বাংলায় আসিলেন। বগুড়া টাউনে এক বিরাট সভায় তাঁহার বক্তৃতা আমি প্রথম শুনিলাম। সহজবোধ্য প্রাঞ্জল ইংরেজী ভাষায় বক্তৃতা

দেওয়ার খ্যাতি তাঁহার ছিল। পরে অবশ্য বহুবার তাঁহার বক্তৃতা আমি শুনিয়াছি। দেশবন্ধু দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা করিয়া স্বরাজ্য দল গঠন করিতে লাগিলেন। ভারতব্যাপী কংগ্রেসে দুইটি দলের সৃষ্টি হইল। কাউন্সিল প্রবেশকারী দল 'প্রো-চেঞ্জার' ও বিরুদ্ধ দল 'নো-চেঞ্জার' নামে অভিহিত হইলেন। উভয় দল পরস্পরবিরোধী প্রচারকার্য চালাইয়া দেশের আবহাওয়া বিষাক্ত করিয়া তুলিলেন।

ফেব্রুয়ারি মাসে সুভাষ বাবুর টেলিগ্রাম পাইয়া কলিকাতায় স্বরাজ্য পার্টির মিটিংয়ে যোগদান করিলাম। আগামী নির্বাচনে দলের পক্ষ হইতে প্রার্থী নির্বাচন, প্রতি জেলায় স্বরাজ্য দলের অফিস-স্থাপন ও প্রচারকার্য পরিচালন জন্য কার্যারম্ভ করা স্থির হইল। দেশবন্ধু স্বয়ং সভায় উপস্থিত ছিলেন। অন্যান্য নেতাগণও ছিলেন। তখন কলিকাতার প্রসিদ্ধ সংবাদপত্রগুলি স্বরাজ্য দলের বিরুদ্ধে প্রচার-কার্য চালাইতেছিল। দলের পক্ষ হইতে একটি শক্তিশালী বাংলা দৈনিক প্রকাশ করার জন্য আমি দেশবন্ধুকে অনুরোধ করিলাম। তিনি সানন্দে আমার প্রস্তাব সমর্থন করিয়া সকলের সঙ্গে আলোচনা আরম্ভ করিলেন। মওলানা আকরাম খাঁ সাহেবকে দেশবন্ধু জিজ্ঞাসা করিলেন—খাঁ সাহেব আপনার দৈনিক পত্রিকা 'সেবক' বন্ধ করিয়া দিলেন কেন? চৌধুরী সাহেব বলিতেছেন (আমাকে দেখাইয়া) —আমাদের দলের প্রচারের জন্য একখানা দৈনিকপত্র প্রকাশ করা দরকার। আমিও উহা একান্ত প্রয়োজন বোধ করিতেছি। আনন্দবাজার, অমৃতবাজার প্রভৃতি পত্রিকাগুলি অনবরত আমাদের বিরুদ্ধে লিখিতেছে। উহার জবাব দেওয়ার জন্য আমাদের নিজস্ব পত্রিকা চাই। দেশবন্ধু বলিলেন—আপনি 'সেবক' আবার প্রকাশ করুন। খাঁ সাহেব উত্তরে বলিলেন—"অনেক টাকা লোকসান দিয়া উহা বন্ধ করিয়া দিতে বাধ্য হইয়াছি। আপাতত ছয় হাজার টাকা হইলে উহা পুনঃপ্রকাশ করিতে পারি।" দেশবন্ধু চিন্তিত হইয়া বলিলেন—এখন এত টাকা কোথায় পাই! তখন বিগ ফাইভকে ডাকা হইল। তাঁহারা হইতেছেন শ্রীরামপুরের রাজা কিশোরীলাল গোস্বামীর পুত্র ব্যারিস্টার তুলসীচরণ গোস্বামী, প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী নির্মলচন্দ্র চন্দ, স্বনামখ্যাত নলিনীরঞ্জন সরকার, শরৎচন্দ্র বসু ও ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়। Big five ইঁহাদিগকে বলা হইত। ইঁহাদের সঙ্গে নাড়াজোলের রাজা (মেদিনীপুর) নরেন্দ্র-লাল খাঁ-ও আসিলেন। সকলে মিলিয়া স্থির করিলেন একখানা ইংরেজী ও একখানা বাংলা কাগজ প্রকাশ করা হইবে। তখনই পঞ্চাশ হাজার টাকা মূলধন করিয়া 'ফরওয়ার্ড লিমিটেড কোম্পানী' গঠন করার ব্যবস্থা হইল।

অল্পদিন মধ্যেই স্বরাজ্য দলের মুখপত্র ইংরেজী দৈনিক 'ফরওয়ার্ড' ও বাংলায় দৈনিক 'বাংলার কথা' প্রকাশিত হইল। প্রসিদ্ধ সাংবাদিক সত্যরঞ্জন বক্সী ও সুভাষচন্দ্র বসু যথাক্রমে উহার সম্পাদক হইলেন। শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী তখন প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ছিলেন। তাঁহার ইংরেজী দৈনিক 'সার্ভেন্ট পত্রিকা' "নো-চেঞ্জার" দলের প্রধান মুখপত্র হইল। উভয় দল পরস্পরের প্রতি প্রচুর কর্দম নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

কয়েক দিন পরের কথা—'ফরওয়ার্ড' অফিসে আমরা বসিয়া আছি হঠাৎ দেশবন্ধু আসিয়া আমাদিগকে বলিলেন—তোমরা তো অনেকেই আছ দেখিতেছি। কিছু অর্থপ্রাপ্তির সুযোগ আসিয়াছে, কিন্তু আমি তো ব্যারিস্টারি ছাড়িয়া দিয়াছি। ডুমরাওঁনের মহারাজার মামলা যাহা পাঁচ লাখ টাকায় কন্ট্রাক্ট লইয়াছিলাম উহাও তলপ করিয়াছি। এরূপ অবস্থায় এই অর্থ গ্রহণ করা উচিত হইবে কিনা চিন্তা করিতেছি। বিষয়টা হইতেছে ভারত সরকার একটা আইনঘটিত মতামত জানিতে চাহেন। নিউ দিল্লীর নির্মাণকারী কন্ট্রাক্টরগণ ভারত সরকারের কয়েক লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করিয়াছে বলিয়াই তাঁহাদের বিশ্বাস হইয়াছে। সরকার উহাদের বিরুদ্ধে মামলা করিতে ইচ্ছুক। উক্ত মামলা চলিবে কিনা কাগজপত্র দেখিয়া তাহা বলিয়া দিতে হইবে। আমি ত্রিশ হাজার টাকা ফি দাবী করিয়াছি। সরকার পক্ষ রাজী, আগামীকল্য তাহারা আসিবে। তখন আমি কি বলিব? তোমরা কি বল?

আমরা সমস্বরে চিৎকার করিয়া বলিলাম—নিশ্চয় ঐ টাকা লইতে হইবে। দলের প্রোপাগাণ্ডার জন্য বহু অর্থের প্রয়োজন। সুতরাং টাকা আমাদের চাই। আপনি কোর্টে হাজির হইয়া ব্যারিস্টারি করিতেছেন না, খালি কতগুলি কাগজপত্র দেখিয়া মতামত প্রকাশ করিতে আপনাকে যথেষ্ট পরিশ্রম করিতে হইবে না। পারিশ্রমিক হিসাবে এই অর্থ গ্রহণ করা কখনও অন্যায় নহে।

যথা সময় সরকার পক্ষ ত্রিশ হাজার টাকার একতাড়া নোট ও বহু কাগজপত্র দেশবন্ধুকে দিয়া যান। কাগজপত্রগুলি দেখিয়া মামলা চলিবে না বলিয়া দেশবন্ধু মত প্রকাশ করায় সরকার ঐ মামলা আর করেন নাই।

(১৭)

নো-চেঞ্জার ও প্রো-চেঞ্জার দলের প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে ভারতের আকাশ-বাতাস বিষাক্ত হইয়া উঠিয়াছে। বাংলার খ্যাতনামা কর্মীদের মধ্যে শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী,

ডা: প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, হরদয়াল নাগ, প্রফেসর জিতেন্দ্রলাল ব্যানার্জি প্রভৃতি এবং মুসলমান কর্মীদের মধ্যে মওলানা আবদুল্লাহিল বাকী, মৌলবী আশরাফউদ্দীন চৌধুরী, মৌলবী আহমদ আলী প্রমুখ অনেকেই স্বরাজ্য দলের বিরুদ্ধে ছিলেন। সারা দেশে দলাদলি চলিতেছিল। এই সময় মওলানা আবুল কালাম আজাদ দীর্ঘ কারাদণ্ড ভোগ করিয়া রাঁচী জেল হইতে মুক্ত হইলেন। কংগ্রেসের মধ্যে দলাদলি ও মতবিরোধ লক্ষ্য করিয়া তিনি অত্যন্ত মর্মাহত হইয়া পড়িলেন। মহাত্মা গান্ধী, মওলানা মহম্মদ আলী প্রমুখ বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ তখন অনেকেই কারাগারে আবদ্ধ থাকায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অন্যান্য মেম্বরগণের সহিত পরামর্শ করিয়া এই গৃহবিবাদ নিষ্পত্তির জন্য তিনি অগ্রসর হইলেন। অবিলম্বে ওয়াকিং কমিটির মিটিং আহ্বান করা হইল। স্থির হইল জাতীয় মহাসমিতির বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইবে।

তদনুযায়ী ১৯২৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে দিল্লীতে স্পেশাল কংগ্রেসের বৈঠক আহ্বান করা হইল। মওলানা আবুল কালাম আজাদ উহার সভাপতি মনোনীত হইলেন। বিভিন্ন প্রদেশের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ ভোট দিয়া এই আত্মকলহের অবসান করিবেন। দেশবন্ধু বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। অধিকাংশ প্রতিনিধি যদি স্বরাজ্য দলের সমর্থক না হন তবে তাঁহার পরাজয় অনিবার্য। সারা ভারত-ব্যাপী ইলেকশন প্রোপাগাণ্ডা আরম্ভ হইল। বাংলায় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি পণ্ডিত শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী ও ডা: প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ সম্পাদক উভয়েই 'নো-চেঞ্জার' দলভুক্ত। কিন্তু মেম্বরগণের মধ্যে স্বরাজ্য দলের সংখ্যাধিক্য ছিল। প্রাদেশিক কংগ্রেসের কর্তৃত্ব স্বরাজ্য দলের হাতে না থাকিলে দলের মতাবলম্বী ডেলিগেট নির্বাচন কঠিন হইবে ভাবিয়া আমরা সভাপতি ও সম্পাদকের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবের নোটিশ দিলাম। কিন্তু তাঁহারা গড়িমসি করিয়া মিটিং ডাকিলেন না। আমরা তখন কমিটির নিয়ম অনুযায়ী অধিকাংশ মেম্বরের সম্মতিতে রিকুইজিশন মিটিং ডাকিলাম। ১৯২৩ সালের ১২ই আগস্ট বহুবাজার ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন হলে এই মিটিং ডাকা হইল। আমাদের মিটিংয়ের নোটিস দেখিয়া অগত্যা প্রফুল্ল বাবু ঐ দিন বেলা ২টার সময় উক্ত স্থানেই মিটিং ডাকিলেন। মওলানা আকরাম খাঁ সাহেবকে আমরা সভাপতি করিব স্থির করিলাম। কথা হইল নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই মিটিং হলটি দখল করিয়া বসিতে হইবে। তাহাই হইল, বেলা ১টার মধ্যেই আমাদের দলের মেম্বরগণ সভাগৃহটি অধিকার করিয়া বসিলেন। কিন্তু সভাপতি

মওলানা সাহেবের দেখা নাই। আমরা উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলাম। একটি ট্যাক্সি লইয়া আমি সুভাষ বাবু ও কিরণশঙ্কর রায় মোহাম্মদী আফিসে গিয়া মওলানা সাহেবকে পাকড়াও করিয়া আনিলাম। ইতিপূর্বে সুভাষবাবু ও কিরণবাবু শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী মহাশয়ের বাড়ীতে গিয়া তাঁহাকে এই গণ্ডগোলের সভায় উপস্থিত না হওয়ার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। শ্যাম বাবু তাহাতে সম্মত হইয়াছিলেন। কার্য-পদ্ধতি লইয়া তাঁহার মতবিরোধ থাকিলেও এই প্রবীণ জননায়ককে আমরা শ্রদ্ধা করিতাম। তাঁহার ন্যায় আদর্শবাদী নিষ্ঠাবান ত্যাগী পুরুষ খুব কম দেখা যাইত।

মওলানা আকরাম খাঁ সাহেবকে সভাপতি করিয়া আমরা সভার কার্য আরম্ভ করিয়া দিয়াছি। অপর পক্ষ হলের এক পার্শ্বে স্থান করিয়া সভাপতির প্রতীক্ষা করিতেছে। কিন্তু শ্যাম বাবু উপস্থিত না হওয়ায় তাঁহারা অতিমাত্র ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। অবশেষে হরদয়াল নাগ ও প্রফুল্ল বাবু ট্যাক্সি লইয়া গিয়া তাঁহাকে লইয়া আসিলেন।

হরদয়াল বাবু চাঁদপুরের প্রবীণ জননায়ক ও ত্যাগী কর্মী ছিলেন। 'গ্র্যাণ্ড ওল্ডম্যান' বলিয়া কংগ্রেস মহলে তাঁহার খ্যাতি ছিল। মুসলমানদের মধ্যে মওলানা মনিরুজ্জমান ইস্লামাবাদী, কবি ইস্মাইল হোসেন সিরাজী, কবি কাজী নজরুল ইস্লাম, মোঃ সামসুউদ্দীন আহমদ, সৈয়দ জালালউদ্দীন হাসেমী, সৈয়দ মজিদ বক্শ, প্রমুখ অনেকে উপস্থিত ছিলেন। গোলমালের আশঙ্কায় ঢাকার শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও কুমিল্লার বসন্তকুমার মজুমদার মহাশয়কে সভাপতি সাহেবের দুই পার্শ্বে বসান হইয়াছিল। এই দুই ভদ্রলোকের স্বভাব কিছু উগ্র বলিয়া আমাদিগকে সতর্ক থাকিতে হইত। বসন্ত বাবুর সহধর্মিণী আমাদের শ্রদ্ধেয়া বৌদিদি হেমপ্রভা মজুমদারকে তাঁহার পতিদেবতাকে সামলানোর জন্য তাঁহার পার্শ্বে স্থান দেওয়া হইয়াছিল। প্রফেসার হেমন্তকুমার সরকার, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (আলীপুর বোমার মামলার আসামী ও 'নির্বাসিতের আত্মকথা'র লেখক), আমি ও সিরাজী সাহেব সভাপতিকে বেষ্টন করিয়া বসিয়াছিলাম। হেমন্ত বাবু প্রফেসর মানুষ, তাঁহার বয়সের হিসাবে বেমানান হইলেও একখণ্ড বেত্র-দণ্ড সর্বদা তাঁহার হাতে থাকিত। আমারও ঐ অভ্যাস বহু দিনের। যষ্টি ব্যতীত চলিতাম না। আমরা দুই জন লাঠিওয়ালা পাশাপাশি বসিয়াছিলাম। বিপক্ষ দল শ্যাম বাবুকে সভাপতি করিয়া সভা আরম্ভ করিয়া দিলেন। আমরা সভাপতি ও সম্পাদকের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব পাস করিয়া লইয়া মওলানা আকরম খাঁ সাহেবকে সভাপতি ও ভূপতি মজুমদারকে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক

নিযুক্ত করিয়া দিল্লীর স্পেশাল কংগ্রেসের ডেলিগেট নির্বাচন শেষ করিলাম। ইতি-মধ্যেই উভয় দলের মধ্যে কথা কাটাকাটি চলিতেছিল। আনন্দবাজার পত্রিকার মাখন সেন চিৎকার করিয়া আমাদিগকে গালাগালি দিতে থাকায় হেমন্ত বাবু লাঠি উঠাইয়া তাঁহাকে নিরস্ত হইতে বলিতেছিলেন। এইবার মাখন সেন, 'হেমন্ত সরকার আমাদিগকে লাঠি দেখাইতেছে' বলিয়া দলের লোককে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। উভয় পক্ষে তুমুল গণ্ডগোল আরম্ভ হইল। এমন সময় বিপক্ষ দল হইতে একটা চেয়ার আমাদের দিকে নিক্ষিপ্ত হইল। আমাদের পক্ষ হইতেও প্রতিক্রিয়া চলিল। মারামারির অন্য উপকরণ না থাকায় চেয়ার ছোড়াছুড়ি চলিতে লাগিল। চেয়ারগুলি হাতে হাতে ধরিয়া লওয়ায় কেহ আহত হইল না বটে, কিন্তু অহিংসা-মন্ত্রের সাধকদের এই কাণ্ডকারখানায় আমরা হতভম্ব হইয়া গেলাম। সভাপতি সাহেব পার্শ্বে উপবিষ্ট শ্রীশ বাবু ও বসন্ত বাবুর হাত ধরিয়া তাঁহাদিগকে টানিয়া নিরস্ত করার চেষ্টা করিতেছেন। বউদিদি তাঁহার পতিদেবতাকে সামলাইতে গিয়া হিমসিম খাইতেছেন। তাঁহার ললাটের সিন্দুরবিন্দু স্থানচ্যুত হইয়া মুখমণ্ডলে এক নূতন সৌন্দর্যের সৃষ্টি করিয়াছে। দেশবন্ধু দাশের স্ত্রী বাসন্তী দেবী ভগিনী উর্মিলাকে লইয়া আসিয়া সভার অভাবনীয় দৃশ্যে আহত হৃদয়ে ফিরিয়া চলিয়া গিয়াছেন। বন্ধু জালালউদ্দীন হাসেমী, কবি সিরাজী ও মওলানা ইস্‌লামাবাদী সাহেব এক নিরাপদ স্থানে দাঁড়াইয়া উৎকণ্ঠার সহিত এই দৃশ্য অবলোকন করিতেছিলেন।

মৌলবী আহম্মদ আলী (নবযুগ সম্পাদক) একটি চেয়ারে দাঁড়াইয়া হাত নাড়িয়া দাঁত মুখ ভেংচাইয়া আমাদের প্রতি অজস্র গালি বর্ষণ করিতে লাগিলেন। সভায় বহু মহিলা উপস্থিত ছিলেন। অহিংসমন্ত্রের সাধকদের হিংস্র মূর্তি দেখিয়া প্রবীণ কংগ্রেস নেত্রী শ্রদ্ধেয়া মোহিনী দেবী অশ্রুসজল নেত্রে করজোড়ে সকলকে নিরস্ত হওয়ার জন্য কাতরকণ্ঠে অনুরোধ জানাইতে লাগিলেন। সমবেত মা-বোনদের সম্ভ্রমরক্ষার কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন। তাঁহার অনুরোধে সভা শান্ত হইল। আমরা সাবেক প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি বাতিল ও নবগঠিত কমিটি বৈধ বলিয়া ঘোষণা করিলাম এবং আগামী স্পেশাল কংগ্রেসের জন্য ডেলিগেট নির্বাচন করিয়া লইলাম। তাঁহারাও তাঁহাদের দলের লোক লইয়া ডেলিগেট নির্বাচন করিয়া লইলেন। এই হট্টগোলের মধ্যে কতকগুলি চেয়ার টেবিল যেমন ভাঙ্গিয়া ছিল, তেমনই প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিও দ্বিধা বিভক্ত হইয়া গেল। এইরূপ যুক্তপ্রদেশ ও পাঞ্জাবের কংগ্রেস কমিটিও দ্বিধাবিভক্ত হইয়াছিল।

(১৮)

দিল্লী স্পেশাল কংগ্রেস

সুভাষ বাবুর টেলিগ্রাম পাইয়া, আমরা দিল্লীর পথে কলিকাতা রওনা হইলাম। হিলি হইতে আমি, আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মোসলেমউদ্দীন চৌধুরী, আত্মীয় আব্দুল লতিফ চৌধুরী, কফিলউদ্দীন মিয়া, বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ও বসন্তকুমার দাস ডেলিগেট নির্বাচিত হইয়াছিলাম। প্রতাপ বাবু আমাদের বিরোধী দলে ছিলেন। কলিকাতায় পৌঁছিয়া ঐ দিনই আমাদের দলের প্রায় তিন শত ডেলিগেট তুফান মেলে দিল্লী রওনা হইলাম। দেশবন্ধু দাশ, সুভাষ বাবু ও অন্যান্য নেতাগণ আমাদের সহযাত্রী হইলেন। অপর পক্ষের শ্যাম বাবু ও প্রফুল্ল বাবুর নেতৃত্বে তাঁহাদের দলের ডেলিগেটগণও একই ট্রেনে দিল্লী চলিলেন। দিল্লী পৌঁছিলে একদল স্বেচ্ছাসেবক শোভাযাত্রা করিয়া আমাদিগকে কলেজ হোস্টেলে লইয়া গেলেন, তথায় আমাদের থাকিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। আমরা কয়েকজন মুসলমান ডেলিগেট সুভাষ বাবু ও প্রসিদ্ধ সংগীতসাধক দিলীপকুমার রায় (ডি. এল. রায়ের পুত্র) একই রুমে স্থান পাইলাম। একদিনের জন্য কংগ্রেসের স্পেশাল অধিবেশন বলিয়া ডেলিগেটগণের অবস্থানের কোন স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করা হয় নাই। ধর্মশালা, বোর্ডিং ইত্যাদি স্থানে রাখা হইয়াছিল। বিভিন্ন প্রদেশের ডেলিগেটগণের নিকট সন্ধান লইয়া জানা গেল মাদ্রাজ, বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশ কয়েকটি স্থান হইতে আমাদের দলের লোক কম আসিয়াছেন, কিন্তু বাংলা, বিহার, যুক্তপ্রদেশ, সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু প্রভৃতি স্থান হইতে আগত অধিক সংখ্যক ডেলিগেটই আমাদের সমর্থক ছিলেন। অন্যান্য প্রদেশের গোলমাল আপোষে মিটিয়া গিয়াছিল কিন্তু বাংলাকে লইয়া গোল বাঁধিল। দুই দলের নির্বাচিত ডেলিগেটগণ দিল্লী গিয়াছেন, কোন্ দল বৈধ, ইহার মীমাংসা না হইলে প্রকাশ্য অধিবেশন বসিতে পারিতেছে না। দিল্লী রেল স্টেশনের সন্নিকট 'কুইন্স গার্ডেন'-এ কংগ্রেসের বিরাট প্যাণ্ডেল নির্মিত হইয়াছে। ডেলিগেট নির্বাচনের বৈধতার দাবী উভয় পক্ষের। বিচারের ভার পড়িল পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের উপরে। পণ্ডিতজী গোঁড়া হিন্দু এবং নরমপন্থী হইলেও প্রভাবশালী নেতা ছিলেন। তিনি উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনিয়া, আমাদের নির্বাচনকেই বৈধ বলিয়া রায় দিলেন, অপর পক্ষের নির্বাচন বাতিল বলিয়া ঘোষণা করিলেন। বিপক্ষ দল ক্ষেপিয়া গেল। দিল্লী দুর্গের সম্মুখে এক বিরাট সাধারণ জনসভায় প্রফেসার জিতেন্দ্রলাল ব্যানার্জী অতি উত্তেজিত ভাষায় আমাদিগকে গালাগালি দিতে লাগিলেন। মালব্যজী পক্ষ-

পাতিত্ব করিয়াছেন বলিয়া কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির নিকট অভিযোগ উপস্থিত করা হইল। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি শেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য একটি ট্রাইবুনাল গঠন করিলেন। সদ্যকারামুক্ত মৌলানা মহম্মদ আলী, সরোজিনী নাইডু, পণ্ডিত মালব্যজীর সহিত যুক্ত বিচারক নির্বাচিত হইলেন। আবার বিচার চলিল। মৌলানা মহম্মদ আলীর ব্যক্তিত্ব, অসাধারণ ত্যাগ ও স্পষ্টবাদিতার জন্য সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিত। এই নূতন ব্যবস্থায় দেশবন্ধু অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন। তিনি আমাদের নিকট আসিয়া হতাশা প্রকাশ করায়, আমরা তাঁহাকে মৌলানা সাহেবের সহিত দেখা করিয়া, স্বরাজ্য পার্টির উদ্দেশ্য বুঝাইয়া বলিতে অনুরোধ করিলাম। দেশবন্ধু, পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু ও সুভাষ বাবুকে সঙ্গে লইয়া মৌলানা সাহেবের সাথে দেখা করিলেন। দেশবন্ধু ও মতিলালজী, ভারতের শ্রেষ্ঠ আইনজ্ঞদের অন্যতম। হাইকোর্টের নামজাদা বিচারকদের পক্ষেও তাঁহাদের যুক্তিজাল ছিন্ন করা সম্ভব ছিল না। মৌলানা সাহেবও পারিলেন না। তিন দিন ধরিয়া বিচার চলিল, অবশেষে আমরাই জয়লাভ করিলাম। এ কয়দিন কংগ্রেসের অধিবেশন বন্ধ ছিল। বিপক্ষ দলের বহুত্যাগী ও বিচক্ষণ নেতা দিল্লীতে উপস্থিত থাকিয়া সভায় যোগ দিতে পারিবেন না এ অবস্থা সকলকেই ব্যথিত করিয়া তুলিল। অবশেষে সভাপতি মৌলানা আজাদ বিপক্ষ দলের বিশিষ্ট নেতাগণকে সভায় যোগদানের অনুমতি দিলেন। কিন্তু তাঁহাদের ভোটের অধিকার থাকিল না। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন হাজেকুল মুলক হাকিম মহম্মদ আজমল খাঁ, ভারতের তদানীন্তন শ্রেষ্ঠ অস্ত্র-চিকিৎসক ডাক্তার আনসারী ছিলেন সম্পাদক। তিন দিন পরে স্পেশাল কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশন বসিল। বিরাট শোভাযাত্রা করিয়া সভাপতি আজাদ সাহেবকে সভাস্থলে আনয়ন করা হইল। উর্দু ভাষায় মুদ্রিত অভিভাষণ তিনি পাঠ করিলেন, উহার হিন্দি ও ইংরাজী কপি ডেলিগেটদের মধ্যে বিতরণ করা হইল। মৌলানা সাহেবের অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও সাহিত্যিক প্রতিভা সমগ্র মুসলিম জগতে সুবিদিত ছিল। তাঁর সুলিখিত ও তথ্যপূর্ণ অভিভাষণ পাঠ শেষ হইলে মুহুর্মুহু জয়ধ্বনিতে সভাস্থল প্রকম্পিত হইতে লাগিল। মহাত্মা গান্ধী তখন যারবেদা জেলে আবদ্ধ। তাঁর সুযোগ্য সহধর্মিণী কস্তুরীবাঈ গান্ধী ও সদ্যকারামুক্ত মৌলানা মহম্মদ আলীকে মাল্যভূষিত করিয়া সভাস্থলে অভিনন্দিত করা হইল। সভার কার্য আরম্ভ হইলে স্বয়ং মৌলানা মহম্মদ আলী কাউন্সিল প্রবেশের প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া উর্দু ভাষায় বক্তৃতা দিতেছিলেন। বাঙ্গালী ও মাদ্রাজী ডেলিগেটগণ উর্দু ভাষার সহিত সম্যক পরিচিত

না থাকায় বড় অসুবিধায় পড়িয়া গেলেন। লক্ষাধিক লোকের বসিবার উপযোগী বিরাট প্যাণ্ডেলে বিভিন্ন প্রদেশের ডেলিগেটদের আসন পৃথক পৃথক ভাবে চিহ্নিত করা ছিল। বাঙ্গালী ও মাদ্রাজী আমরা পাশাপাশি বসিয়া ছিলাম। মৌলানা সাহেবকে ইংরাজীতে বক্তৃতা করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া একটি শ্লিপ পাঠান হইল। শ্লিপটি আমি বক্তৃতামঞ্চে মৌলানা সাহেবকে দিয়া আসিলাম। তিনি শ্লিপটি এক নজরে দেখিয়া উর্দুতেই তাঁহার বক্তব্য বলিতে লাগিলেন। অতঃপর আমাদের দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন—Madras and Bengal delegates approached me to speak in English, but I requested them to learn Hindusthani. অনেকেই হাসিয়া উঠিলেন। এবার তিনি তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ অনর্গল ইংরাজী ভাষায় প্রস্তাবটির ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। মৌলানা সাহেবকে এই আমি প্রথম দেখিলাম, তাঁহার সম্পাদনায় কমরেড ও হামদর্দ নামক ইংরাজী ও উর্দু পত্রিকা দুইটি প্রথমে কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হইত। ইংরেজী সাহিত্যে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ও রচনা-কৌশল দেখিয়া বড় বড় ইংরেজ পণ্ডিতগণও স্তম্ভিত হইতেন। কমরেড ও হামদর্দের বাক্যবাণ সহ্য করিতে না পারিয়া সরকার কাগজ দুইখানা বন্ধ করিয়া দেন এবং মৌলানা সাহেবকে কারাগারে আবদ্ধ করেন। পরে কমরেড আবার দিল্লী হইতে প্রকাশিত হয়। আবার সরকার উহা বন্ধ করিয়া দেন। কাউন্সিল প্রবেশের প্রস্তাবটি সমর্থন করেন দেশবন্ধু দাশ ও পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু। বিরোধী দলের মাদ্রাজী জননায়ক রাজা গোপালআচারী ও আরও কয়েকজন প্রস্তাবের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করেন। ইতিমধ্যে জনাব মহম্মদ আলী জেল হইতে গান্ধীজীর এক বার্তা পান, তাহাতে তিনি সর্বপ্রযত্নে কংগ্রেসের ঐক্যরক্ষার কথা বলেন। অবশেষে জনাব আলীর প্রচেষ্টায় এক আপোষ প্রস্তাব গৃহীত হয়।

মুসলমান নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে ব্যারিস্টার সইফুদ্দীন কিচলু, ডাঃ মোহম্মদ আলম, মিঃ আসফ আলী, অরুণা আসফ আলী, তোসদ্দক আহম্মদ শিরোয়ানী, ডাঃ সৈয়দ মাহ্‌মুদ, সীমান্তের আবদুল গফুর খান, মৌলানা হোসেন আহ্‌ম্মদ মাদানী, মৌলানা আহম্মদ সৈইদ, মৌলানা আতাউল্লা সাহ্‌ বোখারী, মৌলানা হজরৎ মোহানী, প্রফেসার আবদুল বারী রফি আহ্‌মেদ কিদোয়াই প্রমুখ বিশিষ্ট জননায়কগণ মূল প্রস্তাব সমর্থন করেন। আপোষ ও প্রস্তাব পাস হইয়া যাওয়ায় কংগ্রেসীদের পক্ষে কাউন্সিল প্রবেশের আর কোন বাধা রহিল না। কংগ্রেসের অধিবেশন শেষ হইল। আমরা আরও কয়েকদিন থাকিয়া এই ঐতিহাসিক মহানগরীর দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখিয়া

যাইব মনস্থ করিলাম। অবশ্য ইতিপূর্বেও আমি একাধিকবার দিল্লী আসিয়াছিলাম। সওগাত পত্রিকার কয়েক সংখ্যায় আমার তৎকালীন ভ্রমণবৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়াছিল।

(১৯)

একি সেই দিল্লী, হায়
এই সে নগরী
যাহার সৌন্দর্যে মুগ্ধ
নিখিল ধরণী
ভূতলে দ্বিতীয় স্বর্গ
অমর বাঞ্ছিত
মুসলমান সম্রাটের
প্রিয় রাজধানী (কায়কোবাদ)

এক শুক্রবারে ঐতিহাসিক জামে মস্‌জিদে জুম্মার নামাজ আদায় করিলাম। প্রায় ৩০।৩২ হাজার লোক জমাতের সামিল হইয়াছিল। একত্রে ৬০ হাজার লোক এখানে নামাজ পড়িতে পারে। সম্রাট সাজাহান-নির্মিত এই বিশ্ববিখ্যাত মস্‌জিদের বিশালতা ইহাতেই অনুমান করা যাইতে পারে। মস্‌জিদটি ঈষৎ লাল বেলে প্রস্তরে নির্মিত। মিনার ও তিনটি বৃহৎ গম্বুজ সুন্দর কারুকার্যমণ্ডিত। মস্‌জিদের বিশাল চত্বরটির মধ্যস্থলে অজু করিবার জন্য প্রশস্ত হাউজ ও তিন দিকে তিনটি প্রবেশদ্বার। পূর্ব দিকের বিশাল দরজাটি অদ্ভুত কারুকার্যমণ্ডিত। জুম্মার দিন সম্রাট সপারিষদ এই দরজা দিয়াই মস্‌জিদে প্রবেশ করিতেন। এখন উহা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। উত্তর ও দক্ষিণ দিকের দরজা দিয়াই লোকজন যাতায়াত করে। জামে মস্‌জিদের পূর্ব দিকের যমুনার তীরে বিশাল দিল্লী দুর্গ অবস্থিত। লৌহনির্মিত সুদৃঢ় দুর্গদ্বার গোরা প্রহরীরা পাহারা দিতেন। আমরা গেট-পাস লইয়া দুর্গে প্রবেশ করিলাম। দেওয়ান-ই খাস, দেওয়ান-ই আম, রঙমহল, শীষমহল প্রভৃতি সুরম্য অট্টালিকাগুলির কারুকার্য ও নির্মাণকৌশল দেখিলে, মোগলদের স্থাপত্যশিল্প যে কত উন্নত ছিল তাহা উপলব্ধি করা যায়। একজন গাইড আমাদিগকে ঐতিহাসিক স্থানগুলির বিবরণ ছড়ার মত আবৃত্তি করিয়া শুনাইতেছিলেন, তাহাতে ইতিহাস যতটুকু ছিল, তাহার চাইতে গালগল্প ছিল অধিক। তুষারশুভ্র মর্মরমণ্ডিত মতি মস্‌জিদের দেওয়ালে

মর্মর প্রস্তরগুলির সংযোগস্থলে মূল্যবান প্রস্তরখণ্ড বসান ছিল। তীক্ষ্ণ অস্ত্রের সাহায্যে পাথর কাটিয়া সেগুলি অপহৃত হইয়াছে। উহার চিহ্ন স্পষ্ট বিদ্যমান। গাইড স্থানগুলি দেখাইয়া বলিতে লাগিলেন :

"ইয়ে যো দেখ্‌তে হ্যায়, এঁহা যো জওহেরাত্‌ থা
ও ভরতপুরকা রাজা সুরজমল জাঠনে লে গয়া।"

কথা-কয়েকটি উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া এদিক ওদিক তাকাইয়া ভয়চকিত অনুচ্চস্বরে আবার তিনি বলিলেন :

"বাকী যো কুছ্‌ রাহা ওহ্‌ আংরেজ গভর্ণমেণ্ট।"

তাহার বলার ভঙ্গী দেখিয়া আমরা সমস্বরে হাসিয়া উঠিলাম। এই মস্‌জিদটি আকারে ছোট, ইহা বাদশাহ্‌ বেগমদের নামাজের জন্য নির্মিত হইয়াছিল। দেওয়ান-ই আম ও দেওয়ান-ই খাস সামিয়ানার আকারে নির্মিত দুইটি দরবারগৃহ। দেওয়ান-ই খাস মর্মরমণ্ডিত ও সুন্দর কারুকার্যখচিত। এইখানে একটি অনুচ্চ মর্মরবেদীর উপরে রক্ষিত ময়ুর সিংহাসনে সম্রাট উপবেশন করিতেন। এখন কেবল বেদীটিই রহিয়াছে। দিল্লী লুণ্ঠন করিয়া নাদির শাহ্‌ ময়ুর সিংহাসনটি পারস্যে লইয়া গিয়াছিলেন। দেওয়ালের কার্নিসে লতাপাতার ন্যায় শিল্পাক্ষরে খোদিত আছে—

"আগর ফিরদৌস বররুয়ে জমিনস্ত
হামে নস্ত হামে নস্ত হামে নস্ত।"

যদি দুনিয়ার কোথাও বেহেস্ত থাকে তবে তা এইখানে মনে হয়; তখন এ গর্বোক্তির সার্থকতা ছিল। পূর্বদিকে দুর্গের পাদদেশ ধৌত করিয়া যমুনা প্রবাহিতা ছিল, এখন অনেকখানি সরিয়া গিয়াছে। দক্ষিণ দিকে গভীর খাদ খনন করিয়া যমুনার সহিত যুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। খাল হইতে উত্তোলিত মাটি দ্বারা কৃত্রিম পাহাড় সৃষ্টি করিয়া লাল প্রস্তরের গাঁথুনির দ্বারা সুদৃঢ় করা হইয়াছে। দুর্গ প্রাকারের উপরে শত্রুর গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্য বুরুজ নির্মাণ করা হইয়াছে। এই ঐতিহাসিক ইমারতগুলি ব্যতীত আরও দ্বিতল অট্টালিকা রহিয়াছে।

সেগুলি সৈন্য ব্যারাক বলিয়া সাধারণের প্রবেশ নিষিদ্ধ। দুর্গের উত্তর-পূর্ব কোণে 'ভাদন' অবস্থিত। ইহা সুকৌশলে নির্মিত। যমুনার পানি ঝরণার আকারে প্রবেশ করিয়া শীষমহল ও রঙমহলের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইত। শীষমহল বাদশাহ্‌ ও বেগমদের স্নানাগার। দেওয়ালগুলি কাঁচের দ্বারা মণ্ডিত বলিয়া একজন লোক ইহার মধ্যে প্রবেশ করিলে চারিদিকের দেওয়ালে বহু ছবি প্রতিফলিত হয়। শুভ্র মর্মর-

নির্মিত জলাধারটির একদিক দিয়া নহরের পানি প্রবেশ করিয়া অপর দিক দিয়া বহিয়া যাইত। রঙমহল অতুলনীয় সৌন্দর্যমণ্ডিত গৃহ। বিদেশী পর্যটকগণ ইহার শিল্পসৌন্দর্য দেখিয়া বিস্ময়ে হতবাক হন। বাদশাহী কাণ্ড-কারখানা চক্ষে না দেখিলে লেখনীর দ্বারা বর্ণনা করা সম্ভবপর নহে।

পুরাতন দিল্লী

পুরাতন দিল্লী এখান হইতে এগার মাইল দূরে। ভারতের সর্বোচ্চ স্তম্ভ কুতুব-মিনার এইখানেই অবস্থিত। দিল্লী অতি পুরাতন শহর। মহাভারতীয় যুগের ইন্দ্রপ্রস্থ হস্তিনাপুর পাঠান-মোগলদের দিল্লী বহুদূরব্যাপী অতীতের ধ্বংসাবশেষ বুকে লইয়া বিদ্যমান আছে। সাহ্‌জাহানাবাদের দক্ষিণ পার্শ্বে পুরাতন ধ্বংসাবশেষের উপরে ইংরাজের 'নিউ দিল্লী' নির্মিত হইয়াছে।

কুতুবমিনারের পথে সম্রাট হুমায়ুনের সমাধি দেখিলাম। লাল পাথরের নির্মিত সমাধিসৌধটির শিল্পনৈপুণ্য দেখিয়া মনে হয় তাজমহলের পরিকল্পনা এই সৌধ দেখিয়াই করা হইয়াছিল। সম্রাট হুমায়ুন মস্‌জিদের আজান শুনিয়া তাড়াতাড়ি প্রাসাদ হইতে অবতরণকালে পদস্খলিত হইয়া নিম্নে পতিত হন। তাহাতেই তাঁহার মৃত্যু হয়। ইহার সন্নিকটেই তোগলকাবাদের ধ্বংসস্তূপ বিরাজমান। অনতিদূরে হজরৎ খাজা নিজামউদ্দীন আউলিয়ার মাজার। মর্মরমণ্ডিত সুন্দর সমাধিসৌধটি দিবারাত্র জনসমাগমে সরগরম। জিয়ারতের জন্য বহুদূর হইতে লোক আসিয়া থাকেন। খাজা সাহেবের মাজারের পার্শ্বে সম্রাট সাজাহানের প্রিয়তমা কন্যা জাহানারার সমাধি। উন্মুক্ত আকাশতলে অনুচ্চ প্রস্তরবেষ্টিত সমাধিটির উপরে অন্য কোন আচ্ছাদন নাই। কবরের শীর্ষদেশে নিম্নলিখিত স্বরচিত কবিতাটি মর্মরফলকে খোদিত আছে—

"বগৈর সব্‌জ পোশদ কসে মাজারে মোরা
কে কবর পোশ গরীবাঁ হাসে গিয়াহে বশস্ত।"

মূল্যবান আস্তরণে আমার কবরকে কেহ আবৃত করিও না। দীন আত্মা সম্রাট-তনয়া জাহানারার পক্ষে তৃণশয্যাই উত্তম। অনুচ্চ প্রস্তরবেষ্টিত কবরের উপরে দূর্বা ঘাস লাগাইয়া সুখৈশ্বর্যে লালিতা-পালিতা বিদুষী জাহানারার অন্তিম বাসনা পূর্ণ করা হইয়াছে।

অনতিদূরে কবি আমির খসরু অনন্তনিদ্রায় শায়িত। ইনি হজরত নিজাম-উদ্দীন আউলিয়ার পরমভক্ত ছিলেন। সম্রাট পরিবারের গোরস্থান 'চৌষট্‌ খাম্বা'

চন্দ্রাতপের আকারে চৌষট্টিটি মর্মর থাম্বার উপরে নির্মিত। নিকটেই কুতুবমিনার। অতীত মুসলমান গৌরবের মূক সাক্ষিরূপে দণ্ডায়মান। মোগল আমলের পূর্বে সম্রাট আলতামাসের সময়ে আজ হইতে প্রায় সাত শত বৎসর পূর্বে ইহার নির্মাণকার্য সমাধা হয়। কলিকাতার 'অক্টারলোনী' মনুমেণ্ট হইতে ইহা অনেক উচ্চ। মিনার অভ্যন্তরস্থ ঘূর্ণায়মান সিঁড়ি দিয়া ৩৭৯টি ধাপ অতিক্রম করিয়া আমরা মিনার শীর্ষে আরোহণ করিলাম। প্রথম স্তর অতিক্রম করিতেই আমরা প্রায় ক্লান্ত হইয়া পড়িলাম। কিছু বিশ্রাম লইয়া আরও ৪টি স্তর অতিক্রম করিয়া শীর্ষদেশে পৌঁছিতে হইল। কুতুবমিনারের উপরে আরও দুইটি স্তর ছিল। ১৩০৪ সালের ভূমিকম্পে ঐ স্তর দুইটি ভাঙ্গিয়া পড়ে। বন্ধু জালালউদ্দীন হাসেমী তাঁহার এক পা লইয়া ক্রাচের সাহায্যে আমাদের সঙ্গে কুতুব শীর্ষে আরোহণ করিয়া সকলকে অবাক করিয়া দিলেন। এক পা দিয়া তাঁহার সাইকেল চালনা আমরা দেখিয়াছি, কিন্তু কুতুব শীর্ষে আরোহণ সহজ কথা নহে। পাশেই কুতুব-উল-ইস্‌লাম মস্‌জিদের ধ্বংশাবশেষ ও পৃথ্বীরাজের লৌহ মিনার অবস্থিত।

পশ্চিম দিকে অনতিদূরে হজরত খাজা কুতুবউদ্দীন বক্তিয়ার কাকির মাজার। ইনি ছিলেন হিন্দল ওলি হজরত খাজা মঈনউদ্দীন চিশতী (রহঃ) প্রধান খলিফা ও খাজা নিজামউদ্দীন আউলিয়ার পীর। কুতুব সাহেব সম্রাট আলতামাসেরও পীর ছিলেন। বিশ্ববিখ্যাত কুতুবমিনারের নির্মাণকার্য সম্রাট কুতুবউদ্দীন আরম্ভ করিয়াছিলেন, সম্রাট আলতামাস উহা শেষ করেন। অনেকে বলেন পীর কুতুব-উদ্দীনের নামানুসারে কুতুবমিনারের নামকরণ করা হয়। দিল্লীতে আরও বহু ওলি আল্লার মাজার আছে। সবগুলি জিয়ারৎ করার সৌভাগ্য আমাদের হইয়া ওঠে নাই। সহযাত্রী বন্ধুরা অনেকেই কলিকাতায় ফিরিলেন। আমরা চার জন আজমীর-শরিফ পর্যন্ত যাইব বলিয়া দিল্লী ত্যাগ করিলাম।

(২০)

জয়পুর

আজমীরের পথে জয়পুর। রাজপুতানার অন্তর্গত আধুনিক একটি সুন্দর শহর। দিনাজপুর জেলার বেড়ামালিয়া এস্টেটের জমিদারগণ জয়পুরনিবাসী। তাঁহাদের সহিত আমাদের জমিজমার সম্পর্ক ছিল। আমরা জয়পুর নামিয়া জমিদার রাধেলাল পাঁড়ে মহাশয়ের আতিথ্য গ্রহণ করিলাম। ইঁহারা কয়েক ভ্রাতা অতি সমাদরে আমাদিগকে গ্রহণ করিলেন। সুবিখ্যাত রাজা মানসিংহ জয়পুরের অধিপতি ছিলেন।

তখন রাজধানী ছিল অম্বর। পরবর্তী কালে মহারাজা জয়সিংহ অম্বর পরিত্যাগ করিয়া জয়পুরে নূতন রাজধানী স্থাপন করেন। জয়পুর প্রাচীরবেষ্টিত শহর। রাস্তাগুলি প্রশস্ত, সরল ও পীচ ঢালা। দুই ধারের বাড়ীগুলি দ্বিতল অলিন্দশূন্য ও গোলাপী রঙে রঞ্জিত। রাস্তার চৌমাথায় ক্ষুদ্র একটি করিয়া পার্ক ও সাধারণের বিশ্রামস্থান। সুসজ্জিত বিপণিগুলি রাত্রে গ্যাস আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া জনসাধারণকে আকর্ষণ করে। পরদিন আমরা মহারাজার প্রাসাদ দেখিতে গেলাম। সেখানে খালি মাথায় অথবা ছাতা মাথায় দিয়া প্রবেশ নিষিদ্ধ। বাঙ্গালী আমরা মস্তক আবরণের সঙ্গে বিশেষ পরিচিত নহি। একখণ্ড বস্ত্র মাথায় জড়াইয়া পাগড়ী করিয়া লইলাম। বিশাল সিংহদ্বার অতিক্রম করিয়া ভিতরে প্রবেশ করা গেল। পার্শ্বে 'হাওয়া মহল' নয়তালা বিরাট অট্টালিকা মহারাজার সর্বোচ্চ বিচারালয়। রাজ কাছারিতে বিচারক হাকিমগণ গদীর উপরে তা'কয়া ঠেস দিয়া নবাবী কায়দায় বসিয়া আছেন। আলবোলার দীর্ঘ নল ধূম উদ্গীরণ করিতেছে। আসামী ফরিয়াদী উপস্থিত, উকিল মোক্তারগণ ধুতির উপরে চাপকান ঝুলাইয়া মাথায় মাড়োয়াড়ী ফ্যাটা বাঁধিয়া সওয়াল জবাব করিতেছেন। কাহারও পরণে যোধপুরী পায়জামাও রহিয়াছে। বিশাল রাজবাড়ী ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিলাম। শুনিলাম জয়পুর রাজবংশে কয়েক পুরুষ যাবৎ সন্তান হয় নাই। পোষ্য লইয়া চলিতেছে।

বর্তমান মহারাজা স্যার মাধো সিং বাহাদুর নিজে পোষ্যপুত্র। ইঁহার পিতাও পোষ্য ছিলেন। নবাব স্যার ফয়েজ আলী খান বাহাদুর তখন জয়পুরের প্রধানমন্ত্রী। দেওয়ান ছিলেন, বিখ্যাত প্রবাসী বাঙ্গালী সংসারচন্দ্র সেন। ইঁহাদের চেষ্টাতেই জয়পুর রাজ্যের প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। সংসারচন্দ্র সেনের পুত্র অবিনাশচন্দ্র সেন খ্যাতিমান পুরুষ। তাঁহারা এখন এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা। পরদিন সকালে জয়পুর রাজ্যের পুরাতন রাজধানী ইতিহাসপ্রসিদ্ধ অম্বর শহর দেখিতে রওনা হইলাম। রাধেলাল বাবুর সুন্দর ও দ্রুতগতিসম্পন্ন গো-শকটটি আমাদিগকে দিলেন। তখনকার দিনে শহরে ঘোড়ার গাড়ী ও মফঃস্বলে সেই সনাতন গো-শকট ব্যতীত অন্য কোন যানবাহনের বিশেষ প্রচলন ছিল না। মোটর গাড়ী খুব কমই দেখা যাইত। জয়পুর হইতে অম্বর প্রায় আট মাইল দূর। পূর্বে রাস্তা সুগম ছিল না। কুলদাকান্ত মুখার্জী নামক এক বাঙ্গালী ইঞ্জিনিয়ার পাহাড় কাটিয়া বর্তমান সুন্দর পিচঢালা রাস্তাটি নির্মাণ করিয়াছেন। অম্বর পাহাড় ও তদুপরি সুদৃঢ় প্রস্তর-প্রাচীরবেষ্টিত নগর। রাজপ্রাসাদ একটি অনুচ্চ

পাহাড়ের উপরে অবস্থিত। চারিদিকে গভীর পরিখাবেষ্টিত। রাজপ্রাসাদ দেখার জন্য জয়পুর হইতে সরকারী অনুমতি-পত্র আনিয়াছিলাম। থানাদারকে উহা দেখাইলে তিনি প্রবেশের অনুমতি দিলেন। আমরা বিশাল সিংহদ্বার অতিক্রম করিয়া ধাপে ধাপে সিঁড়ি অতিক্রম করিয়া কাছারি বাড়ীতে পৌঁছিলাম।

অম্বর অধিপতি মহারাজা মানসিংহ সম্রাট আকবরের আত্মীয় ও প্রধান সেনাপতি ছিলেন। তাঁহার দরবারগৃহ দিল্লীর 'দেওয়ান-ই খাস' ও 'দেওয়ান-ই আমের' অনুকরণে নির্মিত। আমরা আরও কতকগুলি সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া পর্বতচূড়ায় অন্দর-মহলে পৌঁছিলাম। এখানেও রঙমহল শীষমহল ইত্যাদি সুন্দর প্রাসাদ রহিয়াছে। শ্বেতমর্মর-নির্মিত অপূর্ব কারুকার্যমণ্ডিত জনশূন্য এই পরিত্যক্ত রাজপ্রাসাদটি অক্ষুণ্ণ অবস্থায় আছে। পুষ্পোদ্যান ও ফোয়ারাগুলি শুষ্ক ও শ্রীহীন। এত উপরে কি উপায়ে জল সরবরাহ করা হইত বুঝিলাম না। জনকয়েক প্রহরী ব্যতীত এখানে আর কেহই বাস করে না। এক কালের জনকোলাহল-মুখরিত অম্বর নগরী আজ হৃতসর্বস্ব। থানা, ডাকঘর ও সামান্য একটি বাজার ব্যতীত এখানে আর কিছুই নাই। থানাদার লোকটি বড়ই ভদ্র। আমাদিগকে চা নাস্তা করাইয়া বিদায় দিলেন। সন্ধ্যায় জয়পুরে ফিরিয়া আসিলাম। পরদিন এখানকার বিখ্যাত গোমুখী প্রস্রবণ দেখিতে রওনা হইলাম। পাহাড় দেখিয়া উহার দূরত্ব নির্ণয় করা বড় কঠিন। ১০ মাইল দূরের পাহাড় দেখিয়া মনে হয় উহা বুঝি এক মাইলের পথ। আমরাও এই বিভ্রমে পড়িয়াছিলাম। গোমুখী পাহাড়টি নিকটে মনে করিয়া পদব্রজে রওনা হইয়াছিলাম। মাইলখানেক পথ অতিক্রম করিয়া দেখি, পাহাড় পূর্বের ন্যায় দূরেই রহিয়াছে। জিজ্ঞাসায় জানিতে পারিলাম, আরও তিন মাইল অতিক্রম করিলে পাহাড় পাওয়া যাইবে। শুনিয়া হতাশ হইলাম। ভাদ্র মাসের খর রৌদ্রে শ্রান্ত ও ক্লান্ত অবস্থায় আর অগ্রসর হওয়া সম্ভবপর নহে মনে করিয়া ফিরিয়া আসিলাম। পরদিন আবার যাত্রা। এবার ঘোড়ার গাড়ী লইয়াছি। পাহাড়ের পাদদেশে উপস্থিত হইয়া গাড়ী বিদায় দিতে হইল। পদব্রজে পর্বতারোহণ করিতে হইবে। কবি বলিয়াছেন—

যে ক'রেছে কোন দিন গিরি আরোহণ
সে জানে ভূধর শোভা বিচিত্র কেমন।

কৌতুহলী মন লইয়া উঠিতে লাগিলাম। অনেকখানি চড়াই অতিক্রম করিয়া উত্‌রাই আরম্ভ হইল। ক্রমশঃ নীচে নামিতেছি। চারিদিকে পাহাড়। পাহাড়ের

পর পাহাড়। পাহাড়গুলি তরঙ্গায়িত হইয়া যেন অনন্তের সাথে মিশিয়া গিয়াছে। রাজপুতানার পাহাড়গুলি শুষ্ক ও বৃক্ষলতাশূন্য। প্রকৃতির শ্যামল শোভা এখানে নাই। রৌদ্রদগ্ধ উত্তপ্ত প্রস্তরখণ্ডগুলি পথিকের মনে বিভীষিকার সৃষ্টি করে। হঠাৎ একটি মনোরম উপত্যকায় উপস্থিত হইলাম। একটি পর্বতগাত্র হইতে গরুর মুখাকৃতি প্রস্তরখণ্ডের মধ্য দিয়া নির্মল জলধারা নির্গত হইয়া শুভ্র মর্মরনির্মিত একটি চৌবাচ্চায় পতিত হইতেছে। পরিপূর্ণ চৌবাচ্চাটি উপচাইয়া ঐ পানি নিম্নে আর-একটি জলাধারকে পূর্ণ করিয়া নিম্নাভিমুখে বহিয়া যাইতেছে। চৌবাচ্চাটির পার্শ্বেই শ্বেতমর্মর-নির্মিত একটি ক্ষুদ্র মন্দির আছে। চৌবাচ্চাটির পানি এত পরিষ্কার যে পানির ৫।৬ হাত নিচেও সমস্ত পরিষ্কার দেখা যাইতেছে।

আমরা পর্বতারোহণে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছিলাম। পরিষ্কার পানি দেখিয়া গোসল করার প্রবল ইচ্ছা হইল। গায়ের কাপড় খুলিয়া প্রস্তুত হইতেছি এমন সময় জনৈক ব্যক্তি আমাদিগকে বলিলেন—ইঁহা মৎ নাহাও সরকারকা মানা হায়। আমরা নিরাশ হইলাম। এমন সময় মন্দিরের পুরোহিত এক বর্ষীয়ান ভদ্রলোক আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন—বাবা, তোম লোগ কাঁহাসে তসরিফ লায়ে হো? বাংলা মুলুক সে দেখনেকো লিয়ে আয়ে হো? উত্তরে বলিলাম—'জী হাঁ'! নিষেধকারী লোকটি প্রশ্নকর্তাকে জিজ্ঞাসা করিল—বাংলা মুলুক কিধার হায় বাবা? পুরোহিত উত্তর দিলেন—কলকাত্তা জানতে হো?—হাঁ উঁহ তো বড়ই দূর হায়—তোম কেঁও ইন্‌লোগকো নাহানে মানা করতে হো? নাহানে দো। আমাদিগকে বলিলেন—নাহাও বাবা তোমলোক। আমরা মহানন্দে জামাকাপড় খুলিয়া পাহাড়ের গায়ে রাখিয়া নামিতে যাইতেছি, এমন সময় পুরোহিত একটি যষ্টি হস্তে হাঁ হাঁ করিয়া আমাদের দিকে দৌড়িয়া আসিতেছে দেখিলাম। আমরা তো অবাক; হুকুম দিয়া আবার লাঠি দেখান, এ কেমন কথা। কিন্তু তিনি আমাদের দিকে না আসিয়া আমাদের জামাকাপড়গুলি বাঁদরের হস্ত হইতে রক্ষা করার জন্য লাঠি লইয়া ছুটিয়াছেন। ভাগ্যে তিনি টের পাইয়াছিলেন। নতুবা বস্ত্রহরণের ফলে অর্ধ-দিগম্বর সাজিয়া আমাদিগকে শহরে ফিরিতে হইত।

হিম শীতল

স্বচ্ছ পানিতে গোসল করিয়া অত্যন্ত আরাম বোধ করিলাম। তরুগুল্মহীন মরুময় শুষ্ক পর্বত ভেদ করিয়া কে এই অমৃতনিস্যন্দিনী জলধারা আবহকাল যাবৎ

প্রবাহিত রাখিয়া স্থানটিকে মনোরম শ্যামল শোভায় পরিণত করিয়াছে! পাহাড়ের গা বাসকপাতার জঙ্গল ও নানা প্রকার লতাগুল্মে সমাচ্ছন্ন। দলে দলে ময়ূর ও হরিণ নির্ভয়ে বিচরণ করিতেছে। জনকয়েক সাধু সন্ন্যাসী ধূপধুনা জ্বালাইয়া নিমীলিত নেত্রে ধ্যানে বসিয়া আছেন। তপোবনের কথা শুনিয়াছি, এবার বুঝি তাহা স্বচক্ষে দর্শন করিলাম। মরুপ্রকৃতির অন্তরালে সবুজের সমারোহ সৃষ্টিকর্তার অপূর্ব সৃষ্টি-কৌশল। দলে দলে বানর পাহাড়ে বিচরণ করিতেছে। ইহারা কি খাইয়া জীবন ধারণ করে, খোদা জানেন। এ রাজ্যে প্রাণিহত্যা নিষিদ্ধ বলিয়া পশুপক্ষী ভয়শূন্য। ময়ূর, হরিণ ও বানরগুলি মানুষের হস্ত হইতে নির্ভয়ে খাদ্য গ্রহণ করিতেছে। আমরা সারাদিন তথায় অবস্থান করিয়া সন্ধ্যায় বাসায় ফিরিলাম। জয়পুরের অন্যতম দ্রষ্টব্য স্থান 'রামনিবাসবাগ'। মহারাজার বৃহৎ উদ্যান ও পশুশালায় অনেকগুলি জন্তু জানোয়ার রক্ষিত আছে। মিউজিয়াম গৃহটি বৃহৎ না হইলেও সংগ্রহ মন্দ নহে। মহারাজ জয়সিংহ এবং আরও কয়েক জন মহারাজার তৈলচিত্র এখানে সযত্নে রক্ষিত আছে। মিশর দেশ হইতে আনীত কলিকাতা যাদুঘরে রক্ষিত মমিটির অনুরূপ একটি মমিও এখানে রহিয়াছে।

শহরে কয়েকটি মসজিদও দেখিলাম। এক শুক্রবারে নিকটের একটি মসজিদে প্রায় পাঁচশত মুসল্লি সহ জুম্মার নামাজ আদায় করিলাম। মুসলমানেরাও টুপি ও মাথায় মাড়োয়ারী ফ্যাটা বাঁধিয়া থাকে। জয়পুরে মার্বেল পাথরের পাহাড় আছে। শ্বেত পাথরের গ্লাস, থালাবাটি ইত্যাদি গৃহসজ্জার সুন্দর সুন্দর বিবিধ উপকরণ এখানে পাওয়া যায়। এখানকার পুরাতন মানমন্দির, মহারাজা জয়সিংহের নির্মিত। স্থানীয় নাম 'খণ্ডর মণ্ডর'। মহারাজা ছিলেন জ্যোতির্বিদ পণ্ডিত। তিনি জয়পুর, দিল্লী, বেনারস, মথুরা ও উজ্জয়িনীতে পাঁচটি মানমন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন। এইটিই সর্ববৃহৎ। তখন সূর্যের ছায়া দ্বারা সময় নিরূপণ করা হইত। আশ্চর্যের কথা, আজও বর্তমান ঘড়ির সহিত ইহার হুবহু মিল আছে। সুপ্রসিদ্ধ সমরখন্দ শহরে এইরূপ একটি মানমন্দির রহিয়াছে। তৈমুরলঙ্গের পৌত্র উলুক বেগ পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইহা নির্মাণ করিয়াছিলেন। তিনিও একজন বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ ছিলেন। রাষ্ট্র-বিপ্লব ও কালের প্রভাবে ইহা চাপা পড়িয়া যায়। রাশিয়ার জার নিকোলাসের আমলে এক যুবক প্রত্নতাত্বিক মাটি খুঁড়িয়া ইহা আবিষ্কার করেন। জয়পুরের মানমন্দির অষ্টাদশ শতাব্দীতে নির্মিত। সুতরাং জয়পুরের মানমন্দির সমরখন্দের মানমন্দিরের প্রায় তিন বৎসর পরে নির্মিত হইয়াছে। এ প্রসঙ্গে প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক পরিব্রাজক

প্রবোধকুমার সান্যাল মহাশয় লিখিয়াছেন—'সমরখন্দের মানমন্দিরটির সঙ্গে জয়পুরের মানমন্দিরের সাদৃশ্য দেখে সত্যই বিস্ময় বোধ ক'রেছিলুম'। পঞ্চদশ শতাব্দীর উলুক বেগ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর জয়সিংহ এই দুই জনের সংযোগ কোথায় কিভাবে হইল, তাহা ঐতিহাসিকরা বলিবেন। মনে হয়, তিন শতাব্দী পূর্বে মুসলমানদের নির্মিত এই মানমন্দিরটি জয়সিংহের অজ্ঞাত ছিল না। আমরা আজমীর যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতেছি, হঠাৎ আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা অসুস্থ হইয়া পড়ায় তাহাকে রাধেলাল বাবুর তত্ত্বাবধানে রাখিয়া তিন জন আজমীর রওয়ানা হইলাম। কথা হইল, আজমীর হইতে ফিরিয়া একত্রে দেশে রওয়ানা হইব। আমরা প্রায় সপ্তাহ কাল জয়পুরে ছিলাম। জমিদার বাবুরা আমাদের যে আদর আপ্যায়ন করিয়াছেন, তাহা আজও স্মরণ আছে। আমাদের থাকিবার জন্য একটি দ্বিতল বাড়ী দিয়াছিলেন। একটি মুসলমান বাবুর্চি রাখিয়া রাজভোগের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাঁহার গাড়ীটি সর্বদা আমরা ব্যবহার করিতাম। ইঁহাদের আতিথেয়তায় জয়পুরের প্রবাস জীবন আমাদের আনন্দে কাটিয়াছিল। যোধপুর-বিকানীর রেলপথের সংযোগ-স্থলে ফুলেরা জংশন। শ্রীহীন আরাবল্লী পর্বতমালা ও বালুকাময় মরুভূমির মধ্য দিয়া ট্রেন চলিয়াছে। মধ্যাহ্নে ভীষণ গরম হয়। ২।১টি নিম গাছ ও বাবলা গাছ ব্যতীত আর কোন বৃক্ষাদি নাই। বিরল জনবসতি ও মরুময় প্রান্তর। স্থানে স্থানে ইঁদারা হইতে বলদ-গরুর সাহায্যে পানি তুলিয়া স্বল্প পরিমাণ জমিতে আবাদের ব্যবস্থা হইয়াছে। বেলা দ্বিপ্রহরের পূর্বেই আজমীর পৌঁছিলাম।

(২১)

আজমীর

ভারতে ইস্‌লাম ধর্মের অন্যতম প্রচারক হজরত খাজা মঈনউদ্দীন চিশতির (র হঃ) পবিত্র সমাধিস্থান বলিয়া আজমীর মুস্‌লিম তীর্থে পরিণত হইয়াছে। এই মহাপুরুষের রওজা জিয়ারত করার জন্য মুস্‌লিম জগতের বিভিন্ন স্থান হইতে অসংখ্য নরনারী আসিয়া থাকেন। রেল স্টেশনে অবতরণের সঙ্গে সঙ্গে একদল তীর্থের পাণ্ডা আমাদিগকে ঘিরিয়া ধরিলেন। আমরা দিনাজপুর জেলার অধিবাসী শুনিয়া সৈয়দ নেসার আহম্মদ নামক এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক, তাঁহার হেফাজতে আমাদিগকে লইলেন। শুনিলাম, দিনাজপুর জেলা তাঁহার ভাগেই পড়িয়াছে। মাজার শরিফের খাদেমগণ সংখ্যায় বহু। তাঁহারা নিজেদের মধ্যে বিভিন্ন দেশ ও জেলাগুলি ভাগ করিয়া লইয়া সমাগত তীর্থযাত্রীদের উপর পৌরহিত্যের দাবী

করেন। আমরা সৈয়দ সাহেবের আতিথ্য গ্রহণ করিলাম। স্নান আহারের পর বিশ্রাম লইয়া তিনি আমাদিগকে মাজার জিয়ারতের জন্য লইয়া গেলেন। আজমীর মরুভূমির বুকে পর্বতবেষ্টিত একটি সুন্দর শহর। তারাগড় পর্বতের সানুদেশে প্রাচীরবেষ্টিত ভূমিতে মাজার শরিফ অবস্থিত। প্রস্তরনির্মিত সুন্দর কারুকার্যখচিত প্রধান প্রবেশ-দ্বারটি সম্রাট আকবর চতুরগড় দুর্গ জয় করিয়া আনিয়া এই স্থানে স্থাপিত করেন।

সৈয়দ সাহেবের বাটীর নিকট খিড়কি দরজা দিয়া আমরা প্রবেশ করিলাম। বিস্তৃত কম্পাউণ্ডের মধ্যস্থলে রওজা গৃহটি কারুকার্যখচিত চতুষ্কোণ সবুজ রঙে রঞ্জিত। গম্বুজের চূড়াটি স্বর্ণমণ্ডিত। সূর্যকিরণে ঝলমল করিতেছে। আমরা ভিতরে প্রবেশ করিলাম। মাজারের চারিদিকে কারুকার্যখচিত চাঁদির রেলিং। উপরে চাঁদির চন্দ্রাতপ, বহু মূল্যবান বস্ত্রখণ্ড দ্বারা কবরটি আচ্ছাদিত। আমরা মাজার জিয়ারত করিলাম। হজরত খাজা সাহেবের পবিত্র চরিত্রমাধুর্য ও অলৌকিক ক্রিয়াকলাপের কথা স্মরণ করিয়া শ্রদ্ধায় মন ভরিয়া উঠিল। এখানে দিনরাত মহামেলা লাগিয়াই আছে। জাতিধর্মনির্বিশেষে স্ত্রী-পুরুষ সকলেই আসিতেছেন। ভিন্ন ধর্মাবলম্বিগণ কবরে সেজ্‌দা করিতেছে। বহু মুসলমানকেও সেজ্‌দা করিতে দেখিলাম। 'কবরে কেহ সেজ্‌দা করিও না' এই বিজ্ঞপ্তি থাকা সত্ত্বেও, অজ্ঞ জনসাধারণ নিরস্ত হইতেছে না। পর্বতনিঃসৃত একটি ঝর্ণা মাজার শরিফের অনতিদূরে মর্মরনির্মিত একটি জলাধারে সঞ্চিত হইতেছে। রওজার পশ্চিম দিকে সম্রাট আকবরের নির্মিত লাল পাথরের মস্‌জিদ। রওজা সংলগ্ন, উত্তর দিকের শ্বেতমর্মর-নির্মিত সুন্দর মস্‌জিদটি সম্রাট সাজাহান প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। দরিদ্র তীর্থযাত্রীদের অবস্থানের জন্য রক্তপ্রস্তর-নির্মিত কতকগুলি গৃহ আছে। লঙ্গরখানায় পোলাও পাকের জন্য ২টি বৃহৎ তামার ডেক্‌চি পাশাপাশি পাথরের চুল্লির উপরে স্থাপিত রহিয়াছে। বড়টি সম্রাট আকবরের দেওয়া। উহাতে এক বারে একশত মণ চাউল পাক হয়। দ্বিতীয়টি সম্রাট জাহাঙ্গীর দান করিয়াছেন। উহাতে ৮০ মণ চাউল পাক হইয়া থাকে। রজব মাসের প্রথম সপ্তাহে ওরস্ উপলক্ষে লক্ষ লক্ষ লোকের সমাগম হয়, তখন দিবারাত্রি চুল্লি-দুইটি জ্বলিতে থাকে। পোলাও পাক শেষ হইলে, খাদেমগণ উপস্থিত জিয়ারতকারীদের মধ্যে উহা বিতরণ করেন। বাজারেও ইহা বিক্রয় হয়। হিন্দু-মুসলমান সকলেই শ্রদ্ধার সহিত ইহা খাইয়া থাকেন। শহরের অনতিদূরে আনাসাগর পর্বতবেষ্টিত হ্রদ। হ্রদটির পূর্বদিকে খানিকটা সমতল ভূমির উপরে বাদশাহ্ সাজাহান কর্তৃক নির্মিত 'দৌলত বাগ' নামক সুন্দর

উদ্যানবাটিকা অবস্থিত। ঘাটের উপরে তাঁবুর আকারে নির্মিত মর্মরগৃহগুলি অপূর্ব কারুকার্যের নিদর্শন। এই কীর্তিমান সম্রাটের বহু কীর্তি ভারতের বহু স্থানে রহিয়াছে। মরুভূমির বুকে, মনোরম উদ্যানটি তাঁহার অতুলনীয় কীর্তি। অদূরে একটি টিলার উপরে আজমীর ও মাড়োয়ার প্রদেশের শাসনকর্তা চিফ্ কমিশনারের বাসভবন। চৌহান বংশের বিখ্যাত রাজা পৃথ্বীরাজের রাজত্বকালে, হজরত খাজা সাহেব আজমীরে শুভাগমন করেন। এই হিন্দু রাজার বুকে বসিয়া, ইস্‌লাম ধর্ম প্রচারের কাহিনী ইতিহাস পাঠকগণের অবিদিত নাই। এ দেশে তখন মুসলমান ছিল না বলিলেই হয়। এই মানবপ্রেমিক মহাপুরুষ মানুষের দুঃখদুর্দশার কথা শুনিয়া স্থির থাকিতে পারিতেন না। আর্তের সেবা, দরিদ্রের দুঃখমোচন তাঁহার প্রধান কার্য ছিল। দুরারোগ্য কঠিন রোগ তাঁহার অলৌকিক ক্ষমতাবলে নিরাময় হইত। তাঁহার চরিত্রমাধুর্যে আকৃষ্ট হইয়া দলে দলে লোক ইস্‌লাম ধর্ম গ্রহণ করিতে লাগিলেন। খাজা সাহেবের অলৌকিক কাহিনীর কথা শুনিয়া পৃথ্বীরাজ সর্বদা শঙ্কিত থাকিতেন। ইচ্ছাসত্ত্বেও তাঁহার প্রতি অসদাচরণ করার সাহস পৃথ্বীরাজের হয় নাই, কিন্তু এই অবাঞ্ছিত লোকটিকে বিতাড়িত করিতে তাঁহার চেষ্টার অন্ত ছিল না। অবশেষে অমাত্যবর্গের পরামর্শে তিনি তাঁহার গুরু অজয়পালকে হিমালয় প্রদেশের সাধনক্ষেত্র হইতে ডাকিয়া আনিলেন। কিন্তু আধ্যাত্মিক শক্তির পরীক্ষায় হারিয়া গিয়া রাজগুরু অজয়পাল ইস্‌লাম ধর্ম গ্রহণ করেন। চারিদিকে হৈ চৈ পড়িয়া যায়। রাজগুরু মুসলমান হইয়াছেন শুনিয়া দলে দলে হিন্দু মুসলমান হইতে লাগিলেন। পৃথ্বীরাজের জেদ আরও বাড়িয়া গেল। সংযুক্তাহরণ লইয়া কনৌজের রাজা জয়চাঁদের সহিত তাঁহার বিবাদ চলিতেছিল। খাজা সাহেব ইহা সম্যক অবগত ছিলেন। তিনি সুযোগ মনে করিয়া সাহাবুদ্দীন মুহম্মদ ঘোরীকে হিন্দুস্থান আক্রমণ করিতে আমন্ত্রণ জানাইলেন। সাহাবুদ্দীন ইতিপূর্বে পৃথ্বীরাজের সহিত কয়েক বার যুদ্ধ করিয়া পরাজয় বরণ করেন। খাজা সাহেবের আমন্ত্রণে তিনি চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। পৃথ্বীরাজের সহিত শক্তিপরীক্ষা করিতে গেলে প্রচুর অর্থ ও সৈন্যবল প্রয়োজন, কিন্তু তখন তিনি একপ্রকার নিঃস্ব। তফসির কবিরের গ্রন্থকার সুবিখ্যাত ইমাম ফখরউদ্দীন রাজী ছয় লক্ষ টাকা দিয়া তাঁহাকে সাহায্য করিলেন। তিনি বিপুল সৈন্যদল গঠন করিয়া তিরৌরির যুদ্ধে পৃথ্বীরাজকে পরাজিত ও নিহত করিয়া সিংহাসন অধিকার করেন।

ভারতে মুসলমান রাজত্বের পত্তন হইল। খাজা সাহেব দীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন। আজমীরকে কেন্দ্র করিয়াই তিনি ইস্‌লাম ধর্ম প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার পবিত্র দেহ বক্ষে ধারণ করিয়া আজমীর আজ পুণ্যতীর্থে পরিণত হইয়াছে। ১০ বৎসর পূর্বে যখন প্রথম জিয়ারতের উদ্দেশ্যে আজমীর গিয়াছিলাম তখন রওজা প্রাঙ্গণে রাত্রিকালে বহু মোমবাতি জ্বলিতে দেখিয়াছি, এবার দেখিলাম বিজলী বাতির ব্যবস্থা হইয়াছে। বোম্বাই-এর প্রসিদ্ধ বণিক ফজল ভাই ইব্রাহিম কয়েক সহস্র টাকা ব্যয় করিয়া ইহা করিয়া দিয়াছেন। সন্ধ্যাসমাগমে বিভিন্ন বর্ণের বিদ্যুতালোক উদ্ভাসিত মাজার প্রাঙ্গণ অপূর্ব শোভা ধারণ করে। মাজার-সংলগ্ন একটি কক্ষে হিন্দু, মুসলমান রাজা, নবাবদের প্রদত্ত কতকগুলি স্বর্ণ গোলক ও অন্যান্য বহু মূল্যবান উপঢৌকন সযত্নে রক্ষিত আছে। ওরসের সময় ব্যতীত এগুলি বাহির করা হয় না। দাতাদের মধ্যে জয়পুর, উদয়পুর, আলোয়ার, হায়দ্রাবাদ, টংক, রামপুর প্রভৃতির রাজন্যবর্গ রহিয়াছেন। মাজারের বহু ভূসম্পত্তি রহিয়াছে। পরিচালকবর্গের ত্রুটীতে উহার কতকগুলি হস্তান্তরিত হইয়া যায়। ভারত স্বাধীন হওয়ার পর পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু হৃত সম্পত্তিগুলি উদ্ধার করিয়া উহার সুপরিচালনার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। সংবাদপত্রে পাঠকগণ ইহা অবগত আছেন। তিন দিন আজমীরে অবস্থানের পর আমাদের আশ্রয়দাতা সৈয়দ সাহেবকে কিছু দক্ষিণা দিয়া বিদায় গ্রহণ করিলাম।

সৈয়দ সাহেবের আতিথ্যের কথা আজও আমাদের স্মরণ আছে। চতুর্থ দিনে আমরা জয়পুরে ফিরিয়া আসিলাম। আগ্রার বিশ্ববিখ্যাত তাজমহল দেখিয়া যাইব বলিয়া আমাদের পূর্ব সঙ্কল্প ছিল। বাবুজীদের নিকট বিদায় লইয়া আমরা আগ্রা যাত্রা করিলাম।

(২২)

আগ্রা ঃ তাজমহল

যথা সময়ে আগ্রা পৌঁছিয়া স্টেশনের নিকটে একটি হোটেলে আশ্রয় লইলাম। ফোর্ট স্টেশন হইতে তাজমহলের দূরত্ব প্রায় দুই মাইল। তখন রিক্সার প্রচলন হয় নাই। আমরা জনপ্রতি দুই আনা ভাড়া স্থির করিয়া একা গাড়ীতে রওনা হইলাম। কুইন্‌স্ গার্ডেনের মধ্যে দিয়া সুন্দর পীচঢালা রাস্তা হইলেও, এক্কা গাড়ীর ঝাঁকুনি আমাদের পেটে ব্যথা ধরাইয়া দিল। পদব্রজে আসিলেও আরামে

আসিতে পারিতাম বলিয়া মনে হইল। তাজের সদর গেটে গাড়ী লাগিলে, আমরা ভিতরে প্রবেশ করিলাম। কিছুদূর অগ্রসর হইলে তাজের দ্বিতীয় গেটটি নয়ন-গোচর হইল। রক্তপ্রস্তরে-নির্মিত সুন্দর কারুকার্যখচিত অট্টালিকাটি দেখিয়া অনেকেই তাজমহল বলিয়া ভ্রম করেন। এই বিশাল দরজাটির মধ্য দিয়া সম্মুখে তাকাইলেই দেখিবেন, তুষারশুভ্র উজ্জলকায়া তাজ যমুনার তীরে সগৌরবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে।

দ্বিতীয় গেট হইতে তাজের দূরত্ব উত্তর দিকে প্রায় একশত হাত হইবে। পূর্ব-পশ্চিমের বিস্তৃতি ইহার অনেক বেশী, এই প্রশস্ত ভূমিখণ্ডে তাজের পুষ্পোদ্যান। দ্বিতীয় গেট হইতে তিন ফুট চওড়া রক্তপ্রস্তরে-নির্মিত সমান্তরালভাবে দুইটি রাস্তা তাজের গায়ে মিশিয়াছে। রাস্তা-দুইটির মধ্যস্থলে ক্ষুদ্র পিরামিড আকারে বিলাতি ঝাউগাছের সারি। মধ্যে মধ্যে কয়েকটি শ্বেতমর্মর-নির্মিত হাউস্ ও ফোয়ারায় প্রস্ফুটিত পদ্মফুল ও বিভিন্ন রঙের মৎস্য খেলা করিতেছে। উদ্যানের পশ্চিম সীমান্তে রক্তপ্রস্তরে-নির্মিত সুদৃশ্য মস্‌জিদ। পূর্ব সীমান্তেও মস্‌জিদের অনুরূপ নির্মিত তস্‌বিখানা। মস্‌জিদ হইতে তস্‌বিখানা পর্যন্ত ৩ ফুট উচ্চ লাল পাথরের একটি ভিত। এই দুইটি গৃহের দূরত্বের ঠিক মধ্যস্থলে লাল পাথরের ভিতরে উপরে তের হাত উঁচু মর্মরের ভিত। তাহার উপর তাজমহল অবস্থিত। দুই পার্শ্বের মর্মর সিঁড়ি দিয়া আমরা উপরে উঠিলাম। প্রশস্ত সমচতুষ্কোণ ভিতের ৪ কোণায় চারিটি মর্মরনির্মিত মিনার। মিনার-চারিটির সৌন্দর্য ও গঠন-পরিপাট্য মুস্‌লিম স্থাপত্যশিল্পের অনুপম অবদান। এই ভিতের ঠিক মধ্যস্থলে তাজমহল অবস্থিত। গৃহটির আপাদমস্তক উজ্জল শ্বেতমর্মরে নির্মিত। চারিদিকে চারিটি দরজা, দক্ষিণ দরজা ব্যতীত তিন দিকের দরজাগুলি মর্মরের জালি দিয়া আবৃত। দরজার নিচ হইতে উপরের খিলান বেষ্টন করিয়া সুরাইয়াসিন খোদিত রহিয়াছে। উজ্জল শ্বেতমর্মর খোদাই করিয়া চীন দেশ হইতে আনিত 'সঙ্গে মুসা' নামক উজ্জল কৃষ্ণ মর্মরের আরবি তোগরা অক্ষর প্রস্তুত করিয়া তাজের গায়ে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। উজ্জল শ্বেতমর্মরের উপরে উজ্জল কৃষ্ণ মর্মরের অক্ষরগুলি শিল্পনৈপুণ্যের আশ্চর্য নিদর্শন। দরজার পূর্বপ্রান্তে সুরাইয়াসিন আরম্ভ হইয়াছে। উপরের খিলান বেষ্টন করিয়া দরজার অপর পার্শ্বে শেষ হইয়াছে। অক্ষরগুলি সমান ভাবে এরূপ নৈপুণ্যের সহিত বসান হইয়াছে যে, দেখিলে অবাক হইতে হয়। শিল্পী আবুল হক সিরাজী কর্তৃক ইহা খোদিত হইয়াছিল। আমরা

তাজের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলাম।' সম্মুখে পাশাপাশি শ্বেতমর্মরমণ্ডিত দুইটি কবর। কবরের বেষ্টনীটি মর্মরজালি দিয়া প্রস্তুত করা হইয়াছে। বেষ্টনীটির কারুকার্য ও নির্মাণকৌশল দেখিলে আশ্চর্য হইতে হয়। কবর-দুইটির শিরোভাগে ২টি বড় আকারের গোলাপফুল প্রস্তুত করিয়া রাখা হইয়াছে। প্রথম দৃষ্টিতে উহা আসল গোলাপ বলিয়া ভ্রম হয়। ফুল-দুইটির স্বাভাবিক রঙ ফুটাইয়া তুলিতে বিভিন্ন রঙের প্রস্তরখণ্ড এমন সুকৌশলে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে দেখিলে বিস্ময়বোধ হয়। ভিতরের দেওয়ালে পবিত্র কোরান শরিফের সুরা আল ফাতাহ্, আল নাস্কাক, আল বাইয়োনাত খোদিত আছে।

তাজমহলে কোন রঙের কাজ নাই। সমস্তই বিভিন্ন রঙের পাথর বসাইয়া তাহার স্বাভাবিক সৌন্দর্য ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে। আমরা মৃত্তিকার অভ্যন্তরে আসল কবর জিয়ারতের জন্য গাইডের সাহায্য লইলাম। সিঁড়ি বাহিয়া ভিতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে হইল। গাইড মোমবাতি জ্বালাইয়া আসল কবর-দুইটি দেখাইলেন। আমরা জিয়ারত করিয়া বাহিরে আসিলাম। ভুবনবিখ্যাত তাজমহলের অতুলনীয় সৌন্দর্যের বর্ণনা আমার মত অকবি লেখকের পক্ষে সম্ভব নয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ হইতে অগণিত নরনারী তাজদর্শনে সমবেত হইতেছেন। সর্বদাই দর্শনার্থীদের মহামেলা লাগিয়া আছে। মমতাজমহলকে সাজাহান অত্যন্ত ভালবাসিতেন। দাক্ষিণাত্যের বোরহানপুরে অষ্টম সন্তান প্রসবকালে মমতাজ ইহলোক ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তিনি নাকি স্বামীকে অনুরোধ করিয়াছিলেন—'আমার সমাধির উপরে এমন একটি সৌধ নির্মাণ করিবে যাহার সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হইয়া দেশবিদেশ হইতে জনসাধারণ এখানে আসিবে ও আমার আত্মার কল্যাণ কামনা করিবে।' প্রেমিক সাজাহান প্রিয়তমা পত্নীর শেষ অনুরোধ রক্ষা করিয়াছিলেন। তাই আজ তাজ দুনিয়ার বুকে প্রেম ও প্রীতির অপূর্ব নিদর্শনস্বরূপ যমুনার তীরে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। বিখ্যাত ফরাসী ভ্রমণকারী টাভারনিয়ার বলিয়াছেন—আমি তাজমহলের নির্মাণ আরম্ভ ও শেষ দেখিয়াছি।

বিশ হাজার লোক বাইশ বৎসর পরিশ্রম করিয়া উহার নির্মাণকার্য সমাধা করে। প্রধান মিস্ত্রি ঈশা খাঁ, আমামুদ খাঁ, মোকররামাৎ খাঁ ও আরও অনেকে ছিলেন। ইহাদের বেতন তখনকার দিনে মাসিক পাঁচশত টাকা ছিল। টাভারনিয়ার সাহেব পাঁচ বার ভারতে আসিয়াছিলেন। আমরা সমস্ত দিন অস্নাত ও অভুক্ত থাকিয়া তাজমহলের সৌন্দর্য উপভোগ করিয়াছি। তখন শরৎকাল।

কলনাদিনী যমুনা তাজের ভিতের প্রান্তদেশ বিধৌত করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। শারদীয় জ্যোৎস্নায় তাজের প্রতিবিম্ব যমুনার নীল জলে প্রতিফলিত হইয়া ঢেউয়ের সঙ্গে আনন্দে নৃত্য করিতেছে। তুষারশুভ্র মর্মর গম্বুজটি জ্যোৎস্নালোকে উদ্ভাসিত হইয়া অপূর্ব্ব দৃশ্যের সৃষ্টি করিয়াছে। তরঙ্গায়িত যমুনার নীল জলে নৃত্যপরায়ণ তাজের অপূর্ব দৃশ্য আমাদিগকে আত্মহারা করিয়াছিল। অনেক রাত্রে তাজের নিকট হইতে বিদায় লইয়া আমরা বাসায় ফিরিলাম। তাজের মূল্যবান প্রস্তরগুলি এখন আর নাই। উহা দস্যুগণ কর্তৃক লুণ্ঠিত হইয়াছে। ইংরজ সরকার বিভিন্ন রঙের কাঁচ বসাইয়া দিয়া পূর্ব সৌন্দর্য বজায় রাখিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। আগ্রার অন্যতম দ্রষ্টব্য যমুনার অপর পারে এতমাতদ্দৌলার সমাধি সৌধ। সমাধিটির কার্য ও গঠনবৈপুণ্য অতি চমৎকার। শ্বেতমর্মর-নির্মিত সমাধি মন্দিরটির গঠনপ্রণালী ও শিল্পনৈপুণ্য ঠিক মোগল স্থাপত্য শিল্পের রূপ নহে। ইহাতে সারাসানীয় শিল্পের ছাপ রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়। আকারে ইহা তাজমহল অপেক্ষা ছোট। সাম্রাজ্ঞী নূরজাহানের পিতা মির্জা গিয়াস বেগ এখানে শায়িত আছেন। কোন কোন ঐতিহাসিক ইহার কারুকার্য ও সৌন্দর্য তাজ-মহল অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করেন। পর দিন আমরা পাশপোর্ট সংগ্রহ করিয়া আগ্রা দুর্গে প্রবেশ করিলাম। দিল্লী দুর্গের অনুরূপ লাল প্রস্তর দ্বারা ইহা যমুনার তীরে নির্মিত হইয়াছে। সম্রাট সাজাহান শেষ বয়সে এই দুর্গের অভ্যন্তরে নগিনা মস্‌জিদে পুত্র ঔরঙ্গজেব কর্তৃক নজরবন্দী অবস্থায় ছিলেন। প্রিয়তমা কন্যা জাহানারা সর্বদা পিতার পাশে থাকিয়া তাঁহার পরিচর্যা করিতেন ও তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতেন। গাইড সম্রাটের অবস্থানের স্থানটি আমাদিগকে দেখাইলেন। এখান হইতে তাজের অনুপম দৃশ্য নয়নগোচর হয়। ভগ্নহৃদয় সম্রাট বিনিদ্র রজনী তাজের পানে তাকাইয়া অতিবাহিত করিতেন। এখানকার মতি মস্‌জিদটি দিল্লীর মতি মস্‌জিদ অপেক্ষা আকারে বৃহৎ এবং উজ্জল শ্বেতমর্মরে নির্মিত। দিল্লী দুর্গের অনুরূপ দেওয়ান-ই খাস, দেওয়ান-ই আম, রঙমহল ইত্যাদি সৌধ এখানেও নির্মিত হইয়াছে। গাইড রঙমহলের দীর্ঘ ছাদটির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। ইহাতে কড়ি বরগা কিছুই নাই। তখন সিমেন্টের প্রচলন ছিল না। অথচ দীর্ঘ সমতল ছাদটি কোন্ মসলার দ্বারা প্রস্তুত হইয়া দীর্ঘকাল যাবৎ অক্ষত অবস্থায় আছে ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়।

দুর্গের অভ্যন্তর হইতে একটি সুড়ঙ্গ পথ যমুনা নদী পর্যন্ত চলিয়া গিয়াছে।

সুড়ঙ্গ পথে আলো প্রবেশের জন্য একটি ধূসর বর্ণের বৃহৎ প্রস্তর সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। আশ্চর্যের কথা স্বাভাবিক রঙের প্রস্তরখণ্ডের মধ্য দিয়া সূর্যালোক প্রবেশ করিয়া সুড়ঙ্গ পথটিকে আলোকিত করিয়াছে। পুনঃ পুনঃ অবাক বিস্ময়ে প্রস্তরটি নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিলাম, কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। আমরা দুর্গের অন্যান্য দর্শনীয় জিনিসগুলি দেখিয়া বাসায় ফিরিলাম। পরদিন আগ্রা হইতে ছয় মাইল দূরে সম্রাট আকবরের সমাধি সৌধ দেখিবার জন্য সেকেন্দ্রা যাত্রা করিলাম। রাস্তায় দেখি বড় বড় পানিফল বিক্রয় হইতেছে। আমরা দুই আনা মূল্যে উহার একসের খরিদ করিয়া লইলাম। গরমের দিনে ঘর্মাক্ত কলেবরে উহা আমাদিগকে অমৃতের স্বাদ দিয়াছিল। সমাধির প্রবেশদ্বারটি অতি বিশাল। সমাধি সৌধের গঠন প্রণালী ভিন্ন ধরনের ত্রিতল সামিয়ানার আকারে নির্মিত। দ্বিতীয় স্তরটি প্রথমটির অপেক্ষা এবং তৃতীয়টি দ্বিতীয়টি অপেক্ষা ছোট। নির্মাণকৌশল চমৎকার। যাঁহার দুর্দান্ত প্রতাপে একসময় সমগ্র ভারত কম্পিত হইত, নিজে লেখাপড়া না জানিয়াও যাঁহার অতুলনীয় প্রতিভা এক বিস্ময়ের বস্তু ছিল, সুধী সমাবেশে, দরবারে 'নও রতন' গঠন করিয়া যিনি দীর্ঘ অর্ধ-শতাব্দী যাবৎ সগৌরবে এদেশের শাসনদণ্ড পরিচালনা করিয়াছিলেন, সেই মহান সম্রাট আকবর আজ এইখানে অনন্তনিদ্রায় নিদ্রিত। যাঁহার অঙ্গুলি হেলনে একসময় ধরণী কম্পিত হইত, আজ তাঁহার অন্তিম শয্যা অসংখ্য চামচিকার আবাসস্থলে পরিণত হইয়াছে। কালস্য কুটিলা গতি। আমরা আগ্রার স্মৃতি বুকে লইয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলাম।

(২৩)

কাউন্সিল প্রবেশ

দিল্লীর সিদ্ধান্ত অনুসারে স্বরাজ্য দল কাউন্সিল প্রবেশের তোড়জোড় আরম্ভ করিয়া দিলেন। প্রত্যেক প্রদেশ হইতে নিজ দলের প্রার্থী মনোনীত করিয়া নির্বাচনে দাঁড় করাইলেন। নির্বাচন-পর্ব শেষ হইলে দেখা গেল অধিকাংশ আসনগুলি স্বরাজ্য দল দখল করিয়াছে। শুধু কাউন্সিল নির্বাচন নহে, লোকাল বোর্ড, জিলা বোর্ড ও অন্যান্য স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলির অধিক সংখ্যক সদস্যপদ তাহাদের দখলে আসিয়াছে। কলিকাতা কর্পোরেশনের মত বিরাট প্রতিষ্ঠান স্বরাজ্য দলের অধিকারে আসিল। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মেয়র ও জনাব শহীদ সুরাবর্দি ডেপুটী মেয়র

এবং সুভাষচন্দ্র বসু কলিকাতা করপোরেশনের চিফ একজিকিউটিভ অফিসার নিযুক্ত হইলেন। এই বৎসর (১৯২৩-২৪) দেশবন্ধু মুসলমানদের ন্যায্য দাবী স্বীকার করিয়া একটি চুক্তি সম্পাদিত করেন। উহাই 'বেঙ্গল প্যাক্ট' নামে খ্যাত। স্বরাজ্য দল চুক্তি অনুযায়ী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে মুসলমানদের দাবী স্বীকার করিয়া আসন বণ্টন করিয়া ছিলেন। কাউন্সিল অ্যাসেম্বিতে সংখ্যাধিক্যের ফলে ইংরেজ সরকারকে নাজেহাল হইতে হইয়াছিল। দেশের স্বার্থবিরোধী আইন সরকার পাস করিতে পারে নাই। বড়লাটের অর্ডিন্যান্স দ্বারা তখন শাসনকার্য পরিচালিত হইতেছিল।

কোকনদ কংগ্রেস

দিল্লীর স্পেশাল অধিবেশনের পর কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশন ১৯২৩ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষে অন্ধ্রদেশের কোকনদ শহরে বসিবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। মৌলানা মহম্মদ আলী সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন। আমরা অধিবেশনে যোগদানের জন্য কোকনদ রওনা হইলাম। বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের শ্যামলকোট জংশন হইতে একটি শাখা লাইন কোকনদ পর্যন্ত গিয়াছে। কোকনদ পৌঁছিয়া বেঙ্গল ক্যাম্পে আশ্রয় লইলাম। তালপাতার বেড়া ও ছাউনি দিয়া ডেলিগেট ক্যাম্পগুলি প্রস্তুত হইয়াছিল। কোকনদ সমুদ্রতীরবর্তী বিখ্যাত বন্দর। সভাপতি মৌলানা মহম্মদ আলীর অভ্যর্থনা উপলক্ষে রাজকীয় শোভাযাত্রার দৃশ্য একটি দেখিবার মত ছিল। ৩০শে ডিসেম্বর প্রথম অধিবেশন বসিল। সভাপতি মৌলানা সাহেবের মুদ্রিত দীর্ঘ অভিভাষণটি পাঠ করিতে দীর্ঘ সময় লাগিল। ইংরেজী, উর্দু ও হিন্দি ভাষায় একটি বিরাট পুস্তকাকারে অভিভাষণটি মুদ্রিত হইয়াছিল। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে এমনকি ব্রহ্মদেশ হইতে প্রতিনিধি আসিয়াছিল। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সংবাদপত্রের প্রতিনিধিগণ এই অধিবেশনে যোগদান করেন। কতিপয় সঙ্কীর্ণমনা হিন্দু ডেলিগেটদের দুষ্ট মানসিকতার জন্য দেশবন্ধুর হিন্দু-মুসলমানের মিলন-সেতু 'বেঙ্গল প্যাক্ট' এই অধিবেশনে বাতিল করা হয়। মুসলমান ডেলিগেট, এমনকি রাজা গোপালাচারি প্রমুখ কতিপয় বিশিষ্ট নেতৃস্থানীয় হিন্দু ইহাতে মর্মাহত হন। স্বয়ং দেশবন্ধু ক্ষোভের সঙ্গে বলেন—এদেশের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। এই ঘটনার পর হইতে মুসলমান ডেলিগেটগণ সঙ্কীর্ণমনা হিন্দু ডেলিগেটদের প্রতি বিশ্বাস হারাইয়া ফেলেন।

কোকনদ সমুদ্রতীরবর্তী বন্দর হইলেও নিকটে বড় জাহাজ ভিড়িবার সুবিধা

নাই বলিয়া ইহা বহির্বাণিজ্যের অনুকূল নহে। সমুদ্রতীরবর্তী প্রশস্ত রাজপথটির বিশ্রামস্থানে বসিয়া বিস্ময় বিস্ফারিত লোচনে সূর্যালোকের অনুপম দৃশ্য অবলোকন করিলাম। বাত্যাবিক্ষুব্ধ উত্তাল তরঙ্গরাশি আমাদের সম্মুখের বেলাভূমিতে আছড়াইয়া পড়িতেছে। শোঁ শোঁ শব্দে বাতাস বহিতেছে। বিক্ষিপ্ত জলকণা সূর্যকিরণে প্রতিফলিত হইয়া মুক্তাবিন্দুর ন্যায় শোভা পাইতেছে। আমরা আত্মহারা হইয়া এই দৃশ্য উপভোগ করিলাম। এ দেশের পুরুষরা লুঙ্গি পরিধান করিয়া থাকে। গলায় শার্টের উপর নেকটাই বাঁধে। মেয়েরা আমাদের দেশের পুরুষদের ন্যায় কাছা দিয়া শাড়ী পরিধান করে। পর্দার কোন বালাই নাই। মেয়েরা অপেক্ষাকৃত ফর্সা এবং উত্তম স্বাস্থ্যের অধিকারী। ভাষা তামিল ও তেলেগু। হিন্দি অথবা উর্দু মুসলমান ব্যতীত আর কেহ জানে না। ইংরেজী ভাষা কিন্তু বহুল প্রচলিত। অশিক্ষিত মুটে-মজুর গাড়োয়ান কাজ চালাইবার মত ইংরেজী বলিতে পারে। মাদ্রাজে ইংরেজরা প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করে। দীর্ঘ দিন ইহাদের সংস্পর্শে থাকিয়া বোধহয় ইহারা ইংরেজী ভাষা মোটামুটি রপ্ত করিয়া লইয়াছে। সমুদ্রতীরবর্তী বন্দরে ভীষণ শীতের আশঙ্কা করিয়া আমরা লেপ-তোশক বাঁধিয়া লইয়াছিলাম। এখানে আসিয়া দেখি বৃথাই বোঝা বহন করিয়াছি। পৌষ মাস অথচ শীতের প্রকোপ নাই বলিলেই চলে। এদেশে মুসলমান কম হইলেও শহরে কয়েকটি মসজিদ দেখিলাম। কয়েকজন মুসলমান ভদ্রলোকের সহিত আলাপ করিয়া বুঝিলাম ইহারা অবস্থাপন্ন সংখ্যালঘু লইলেও মর্যাদা ও প্রতিপত্তি লইয়া বসবাস করিতেছেন। ভাত এ দেশের প্রধান খাদ্য। ডাক্তার পট্টাভী সীতারামিয়া স্থানীয় প্রধান কংগ্রেস নেতা। কংগ্রেসের অধিবেশন শেষ হইলে আমরা কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলাম।

(২৪)

হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা

হিন্দু মহাসভার কার্যকলাপ, আর্যসমাজীদের শুদ্ধি আন্দলোন প্রভৃতি দেশের আবহাওয়া বিষাক্ত করিয়া তুলিয়াছিল। ভারতের বিভিন্ন স্থানে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গাহাঙ্গামা চলিতেছিল। ১৯২৩ সালের আগস্ট মাসে কলিকাতায় হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গাহাঙ্গামা শুরু হয়। ঢাকা, ময়মনসিংহ ইত্যাদি স্থানে সংঘর্ষ চলিতেছিল। অবস্থা এমন গুরুতর হইল যে হিন্দুদের সহিত মিলিয়া মিশিয়া

স্বাধীনতা-আন্দোলন পরিচালনা করা আমাদের পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিল। কলিকাতা কর্পোরেশনের ডেপুটি এক্সিকিউটিফ অফিসার জনাব হাজী আবদুর রশিদ সাহেবের পার্ক সার্কাস বাসভবনে এক ঘরোয়া বৈঠকে মিলিত হইবার কথা হইল, আমরা মুসলমান কর্মিগণ জনাব মৌলানা আবুল কালাম আজাদ সাহেবের সঙ্গে বর্তমান হিন্দু-মুসলমান সমস্যা লইয়া আলোচনা করিয়া কর্তব্য স্থির করিব। মৌলানা সাহেব তখন কলিকাতায় উপস্থিত ছিলেন না। তিনি আসিলে হাজী সাহেব তাঁহার সহিত আলোচনা করিয়া একটি বৈঠকের তারিখ নির্ধারণ করিবেন ও আমাদিগকে জানাইবেন। প্রায় ২ সপ্তাহ পর হাজী সাহেবের পত্র পাইলাম। বৈঠকের নির্ধারিত তারিখে আমাদিগকে যোগদান করিবার জন্য অনুরোধ জানাইয়াছেন। প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি এই সম্পর্কে আলোচনার জন্য নির্ধারিত তারিখের পরদিন একটি সভা আহ্বান করিয়াছেন। ব্যক্তিগত কোন কারণে আজাদ সাহেবের পরামর্শসভায় যোগদান করা আমার পক্ষে সম্ভব হইবে না মনে করিয়া পরদিন কংগ্রেসের সভায় যোগদানের উদ্দেশ্যে রাত্রির ট্রেনে কলিকাতা রওয়ানা হইলাম। হিলি স্টেশনে মোঃ আবদুল্লাহিল বাকী সাহেবের সহিত ট্রেনে সাক্ষাত হইল। তিনিও বিশেষ কাজে আবদ্ধ থাকায় পরামর্শসভায় যোগদান করিতে পারেন নাই। উভয়ে একত্রে কলিকাতায় পৌঁছিলাম। ভবানীপুরে প্রাদেশিক কংগ্রেস অফিসে পৌঁছিয়া সৈয়দ জালালউদ্দীন হাসেমী, মৌলভী শামস্উদ্দীন আহমদ প্রভৃতির সহিত দেখা হইল। মৌলানা সাহেব হাসেমী সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন—গতকাল আজাদ সাহেবের বাড়ীর মিটিং-এ কি আলোচনা হইল? হাসেমী সাহেব ছি ছি করিয়া উঠিলেন। বলিলেন—আমরা সারা বাংলার নেতৃস্থানীয় ২৫।২৬ জন লোক মৌলানা সাহেবের বাড়ীতে গিয়া সাক্ষাৎপ্রার্থী হইলাম। তিনি ফুরসত নাই বলিয়া আমাদের সহিত দেখা করিলেন না। আমরা দুঃখিত হৃদয়ে ফিরিয়া আসিলাম। এই কথাবার্তার সময় দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত তথায় উপস্থিত হইয়া আজাদ সাহেবের মিটিং-এ কি আলোচনা হইল জানিতে চাহিলেন। হাসেমী সাহেব পূর্বের কথা পুনরুক্তি করিলেন। সেনগুপ্ত সাহেব বলিলেন—আপনারা আজাদ সাহেবকে পূর্বে ফোন করিয়া দেখা করার অনুমতি লইয়াছিলেন কি? হাসেমী সাহেব উত্তরে বলিলেন—সে কথা তো ভাবিয়া দেখি নাই। সেনগুপ্ত সাহেব হাসিয়া বলিলেন—আজাদ সাহেবের বাস্তবিকই ফুরসত নাই। তিনি এত কাজে ব্যস্ত থাকেন যে নির্ধারিত সময় ব্যতীত কাহারও সহিত দেখা করিতে পারেন না।

আপনি-আমি তো দূরের কথা। স্বয়ং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের মটর তাঁহার দরজা হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে। আপনারা ফোন করিয়া সময় ঠিক করুন। নির্ধারিত সময়ে তিনি নিশ্চয়ই দেখা করিবেন। আমরাও ব্যক্তিগতভাবে অনেক বার তাঁহার দুয়ার হইতে ফিরিয়া আসিয়াছি। কিন্তু উপায় নাই। বুদ্ধি লইতে হইলে এই লোকের কাছে যাইতেই হইবে। ভারতীয় জাতীয় মহাসভা কোন গুরুতর প্রশ্নের সম্মুখীন হইলে মৌলানা আজাদ সাহেবের পরামর্শ তখন অনিবার্য হইয়া পড়ে। আমরা অবাক বিস্ময়ে সেনগুপ্ত সাহেবের কথা শুনিলাম। তখনই ফোন করা হইল। আজাদ সাহেবের সেক্রেটারি জবাব দিলেন আজ বৈকালে ৪টার সময় দেখা করিতে পারেন। আমরা ২০।২৫ জন লোক নির্ধারিত সময়ের কিছু পূর্বে আজাদ সাহেবের বালীগঞ্জ সার্কুলার রোডের বাড়ীতে ট্যাক্সি যোগে পৌঁছিলাম। আমার যতদূর মনে হয় সৈয়দ জালালউদ্দীন হাসেমী, সৈয়দ মজিদ বক্স, মৌলভী শামসুউদ্দীন আহম্মদ, হাজী আবদুর রশিদ খাঁ, আশরাফ্উদ্দীন চৌধুরী, গিয়াস্উদ্দীন আহম্মদ, মৌলানা আবদুল্লাহিল বাকী প্রমুখ বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ এই দলে ছিলেন। ইতিপূর্বে আমি আজাদ সাহেবের বাড়ীতে কোন দিন যাই নাই। মৌলানা আজাদ বিরাট প্রাসাদতুল্য অট্টালিকায় বাস করেন তাহা আমার ধারণাতীত ছিল। আমরা পৌঁছিবা মাত্র সেক্রেটারি সাহেব ও খদ্দরের উর্দি-পরিহিত দুই জন লোক আমাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া ভিতরে লইয়া গেলেন। সমস্ত হলঘরটি দামী কার্পেট বিছানো ও মধ্যস্থলে ডিম্বাকৃতি মর্মরমণ্ডিত একটি বড় টেবিল। টেবিলের চারিদিকে গদি আঁটা ভেলভেট-মণ্ডিত কতকগুলি সোফা ও দেওয়ালের গা ঘেঁসিয়া বড় বড় ২২টি আলমারী সাজান রহিয়াছে। আলমারীগুলি সোনালী বাইণ্ডিং-করা পুস্তকে ভর্তি রহিয়াছে। দেখিলে মনে হয়, এগুলি গৃহকর্তার অপরিসীম জ্ঞানানুশীলনের নিদর্শন। হলঘরের পূর্বদিকে একটি প্রশস্ত বারান্দায় শতরঞ্জি ও চাদর বিছাইয়া আমাদের বসিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। আমরা উপবেশন করিলে ৬টা বাজিবার সঙ্গে সঙ্গে মৌলানা সাহেব উপর হইতে নীচে নামিয়া আসিলেন। সাদা খদ্দরের পাজামা ও লম্বা কুর্তা, মাথায় সাদা টুপী পরিহিত জ্ঞান ও প্রতিভার জ্বলন্ত মূর্তি সৌম্যদর্শন প্রৌঢ়বয়স্ক মৌলানা সাহেবকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে আমরা দাঁড়াইয়া সালাম জানাইলাম। তিনি সালামের জওয়াব দিয়া আমাদের সঙ্গে বসিয়া পড়িলেন। তখন আসরের নামাজের সময়। নামাজ পড়ি নাই শুনিয়া তখনই ওজুর পানি দেওয়ার আদেশ হইল। তিনি ইমাম হইলেন আমরা সকলেই জামাতে নামাজ

আদায় করিয়া লইলাম। মৌলানা আবদুল্লাহিল বাকী সাহেবকে অগ্রণী করিয়া কথাবার্তা আরম্ভ হইল। বর্তমান হিন্দু-মুসলমানে বিরোধ ও দাঙ্গাহাঙ্গামা দেশের আবহাওয়াকে উত্তপ্ত করিয়া তুলিয়াছে। মুষ্টিমেয় কিছু সংখ্যক কংগ্রেসী হিন্দু আমাদের সহিত রহিলেও বিরাট হিন্দুসমাজ আমাদিগকে সুনজরে দেখিতেছে না। এরূপ অবস্থায় তাহাদের সহিত মিলিয়া মিশিয়া স্বাধীনতা-আন্দোলন কি করিয়া পরিচালনা করা যায়? এখন আমাদের কর্তব্য কি? উত্তরে মৌলানা আজাদ বলিলেন—দেশকে বিদেশীর কবল হইতে মুক্ত করার উদ্দেশ্য লইয়া আমরা কংগ্রেসে যোগদান করিয়াছি। অর্থ ও স্বার্থ লইয়া জগতে চিরকাল বিরোধ চলিয়াছে। আজও চলিতেছে। দেশে দেশে জাতিতে জাতিতে বিরোধ নূতন কিছুই নহে। হিন্দু-মুসলমান দূরের কথা, মুসলমানে মুসলমানেও বিরোধ চলিয়াছে। খলিফা হজরত ওসমান ও হজরত আলীর হত্যাকারিগণ কি মুসলমান ছিলেন না? হজরত মাবিয়া ও হজরত আলী দুই জন হজরতের সাহাবী ও পরমাত্মীয় ছিলেন, তবুও স্বার্থের জন্য তাঁহাদের মধ্যে ঘোরতর সংগ্রাম চলিয়াছিল। কারবালার মর্মান্তিক ঘটনা ও হজরত ইমাম হুসেনকে কাহারা শহিদ করিয়াছিল? উম্মাইয়া ও আব্বাসী শাসকগণ কি মুসলমান ছিলেন না? এদেশে মুঘল পাঠানের ইতিহাস আপনাদের অজানা নাই। সুতরাং বর্তমান হিন্দু-মুসলমান বিরোধের জন্য ভীত হইবার কি কারণ আছে? কংগ্রেসের মধ্য দিয়া স্বাধীনতা-সংগ্রামে আমরা বহুদূর অগ্রসর হইয়াছি। এখন যদি তুচ্ছ ঝগড়া-বিবাদের জন্য কংগ্রেস ত্যাগ করি তাহা হইলে আন্দোলন স্তিমিত হইয়া পড়িবে। ইংরেজকে তাড়াইতে না পারিলে স্বাধীনতা আসিবে না। মুসলীম লীগ কখনই ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অবতীর্ণ হইবে না। সুতরাং কংগ্রেসের সঙ্গে যোগ দিয়া আমাদিগকে স্বাধীনতা-সংগ্রাম চালাইতেই হইবে। নতুবা দেশ স্বাধীন হইবে না। অবশ্য নিজের জাতীয় স্বার্থরক্ষার জন্য লীগের প্রয়োজন আছে। যাঁহারা উহা চালাইতেছেন তাঁহারা চালাইতে থাকুন। হিন্দুদের বহু পূর্বে মুসলমানগণ স্বাধীনতা-আন্দোলন করিয়াছেন। মরহুম আবদুল্লা বীরলীভী ও মৌলানা ইস্মাইল শহিদ হাজার হাজার মুসলমান সহ বালাকোটের যুদ্ধে প্রাণ দিয়াছেন। তবু ইংরেজ তাড়ান সম্ভব হয় নাই। ইংরেজকে তাড়াইতে হইলে হিন্দুদের সহযোগিতা আবশ্যক। তাই আমরা কংগ্রেসের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতেছি। অগণিত হিন্দু-মুসলমান যুবক দেশের মুক্তির জন্য অসহ্য নিগ্রহ ভোগ করিতেছে। বন্দুকের গুলিতে ফাঁসীকাষ্ঠে প্রাণ দিতেছে।

আমরাও তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে অগ্রসর হইতেছি এ ত্যাগ বৃথা যাইবে না। স্বাধীনতা একদিন আসিবেই। বর্তমান আন্দোলনের মৌলবী মাহ্‌মুদুল হক দেওবন্দী, মৌলানা হুসেন আহম্মদ মাদানী, মৌলানা আতাউল্লা সাহ বুখারী, মৌলানা হাসরৎ মহানী, মৌলানা মহম্মদ আলী ও শওকত আলী প্রমুখ নেতৃবৃন্দের ত্যাগ ও সাধনা কোন হিন্দু নেতা অপেক্ষা কম নয়। আমরা যদি হিন্দুদের উপর রাগ করিয়া এই আন্দোলন হইতে সরিয়া পড়ি তাহা হইলে ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনের ইতিহাসে মুসলমানের নাম নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে। সংখ্যালঘু ও সংখ্যাগুরুর প্রশ্ন অবান্তর। মুসলমানেরা যখন প্রথম এদেশে আসেন তখন তাঁহাদের সংখ্যা কত ছিল? ত্রিশ কোটি হিন্দুর তুলনায় তাঁহারা মুষ্টিমেয় ছিল না কি? কিন্তু দীর্ঘ আট শত বৎসর দোর্দণ্ড প্রতাপে এদেশ তাহারা শাসন করিয়া গিয়াছেন। আজ আমরা খোদার ফজলে প্রায় দশ কোটিতে পরিণত হইয়াছি। আমরা ভয় করিব কেন? মুষ্টিমেয় বিদেশী ইংরেজ আজ কোটি কোটি ভারতবাসীকে শাসন করিতেছে। ইংরেজ এদেশ হইতে চলিয়া গেলে যে ভাবেই হউক, আমাদের দেশ আমরা শাসন করিব। দশ কোটি মুসলমানকে এদেশ হইতে বিতাড়িত করিবার সাধ্য কাহারও নাই। বর্তমানে পাঁচটি প্রদেশে আমাদের সংখ্যাধিক্য রহিয়াছে। এগুলির শাসনক্ষমতা কতকটা মুসলমানের হাতেই রহিয়াছে। তিনি কোন দিকে না তাকাইয়া আমাদিগকে গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতে উপদেশ দিলেন। এই আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে আতিথ্য-সৎকারের সুব্যবস্থাও তিনি করিয়াছিলেন। চা, বিস্কুট, শরবত, আঙুর, কলা, নাসপাতি ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে আমাদিগকে সরবরাহ করা হইয়াছিল। প্রায় বিশ মিনিট আলোচনার পর আজাদ সাহেব হঠাৎ দাঁড়াইয়া আমাদিগকে বলিলেন —ভাই, মেরা কাম হ্যায়, মুঝে মাপ কিজিয়ে, আচ্ছালাম আলায়কুম এই বলিয়াই তিনি চলিয়া গেলেন। আমরা আর কি করি। যতদূর সম্ভব আহার্য-দ্রব্যাদির সদ্ব্যবহার করিয়া বিদায় লইলাম। মৌলানা সাহেবের সময়নিষ্ঠার কারণ বুঝিতে পারিলাম। কর্ম- ও জ্ঞান-সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে সময়ের মূল্যবোধ নিতান্ত প্রয়োজন।

(২৫)

সিরাজগঞ্জ কন্‌ফারেন্স

১৯২৪ সালে সিরাজগঞ্জে প্রাদেশিক কংগ্রেসের অধিবেশন বসিল। মৌলানা মহম্মদ আকরাম খাঁ সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন। আমরা কন্‌ফারেন্সে ডেলিগেট

নির্বাচিত হইয়া যাইতেছিলাম। ঈশ্বরদী স্টেশনে কলিকাতা হইতে আগত দেশবন্ধু দাশ, সুভাষচন্দ্র বসু, জনাব শহীদ সোহরাবর্দী ও সভাপতি মৌলানা আকরাম খাঁ সাহেবের সাথে দেখা হইল। সোহরাবর্দী সাহেবের সাথে এই আমার প্রথম সাক্ষাৎ। সুভাষ বাবুই পরিচয় করাইয়া দিলেন। পরে অবশ্য বহুবার সোহরাবর্দী সাহেবের সঙ্গলাভের সৌভাগ্য হইয়াছে। সিরাজগঞ্জ কন্‌ফারেন্সে দেশবন্ধু 'বেঙ্গল প্যাক্ট' পুনরায় উত্থাপন করেন। কিছু সংখ্যক হিন্দু ডেলিগেট উহার বিরুদ্ধাচরণ করিলেও বহু ভোটে উহা পাস হইয়া যায়। সাধারণতঃ বর্ণ হিন্দুগণ ঐ প্যাক্ট অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করে নাই। গোপীনাথ সাহা নামক এক বিপ্লবী জনৈক ইংরেজকে রিভালভারের গুলিতে হত্যা করে। গোপীনাথ ধরা পড়িয়া ফাঁসীকাষ্ঠে প্রাণ দেয়। এই সভায় গোপীনাথের দেশপ্রেমের প্রশংসা করিয়া এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। অহিংস নীতির সমর্থক কংগ্রেস কি করিয়া হিংসাত্মক কার্যের সমর্থন করিতে পারে, ইহা লইয়া দেশে ঘোরতর আন্দোলনের সৃষ্টি হয়।

পর বৎসর ফরিদপুর প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্সের অধিবেশনে এই প্রস্তাব বাতিল করিয়া দেওয়া হয়। কবি ইস্‌মাইল হোসেন সিরাজী সাহেবের সহিত সভার উদ্যোক্তা-গণের মতভেদ হওয়ায় তিনি এই কন্‌ফারেন্সে যোগদান করেন নাই। প্রতিবাদ-স্বরূপ মুসলমানদের একটি পালটা সভা আহ্বান করিয়াছিলেন। আমরা শুনিতে পাইলাম, সিরাজী সাহেবের দল গোলমাল করিয়া কন্‌ফারেন্স ভাঙ্গিয়া দিবেন, কিন্তু সে রকম কিছু হয় নাই। নির্বিঘ্নে কন্‌ফারেন্স শেষ হইয়াছিল।

বেলগাঁও কংগ্রেস

১৯২৪ সালে জাতীয় মহাসমিতির বাৎসরিক অধিবেশন বোম্বাই প্রদেশের বেলগাঁও শহরে বসিবে স্থির হইল। মহাত্মা গান্ধী সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন। হিলি হইতে প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, বসন্তকুমার দাস, আমি ও দিনাজপুর রাণীর বন্দরের মৌলভী মনিরুদ্দীন আনোয়ারী ও কিছু সংখ্যক হিন্দু ডেলিগেট বেলগাঁও রওনা হইলাম। আমি ইতিপূর্বে অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির মেম্বার নির্বাচিত হইয়াছিলাম। কলিকাতায় উপস্থিত হইয়া বিভিন্ন জেলার প্রতিনিধিগণ সহ আমরা বেলগাঁও যাত্রা করিলাম। মাদ্রাজ মেল ঊর্ধ্বশ্বাসে আমাদিগকে লইয়া ছুটিল। আমরা উড়িষ্যার মহানদীর ব্রিজ অতিক্রম করিয়া চিল্কা হ্রদের পাশ দিয়া চলিয়াছি। জ্যোৎস্না রাত্রি ছিল, রেলপথের এক দিকে পাহাড়, অপর পার্শ্বে হ্রদ। হ্রদের রজতশুভ্র জলরাশি জ্যোৎস্নালোকে স্বপ্নের মায়াজাল সৃষ্টি করিয়াছিল। মুগ্ধনেত্রে তরঙ্গায়িত জলরাশি

দেখিতে দেখিতে উড়িষ্যা প্রদেশ অতিক্রম করিয়া আমরা ভিজিয়ানাগ্রাম স্টেশনে পৌঁছিলাম। এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি চমৎকার। একটি ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী নদী শহর প্রান্তস্থিত পর্বতের সানুদেশ বেষ্টন করিয়া সর্পিলগতিতে প্রবাহিত হইয়াছে। আমরা মুগ্ধদৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলাম। মাদ্রাজ মেল পাহাড়-পর্বত অতিক্রম করিয়া ভিজাগাপট্টম শহরে পৌঁছিল। স্থানীয় নাম ভাইজাক। পোশাকী নাম ওয়ালটেয়ার। ইহা মাদ্রাজ প্রদেশের বিখ্যাত স্বাস্থ্যনিবাস। এখানে মহা সমুদ্র ক্রুদ্ধ গর্জনে পর্বতগাত্রে তরঙ্গাঘাত করিতেছে। গিরিরাজ বিশাল বক্ষ প্রসারিত করিয়া উহাকে যেন আলিঙ্গন করিতেছে। ফেনিল জলরাশি সূর্যকিরণে ঝক ঝক করিতেছে। দৃশ্যটি বড়ই চমৎকার। অদূরে হিমাচল পর্বত। হিন্দুর পৌরাণিক কাহিনীর সহিত এই স্থানটি জড়িত। অত্যাচারী রাজা হিরণ্যকশিপুকে বধ করিয়া ভক্ত প্রহ্লাদকে রক্ষা করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ নৃসিংহ অবতার রূপ ধারণ করিয়াছিলেন। পর্বত-শিখরে নৃসিংহ দেবের মন্দির অবস্থিত। ইহা একটি হিন্দুতীর্থ। আমরা শ্যামলকোট জংশন (কোকনদের পথে) অতিক্রম করিয়া গোদাবরী নদীর বিশাল ব্রিজটি অতিক্রম করিয়া প্রসিদ্ধ বেজওয়াদা জংশনে পৌঁছিলাম।

এইখানে আমাদের গাড়ী বদল করিতে হইবে। হায়দ্রাবাদ নিজামের স্টেট রেলওয়ে এইখান হইতেই আরম্ভ হইয়াছে। আমরা মাদ্রাজের রাস্তা ত্যাগ করিয়া মিটারগেজ লাইনে মাদ্রাজ সাউদার্ন মারহাট্টা রেলওয়ের ট্রেনে চাপিয়া বসিলাম। ছোট গাড়ী অগ্র-পশ্চাৎ ২টি ইঞ্জিন পার্বত্য পথ অতিক্রম করিতেছে। কোথাও পাহাড় কাটিয়া দুই পাহাড়কে ব্রিজের সাহায্যে যুক্ত করিয়া, কোথাও-বা পর্বতগাত্র ভেদ করিয়া ট্রেন চলিয়াছে। এই পার্বত্য রেল-পথটি ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যার চমৎকার নিদর্শন। আমরা ক্রমশঃ কৃষ্ণা, কাবেরী, তুঙ্গভদ্রা প্রভৃতি দক্ষিণাপথের প্রধান নদীগুলি অতিক্রম করিলাম। রামায়ণে বর্ণিত সুগ্রীব ও বালী রাজার দেশ কিষ্কিন্ধ্যার উপর দিয়া চলিয়াছি। বালী রাজার বংশধরগণকে আজও নির্বিবাদে যত্র-তত্র বিচরণ করিতে দেখিলাম। জয়পুরের পর এত অসংখ্য বানর আর কোথাও দেখি নাই। গাবলী ও হসপেট জংশন পার হইয়া, চতুর্থ দিনে আমরা বেলগাঁও পৌঁছিলাম। বেলগাঁও একটি জেলা শহর। এই শহরের প্রায় দেড় মাইল দূরে রেল-লাইনের ধারে কংগ্রেস নগর নির্মিত হইয়াছে। চারিদিকে অসংখ্য তালগাছ। তালপাতার বেড়া ও ছাউনি দিয়া, অস্থায়ী রেলস্টেশন, পোস্ট ও টেলিগ্রাফ অফিস নির্মিত হইয়াছে। দোকানপাট,

বাজার, ডেলিগেট ক্যাম্প ইত্যাদি সমস্তই তালপাতায় নির্মিত। দক্ষিণ ভারতের প্রসিদ্ধ জননায়ক বালগঙ্গাধর তিলকের নামানুসারে স্থানটির নাম দেওয়া লইয়াছে 'তিলকনগর'। প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক পণ্ডিত সত্যচরণ শাস্ত্রী ও কলিকাতা হাইকোর্টের সুবিখ্যাত অ্যাডভোকেট মৌলভী ওয়াহিদ হোসেন আমাদের সহযাত্রী ছিলেন। স্থানীয় খাদি প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধনের জন্য মনীষী আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় আমাদের পূর্বেই সেথায় পৌঁছিয়াছেন। তাঁহার সহিত দেখা হইল। তিনি সস্নেহে কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিলেন। বেলা একটার সময় আমরা বেলগাঁও পৌঁছিয়াছি। ক্ষুৎপিপাসায় অস্থির হইয়া কিছু আহার্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে সহকর্মী বসন্ত দাসকে সঙ্গে লইয়া বাজারে গেলাম। দেখি এক দোকানে মোটা মোটা গরম জিলাপি প্রস্তুত হইতেছে। খরিদ করিতে গিয়া মুস্কিলে পড়িলাম। দোকানদার আমাদের কোন কথাই বোঝে না। সেও ইণ্ডিল মিণ্ডিল ভাষায় কি বলে আমরাও তাহা বুঝি না। অগত্যা হাত ইশারায় জিলাপি ও আধসেরি বাটখারা দেখাইয়া দিলে, সে ওজন করিয়া একটি পোঁটলা করিয়া দিল। মূল্য জিজ্ঞাসা করিয়া কোন লাভ হইল না। তাহাকে একটি টাকা দেওয়ায়, তাহার প্রাপ্য মূল্য লইয়া বাকী পয়সা সে ফেরত দিল। ৩০শে ডিসেম্বর মহাত্মাজীর নেতৃত্বে জাতীয় মহাসভার অধিবেশন বসিল। হিন্দি ভাষায় সভাপতি তাঁহার সংক্ষিপ্ত অভিভাষণটি পাঠ করিলেন। কয়েকটি প্রস্তাব গ্রহণের পর একদিনেই মহাসভার অধিবেশন শেষ হইল। ইতিপূর্বে এত সংক্ষিপ্ত অধিবেশন আর কোথাও হয় নাই। এখান হইতে তৎকালীন পর্তুগীজ উপনিবেশ গোয়া শহরের দূরত্ব মাত্র ২৪ মাইল। লক্ষ লক্ষ জনসমাগমে তিলকনগর মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। আমরা পুণা ও বোম্বে হইয়া কলিকাতায় ফিরিব। কিন্তু একটি মাত্র রেলপথ, রেল কর্তৃপক্ষ ২ ঘণ্টা পর পর স্পেশাল ট্রেনের ব্যবস্থা করিয়াও ভীড় কমাইতে পারিতেছে না। আমরা কোন প্রকারে ট্রেনে উঠিয়া পুণায় পৌঁছিলাম। পুণার খ্যাতনামা ব্যারিস্টার এন্. সি. কেলকার বেলগাঁও অধিবেশনে অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি ছিলেন। আমরা পুণায় গিয়া তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করিব বলিয়া স্থির করিয়াছিলাম। পুণা স্টেশনের ট্রেন হইতে নামিয়া দেখিলাম দলে আমরা ২০।২৫ জন হইয়াছি। এতগুলো লোক কোন ভদ্রলোকের বাড়ীতে হঠাৎ উপস্থিত হওয়া উচিত নয় বলিয়া মত পরিবর্তন করিয়া আমরা স্থানীয় কংগ্রেস কমিটির অফিসের দিকে রওয়ানা হইলাম। আমি, বসন্তবাবু, ও প্রতাপ মজুমদার এক গাড়ীতে ও অপর গাড়ীতে আনোয়ারী সাহেব ও

মোয়াজ্জেম মিঞা ছিলেন। আমাদের গাড়ীর ঘোড়াটি বেশ তেজী ছিল। আমরা তাড়াতাড়ি গন্তব্য স্থানে পৌঁছিলাম। কিন্তু আনোয়ারী সাহেবের গাড়ীর কোন পাত্তা নাই। কংগ্রেস অফিসে গিয়া দেখি বাড়ীটি মেরামত হইতেছে। সেখানে বাস করা সম্ভব নয়। অগত্যা 'কেলকার' সাহেবের বাড়ীতেই যাইতে হইল। প্রতাপ বাবুকে বলিলাম—দলের মধ্যে আমিই একমাত্র মুসলমান, ইঁহারা মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ। এই ছুতমার্গের দেশে আমাকে লইয়া তোমাদের গৃহস্বামীর অসুবিধার সৃষ্টি হইতে পারে। সুতরাং গৃহস্বামীকে পূর্বেই বলা উচিত। 'কেলকার' সাহেব তখন বেলগাঁয়ে আছেন। বাড়ীতে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্রের নামে এক পত্র দিয়া তিনি আমাদের আতিথ্য সৎকারের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। আমার কথা শুনিয়া বাড়ীর ৩।৪ জন মেয়ে পুরুষ অত্যন্ত আগ্রহসহকারে আমাকে লইয়া গেলেন। দ্বিতলের এক প্রশস্ত কামরায় বসিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। রাত্রি তখন প্রায় ৮টা। আনোয়ারী সাহেব ও মোয়াজ্জেম মিঞা তখন পর্যন্ত না পৌঁছাইতে পারায় আমি বড় চিন্তিত হইয়া পড়িলাম। বিশেষ করিয়া আমার কিশোর আত্মীয়টি (মোয়াজ্জেম মিঞা) কোন দিন বিদেশ ভ্রমণ করেন নাই। প্রায় দেড় সহস্র মাইল দূরবর্তী অজানা অচেনা দেশে আমাকে না দেখিয়া তাহার মানসিক অবস্থা খারাপ হইতে পারে—এই চিন্তায় আমি বড় উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলাম। বন্ধুদিগকে বলিয়া তখনই এক্কা গাড়ী যোগে স্টেশনের দিকে তাহাদের সন্ধানে বাহির হইলাম। কিন্তু কোথায় সন্ধান করিব? প্রায় ৩ লক্ষ লোকের আবাসভূমি এই পুণা শহর আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত। নানা স্থান ঘুরিয়া ক্লান্ত শরীরে বাসায় ফিরিলাম। রাত্রে আহারের ব্যবস্থা হইল। একটি দীর্ঘ প্রশস্ত বারান্দায় প্রত্যেকের জন্য পৃথক পৃথক আসন দেওয়া হইল। ২৪ জন অতিথিদের মধ্যে আমিই একমাত্র মুসলমান। ঢাকার প্রসিদ্ধ জননায়ক শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং রংপুর তুলসীঘাটের জমিদার শ্রীবিজয়চন্দ্র রায় প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ একত্রে বসিয়াছিলাম। লুচি ও নিরামিষ কয়েক প্রকার তরকারির ব্যবস্থা ছিল। পিয়ারার চাটনি, পর্যাপ্ত পরিমাণ ঘি বাড়ীব মেয়েরা পরিবেশন করিতেছিলেন। পর্দাপ্রথা এদেশে নাই। অন্দর-বাহির সর্বত্রই সমান। কেলকারের সুশিক্ষিতা দুইটি মেয়ে, তাঁহার বৃদ্ধা স্ত্রী ও পুত্রগণ আমাদের আহারের তদ্বির করিতেছিলেন। রাত্রে সঙ্গিদ্বয়ের চিন্তায় আমার ভাল ঘুম হইল না। পরদিন প্রাতে সহযাত্রী বন্ধুগণ মহারাষ্ট্র-নেতা শিবাজীর সিংহগড় দুর্গ দেখিবার জন্য যাত্রা করিলেন। আমি আমার হারানো বন্ধুদের খোঁজে বাহির হইলাম। রাস্তায় এক মুসলমান ভদ্রলোকের

সহিত দেখা হইলে তাহাকে সকল কথা বলিলাম। তিনি বলিলেন—মৌলানা মানুষ হয়তো কোন মস্‌জিদে থাকিতে পারেন। ভদ্রলোক সঙ্গে করিয়া একটি বড় মস্‌জিদে লইয়া গেলেন। সেখানে কোন সন্ধান মিলিল না। কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছি দেখি, খদ্দরপরিহিত এক মুসলমান ভদ্রলোক আসিতেছেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন—'খেলাফত' কমিটির আফিসে খোঁজ লইয়া দেখুন, হয়তো সেখানেই তাঁহারা আছেন। এখানে খেলাফত কমিটি আছে বলিয়া আমার জানা ছিল না। সেখানে গিয়া তাঁহাদিগকে পাইলাম। তাঁহারা আনন্দের সঙ্গেই সেখানে ছিলেন। অবশ্য তাঁহাদের খুঁজিতে আমাকে হয়রান হইতে হইয়াছে বলিলাম। কথা হইল আমরা সারাদিন এখানে কাটাইয়া রাত্রি ১০টার ট্রেনে বোম্বাই রওয়ানা হইব। পুণা শহরের দর্শনীয় স্থানগুলি দেখিবার জন্য দুই টাকার চুক্তিতে ১টি ঘোড়ার গাড়ী লইয়া তিন জন একত্রে যাত্রা করিলাম। শিবাজী-স্থাপিত পার্বতী দেবীর মন্দিরে গাড়ওয়ান আমাদিগকে লইয়া গেল। মন্দিরটি একটি অনুচ্চ পর্বত-চূড়ায় অবস্থিত। পর্বতগাত্র কাটিয়া সিঁড়ি প্রস্তুত করা হইয়াছে। আনোয়ারী সাহেব অপেক্ষাকৃত বেঁটে ও স্থূলকায় মানুষ। তিনি খানিকটা উঠিয়া হাঁপাইতে লাগিলেন। অর্ধপথে একটি বৃহৎ নিমগাছের তলায় বিশ্রামের জন্য কয়েকটি বেঞ্চ পাতা রহিয়াছে। কিছুক্ষণ তথায় বিশ্রাম লইয়া আমরা মন্দিরপ্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলাম। মর্মরনির্মিত ও কারুকার্যখচিত মন্দিরটি আকারে ক্ষুদ্র হইলেও দেখিতে বড়ই সুন্দর। গম্বুজের চূড়াটি সুবর্ণমণ্ডিত। পারিপার্শিক দৃশ্য অতি চমৎকার। সেবাইত আমাদিগকে বলিলেন—এখানকার অধিষ্ঠাত্রী শিবাজী মহারাজের উপাস্য ছিলেন। মন্দিরের দরজা তখন বন্ধ ছিল। শুনিলাম সকালে ও সন্ধ্যায় দেবীর অর্চনার সময় মন্দিরের দ্বারোদ্‌ঘাটন করা হয়। তথা হইতে গাড়ওয়ান আমাদিগকে ভিক্টোরিয়া গার্ডেনে লইয়া গেল। সুবিশাল উদ্যান বিভিন্ন শ্রেণীর বৃক্ষলতাদি দ্বারা সুসজ্জিত। এক পার্শ্বে এয়ারোড্রোম। ৮।১০টি Plane তথায় ছিল। আমরা নিকটে গিয়া বেশ করিয়া দেখিলাম। দেশে তখন Plane service ছিল না। Plane-গুলি কেবল সরকারী কাজেই ব্যবহৃত হইত। তথা হইতে আমরা পেশওয়াদের বাড়ী দেখিতে গেলাম। তখন দেখার মত কিছুই ছিল না। সমস্তই ধ্বংসস্তূপ। কেবল প্রবেশদ্বারটি অক্ষত আছে। বিশাল দরজার খিলান মাটি হইতে প্রায় ২৫ হাত উঁচু। দুটি হাতী পাশাপাশি প্রবেশ করিতে পারে। ১ ফুট পুরু তক্তা দিয়া দরজার কপাট প্রস্তুত করা হইয়াছে। হাতীর সাহায্যে দরজা

ভাঙ্গিতে না পারে তজ্জন্য তীক্ষ্ণ লোহার পেরেক কপাটে লাগান আছে। চারিদিকে বেষ্টিত বিশাল প্রাচীরটির স্থানে স্থানে ধ্বসিয়া গিয়াছে। তৃতীয় পানিপথ যুদ্ধে বীরশ্রেষ্ঠ আহম্মদ শাহ্ আবদালীর সহিত বালাজী বাজীরাও-এর দুর্ধর্ষ সেনাপতি সদাশিব পাণ্ডে ভীষণ যুদ্ধে পরাজিত হওয়ায় মহারাষ্ট্র শক্তি হীনবল হইয়া পড়ে। মহাকবি 'কায়কোবাদ' "মহাশ্মশান কাব্যে" তাঁহাদের বীরত্বগাথা বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। যে বর্গীদের অত্যাচারে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার অংশবিশেষ শ্মশানে পরিণত হইয়াছিল, নবাব আলীবর্দী খাঁ সম্মুখ যুদ্ধে বার বার পরাজিত করিয়াও তাঁহাদের সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সেই দুর্ধর্ষ জাতীয় বংশধরেরা বর্তমান স্বাভাবিক নাগরিক জীবনযাপন করিতেছেন। আমরা রাত্রেই বোম্বাই চলিয়া যাইব বলিয়া বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। সঙ্গী-দুইজন খেলাফত অফিসেই গেলেন। বেলা তখন প্রায় ৪টা। আমার অন্যান্য সঙ্গীরা সিংহগড় হইতে তখনও ফিরে নাই। বাসায় ফিরিবার সঙ্গে সঙ্গে গৃহস্বামীর কনিষ্ঠা কন্যাটি আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন—সারাদিন আপনি কোথায় ছিলেন? বলিলাম—আমার হারানো সঙ্গীদের খোঁজে গিয়াছিলাম। 'খেলাফত' কমিটিতে তাহাদের সহিত দেখা হইয়াছে। তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া শহরের দ্রষ্টব্য স্থানগুলো দেখিয়া লইলাম। মেয়েটি বলিলেন—খাবার লইয়া আসি। আমি বলিলাম—দিনের খাওয়া হোটেলেই সারিয়াছি। এখন আর খাওয়া সম্ভব নয়। তিনি হাসিয়া বলিলেন—আপনি আমাদের অতিথি। অতিথি অভুক্ত থাকিলে অমঙ্গল হয়। সুতরাং আপনাকে খাইতেই হইবে। আমি হাসিয়া বলিলাম—অভুক্ত তো নই। হোটেলে খাইয়াছি। রাত্রে খাইয়া আপনার অমঙ্গলের আশঙ্কা দূর করিয়া দিব। উত্তরে তিনি বলিলেন—দুবেলার খাওয়া এক সঙ্গেই খাইতে হইবে। হাসিতে হাসিতে বলিলাম—যতদূর সম্ভব চেষ্টা করিব। মেয়েটি অবিবাহিতা, গ্রাজুয়েট, সুন্দরী ও স্বাস্থ্যবতী। কোথায় কোথায় গিয়াছিলাম তিনি শুনিলেন। ফারগুশন কলেজ দেখি নাই বলিয়া দেখিয়া আসিতে অনুরোধ করিলেন। ফারগুশন কলেজের নাম ইতিপূর্বেই শুনিয়াছিলাম। সন্ধ্যার প্রাক্‌কালেই তথায় পৌঁছিলাম। একটি পাহাড়ের সানুদেশে অপেক্ষাকৃত সমতল ভূমিতে কলেজটি অবস্থিত। ক্ষুদ্র একটি নদী সম্মুখ দিয়া বহিয়া যাইতেছে। সুবিশাল কলেজ গৃহটি প্রস্তরনির্মিত চমৎকার স্থাপত্যশিল্পের নিদর্শন। পাশেই বিরাট কলেজ হোস্টেল। তখন স্ত্রী-শিক্ষার প্রচলনে ভারতের ত্রিবাংকুরের পর মহারাষ্ট্র অগ্রণী ছিল। এখানকার

পাহাড়- ও নদী-বেষ্টিত শ্যামল তৃণাচ্ছাদিত সমতল ভূমিতে শ্রেণীবদ্ধ শিক্ষায়তন-গুলির অবস্থান নয়ন-তৃপ্তিকর। সন্ধ্যার পরে বাসায় ফিরিলাম। আমার সঙ্গী বন্ধুগণ ফিরিয়া আসিয়াছেন। রাত্রের আহার সমাধান হইল। সেই মেয়েটি আমি দিনে খাই নাই বলিয়া ডবল খাবারের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া হাসিতে লাগিলেন। আমরা রাত্রেই চলিয়া যাইব শুনিয়া বাড়ীর সকলেই বাঁকিয়া বসিলেন। অন্ততঃ আরও দুই দিন থাকিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। কিন্তু বাড়ীমুখো বাঙালী অনেক বলিয়া কহিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলাম। গৃহকর্ত্রী স্বয়ং ও বাড়ীর ছেলেমেয়েরা রাস্তা পর্যন্ত আসিয়া আমাদিগকে বিদায় দিলেন। ইঁহাদের সহৃদয়তা ও আতিথ্য-সৎকারের কথা কোন দিন ভুলিব না। পুণা মহারাষ্ট্রনেতা বালগঙ্গাধর তিলকের জন্মভূমি। তাঁহার পরিচালিত 'কিশোরী' পত্রিকা দক্ষিণ ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংবাদপত্র। এই পত্রিকার একটি প্রবন্ধের জন্য তাঁহার ছয় বৎসর কারাদণ্ড হইয়াছিল। তিনি বিলাত পর্যন্ত আপিল চালাইয়াছেন। কিন্তু কোন ফল হয় নাই। সরকার তাঁহাকে ছাড়েন নাই, তিনি তিলক মহারাজ বলিয়া সর্বত্র সম্মানিত হইতেন। স্থানীয় পাবলিক প্রতিষ্ঠানগুলির সহিত তাঁহার নাম যুক্ত ছিল। এখানকার প্রধান বাজারটির নাম 'তিলক মার্কেট'। পেঁপে ও উৎকৃষ্ট কলা এখানে পাওয়া যায়। স্টেশনে বন্ধুদের সঙ্গে মিলিত হইলাম। সারারাত পার্বত্য রেলপথে পাহাড়ের পর পাহাড় অতিক্রম করিয়া ভোর পাঁচটায় বোম্বায়ের বিখ্যাত 'ভিক্টোরিয়া টার্মিনাস' (বুড়ী বন্দর) স্টেশনে পৌঁছিলাম। তখনকার দিনে সমগ্র ভারতে এরূপ বিরাট কারুকার্যখচিত রেল স্টেশন আর ছিল না। আমরা সেন্ট্রাল খেলাফত কমিটির অফিসে আশ্রয় লইলাম। একটি বিশাল ত্রিতল অট্টালিকায় খেলাফত কমিটির অফিস। তথায় মৌলানা শওকত আলী ও মৌলানা আবুল কালাম আজাদ সাহেবের সহিত দেখা হইল। তাঁহারা আমাদিগকে স্বাগত জানাইলেন ও আমাদের চা-নাস্তার ব্যবস্থা করিলেন। বোম্বে ভারতের দ্বিতীয় মহানগরী। ট্রাম, বাস, ট্যাক্সি ইত্যাদি যান-বাহন ব্যতীত বি. বি. সি. আই. রেল গাড়ী পাঁচ মিনিট পর পর যাতায়াত করিতেছে। ভাড়া বেশ সস্তা। আমরা ট্রেনে চাপিয়া সারা শহরটি ঘুরিয়া আসিলাম। বোম্বে হাইকোর্ট সমুদ্রসৈকতে অবস্থিত। হাইকোর্টের সম্মুখে সমুদ্রোপকূল পর্যন্ত একটি সুন্দর পুষ্পোদ্যান। বিশ্রামের জন্য স্থানে স্থানে বেঞ্চ পাতা রহিয়াছে। বেঞ্চে বসিয়া সমুদ্রের ক্রুদ্ধ গর্জন শুনিতেছি। তখন জোরে বাতাস বহিতেছিল। উত্তাল তরঙ্গমালা বেলাভূমিতে আছড়াইয়া পড়িতেছিল। কুয়াশার জন্য দূরে কিছুই দেখা যাইতেছিল

না। স্থলভূমির সহিত যুক্ত একটি পাহাড় সমুদ্রের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। ইহাই 'মালাবার হিল'। কয়েকজন প্রসিদ্ধ ধনকুবেরের বাস এখানে। মিস্টার মুহম্মদ আলী জিন্নাহ্‌র বাসভবন এখানেই ছিল। প্রশস্ত রাজপথ সুদৃশ্য প্রাসাদমালা-শোভিত মহানগরী বোম্বে, অভিজাত্য ও ধনৈশ্বর্যে গরীয়সী। আমরা সারাদিন প্রধান প্রধান দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখিলাম।

বিখ্যাত ক্র্যাফোর্ড মার্কেট এখানকার সুদৃশ্য বাজার। কিন্তু কলিকাতার নিউ মার্কেটের মত সুন্দর নয়। বাজারে নাম-না-জানা বহু সামুদ্রিক মাছ বিক্রয় হইতেছে। পুণার ন্যায় এখানকার কলা ও পেঁপে আকারে বড় ও সুস্বাদু। আমরা রাত্রেই বোম্বাই ত্যাগ করিয়া টাটানগর হইয়া কলিকাতায় যাইব। মৌলানা শওকত আলী সাহেব আমাদেরকে আরও দুই-এক দিন থাকিয়া যাইতে বলিলেন। আমরা বিনীতভাবে অক্ষমতা জানাইয়া তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইলাম। আসিবার সময় গোদাবরী নদীর মোহনা অতিক্রম করিয়া আসিয়াছিলাম। এবার উৎপত্তিস্থান হইয়া ফিরিতেছি। কল্যাণ জংশন অতিক্রম করিয়া নাসিকে ট্রেন পৌঁছিল। নাসিক হিন্দুতীর্থ। রামায়ণ-বর্ণিত রামচন্দ্র রাবণ রাজার ভগ্নী সুর্পণখার নাসিকা ছেদন করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম নাসিক হইয়াছে। চারিদিকে পাহাড় আর জঙ্গল। আমরা মধ্যভারতের মধ্য দিয়া চলিয়াছি। ভুসুয়াল, রায়পুর, অমরাবতী অতিক্রম করিয়া মধ্যপ্রদেশের রাজধানী নাগপুর স্টেশনে পৌঁছিলাম। এই অঞ্চলটি তুলার আবাদের জন্য প্রসিদ্ধ। রেল-লাইনের দুই ধারে কেবল তুলার আবাদ। নাগপুর স্টেশনে অনেকক্ষণ ট্রেন থামিল। প্ল্যাট্‌ফরমে দুটি বাঙালী যুবককে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—আপনাদের দেশ কোথায়? মাতৃভাষায় আহ্বান শুনিয়া তাঁহারা দৌড়াইয়া আমাদের দিকে আসিলেন।

গাড়ীতে উঠিয়া হাসিমুখে আলিঙ্গন করিলেন। তাঁহারা কুমিল্লা জেলার লোক। আমাদিগকে আতিথ্য গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানাইলেন। বলিলাম—'ভাই, বাড়ীমুখো বাঙালী, সুতরাং মাফ করিতে হইবে।' আমাদের অসম্মতি দেখিয়া তাঁহারা কিছু কমলালেবু কিনিয়া দিলেন। ট্রেন ছাড়িলে রুমাল উড়াইয়া বিদায় অভিনন্দন জানাইলেন। তাঁহারা সরকারী চাকুরি করেন। দূরদেশে নিজের দেশের লোক সে যে-কোন ধর্মাবলম্বী হউক না কেন, দেখা হইলে পরম আত্মীয় বলিয়া মনে হয়। যুবক-দুইটির সহৃদয়তার কথা চিন্তা করিতে করিতে দুই দিন পর অতি প্রত্যুষে টাটানগর পৌঁছিলাম। দুই স্টেশন পূর্বে অন্ধকার রাত্রে জ্যোৎস্নালোকের ন্যায় আলো

দেখিয়া জিজ্ঞাসায় জানিলাম উহা টাটা নগরের আলো। টাটার দৌলতে এ অঞ্চলে নিত্য পূর্ণিমা বিরাজিত। স্টেশন মাস্টারের জিম্মায় আমাদের মালপত্র রাখিয়া কর্তৃপক্ষের অনুমতি লইয়া কারখানায় প্রবেশ করিলাম। সুবিস্তৃত বিরাট কারখানার ভিতরে চলাচলের জন্য সর্বত্র ওভার ব্রিজ রহিয়াছে। অপরিচিত আমরা কোথায় কোন দিকে যাইব স্থির করিতে পারিতেছি না। দুইটি ভদ্রলোক নিকটেই একটি অফিসে কাজ করিতেছিলেন। আমাদিগকে দেখিয়া চলিয়া আসিলেন। কংগ্রেস-প্রত্যাগত ডেলিগেট কারখানা দেখিতে আসিয়াছি শুনিয়া, তাঁহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আমাদের সঙ্গ লইলেন।

ওভার ব্রিজের উপর দিয়া কারখানার কেন্দ্রস্থল পাওয়ার হাউসের নিকটে পৌঁছিলাম। এত বড় পাওয়ার হাউস ভারতে আর দ্বিতীয় নাই। ২০০০০ বিশ হাজার হর্স পাওয়ার দ্বারা ইঞ্জিনটি পরিচালিত হয়। চারিদিকে অভাবনীয় দৃশ্য। চারিদিকে হুম হুম শব্দ। মনে হয় যেন ভূমিকম্প হইতেছে। পাওয়ার হাউসের নিকটে প্রস্তরমিশ্রিত লৌহ টাটার নিজস্ব রেলযোগে খনি হইতে আনিয়া স্তূপাকারে রাখা হইতেছে। মিশ্রিত লৌহ প্রায় ৫০ ফুট উচুঁতে একটি প্রকাণ্ড লৌহ চুল্লীতে ইলেকট্রিক ক্রেনের সাহায্যে নীত হইতেছে। প্রচণ্ড অগ্নিতাপে গলিত লৌহ পাইপের মধ্য দিয়া একটি মেসিনে প্রবেশ করিতেছে। মেসিনের মধ্যে এক পার্শ্ব দিয়া ময়লাগুলি বাহির হইয়া যাইতেছে। অপর পার্শ্ব দিয়া পরিশ্রুত গলিত লৌহ ছাঁচের মধ্যে পড়িয়া বিভিন্ন দ্রব্য প্রস্তুত হইতেছে। রেল-লাইন ও করোগেটেড্ টিন প্রস্তুত করা দেখিলাম। নিম্নে বিভিন্ন দ্রব্য প্রস্তুত-উপযোগী ভিন্ন ভিন্ন রূপ মেসিন বসান আছে। জলন্ত লোহার পাত একটি মেসিন হইতে বাহির হইবার সঙ্গে সঙ্গে সাঁড়াশীর আকৃতি অপর-একটি মেসিন উহা ধরিয়া লইয়া অদূরে অবস্থিত অপর একটি মেসিনে প্রবেশ করাইয়া দিতেছে। মেসিনের চাপে ঢেউখেলানো টিন প্রস্তুত হইয়া গ্যালভানাইজড্ ট্যাঙ্কে যাইয়া পড়িতেছে। অপর একটি মেসিনের সাহায্যে টিনগুলি উঠাইয়া বাণ্ডিল করিয়া রাখা হইতেছে।

এই রূপ বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রকারের জিনিস প্রস্তুত হইতেছে। উপরে ওভার ব্রিজে দাঁড়াইয়া নিচে চারিদিকে জলন্ত লৌহের ছোটাছুটি দেখিলে বিস্ময়ে অবাক হইতে হয়। আট বর্গমাইল ব্যাপী বিরাট কারখানাটি সম্পূর্ণ দেখিতে গেলে বহু সময়ের দরকার। আমরা কতটুকুই বা দেখিলাম। তাহাতেই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি। সঙ্গী ভদ্রলোক-দুইটি লাইব্রেরি হলে আমাদের বিশ্রামের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

লাইব্রেরিটি প্রকাণ্ড। ভারতীয় যাবতীয় ভাষার পুস্তকাদি এখানে রহিয়াছে। বিভিন্ন ভাষাভাষী প্রায় আট হাজার কর্মচারী এখানে কর্মে নিযুক্ত আছে। ইতিপূর্বে সুভাষ বাবু কয়েক বার এখানে আসিয়াছিলেন। মিলের কর্মচারিগণ রাজকীয় অভ্যর্থনায় তাঁহাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের অভাব-অভিযোগের কথা সুভাষ বাবুকে জানাইয়াছিলেন। টাটার কর্মচারীদের মধ্যে কংগ্রেসের বিপুল প্রভাব। আমরা কংগ্রেসের লোক শুনিয়া অনেকেই আমাদের সহিত দেখা করিলেন। উত্তম মধ্যাহ্ন ভোজের ব্যবস্থা হইল। রাত্রে থাকিয়া এক সভায় কিছু বক্তৃতা দিতে তাঁহারা আমাদের অনুরোধ জানাইলেন। কিন্তু আমরা তখন পালাইতে পারিলেই বাঁচি। অক্ষমতা জানাইয়া তাঁহাদের নিকট বিদায় লইলাম। তাঁহারা সদলবলে আসিয়া আমাদের ট্রেনে তুলিয়া দিলেন। তাঁহাদের আদর-আপ্যায়ন ও আতিথেয়তার কথা চিরদিন স্মরণ থাকিবে। টাটা নগরের পুরাতন নাম সাকচী।

জঙ্গল ও কতকগুলি সাঁওতালের বস্তি ব্যতীত এখানে আর কিছুই ছিল না। স্থানটি সুবর্ণরেখা নদীর ধারে। বোম্বাই-এর বিখ্যাত বণিক সার জামসেদজী টাটা একটি লোহার কারখানা স্থাপনের জন্য ভারতের বিভিন্ন স্থান পর্যটন করেন। অবশেষে এখানে গরুমহিষাণী পাহাড়ে লোহার সন্ধান পান। স্থানটি জঙ্গল ও পর্বতবেষ্টিত উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জ এস্টেটের অধীন। টাটা আমেরিকা হইতে কয়েকজন বিশেষজ্ঞ আনিয়া ঐ স্থানটি পরীক্ষা করান। বিশেষজ্ঞদের মতে এখানে এত প্রচুর লোহা রহিয়াছে। দৈনিক দুই হাজার মণ করিয়া উত্তোলন করিলেও চার হাজার বৎসরে ইহা শেষ হইবে না। টাটা ময়ূরভঞ্জের রাজার নিকট হইতে এই স্থানটি ৯৯ বৎসরের জন্য ইজারা লইয়া কার্যারম্ভ করেন। ক্রমশঃ বনজঙ্গল পরিষ্কার হইয়া একটি বিরাট কারখানা গড়িয়া উঠিতে থাকে। অতীতের নগন্য সাঁওতাল বস্তি সাকচী বর্তমানে দুই লক্ষ অধিবাসিপূর্ণ একটি সুন্দর আধুনিক শহরে পরিণত হইয়াছে। সার জামসেদজী টাটার নামানুসারে এই শহরের নাম হইল জামসেদপুর, ডাক নাম টাটানগর। টাটা জীবিতকালে এই কারখানার নির্মাণকার্য শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার উত্তরাধিকারী দোরাব টাটা ও রতন টাটা কোটি কোটি মুদ্রা ব্যয় করিয়া ইহা সম্পন্ন করিয়াছেন। এই কারখানার প্রধান ম্যানেজার একজন আমেরিকান। শুনিয়াছি তাঁহার বেতন নাকি মাসিক আট হাজার টাকা। টাটার এই বিরাট কীর্তি, আজ ভারতের জাতীয় সম্পদে পরিণত হইয়াছে। আমরা কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলাম।

(২৭)

১৯২৫ সাল

এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ
মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান।—রবীন্দ্রনাথ

১৯২৫ সাল ভারতের পক্ষে একটি দুর্বৎসর। স্বাধীনতা-সংগ্রামের বীর সেনানী ভারতের অবিসংবাদিত নেতা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ তাঁহার প্রিয় দেশবাসীকে শোকসাগরে ভাসাইয়া অকালে মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। দেশের মুক্তিকামনায় অনবরত ছুটাছুটি, পুনঃ পুনঃ কারাবরণ, অনিয়ম ও অনাচারে তাঁহার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। নষ্ট স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য তিনি দার্জিলিং গিয়াছিলেন। সকলেই আশা করিয়াছিল কিছুদিন বিশ্রাম লইলেই তাঁহার হৃত স্বাস্থ্য ফিরিয়া আসিবে। আবার তিনি দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করিতে পারিবেন। কিন্তু দেশবাসীর সে আশা পূর্ণ হয় নাই। তিনি সকলকে কাঁদাইয়া অকস্মাৎ দার্জিলিং-এ পরলোকগমন করিলেন। সেদিন ছিল ১৯২৫ সালের ১৬ই জুন। বিদ্যুৎবেগে এই দুঃসংবাদ চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। স্তম্ভিত হতবুদ্ধি, কিংকর্তব্যবিমূঢ় দেশবাসী শোকে-দুঃখে হাহাকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। সমস্ত ভারতে দুঃখের ছায়া পতিত হইল। মৃত দেহ কলিকাতায় লইয়া গিয়া গঙ্গায় দাহ করার ব্যবস্থা করা হইল। পথে স্টেশনে স্টেশনে শোকসন্তপ্ত দর্শনার্থীর ভীড় জমিতে লাগিল। হিলি স্টেশনে ট্রেন পৌঁছিলে বিরাট জনতা ট্রেন থামাইয়া তাহাদের প্রিয় নেতাকে শেষ দেখা দেখিবার জন্য আকুল আবেদন জানাইল। সহস্র সহস্র হিন্দু-মুসলমানের কাতর অনুরোধ কর্তৃপক্ষ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া কফিন উন্মুক্ত করিলেন। জনসাধারণ মৃতদেহ দেখিয়া ক্রন্দনে ফাটিয়া পড়িল। আত্মীয়গণ বিয়োগ-বেদনা অনুরূপ শোক প্রকাশ করিতে লাগিল। প্রায় দুই ঘণ্টা পর বহু কষ্টে ভীড় সরাইয়া ট্রেনটি ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে লাগিল। চিত্তরঞ্জন দেশবাসীর কতখানি আপনজন ছিলেন শিক্ষিত, অশিক্ষিত গ্রামবাসীর শোকপ্রকাশের দৃশ্য দেখিয়া তাহা অনুমান করা গেল। বহু বিলম্বে ট্রেনখানা কলিকাতায় পৌঁছিলে, শোকে-দুঃখে উন্মত্ত জনসাধারণ শিয়ালদহ স্টেশনকে জনসমুদ্রে পরিণত করিল। সহস্র সহস্র নরনারী নগ্ন পদে শবযাত্রীদের সঙ্গে যোগ দিয়াছিল। যানবাহন সমস্ত বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। বহু কষ্টে ভীড় ঠেলিয়া রসা রোডের বাড়ীতে পৌঁছিতে সারা-

দিন সময় লাগিয়া গেল। কেওড়াতলা শ্মশানঘাটে তাঁহাকে দাহ করা হয়। গান্ধীজী সে দিন দেশবন্ধুর পরিবারবর্গের সহিত থাকিয়া তাহাদিগকে সান্ত্বনা দিতেছিলেন এবং প্রিয়বন্ধুর বিয়োগবেদনায় অশ্রুপাত করিতেছিলেন। দার্জিলিং-এ দেশবন্ধু তাঁহার অন্তিম সময় বুঝিতে পারিয়া নিজ বাড়ীটিও হাসপাতালের জন্য দান করিয়া যান। ৫০।৬০ হাজার টাকা তাঁহার মাসিক আয় ছিল। মৃত্যুর পর দেখা গেল আড়াই লক্ষ টাকায় জনৈক মহাজনের নিকট বাড়ীটি বন্ধক রহিয়াছে।

ব্যারিস্টারি ত্যাগ করিবার পর যখন তাঁহার বিপুল আয়ের পথ বন্ধ হইয়া গেল তখন তিনি ঋণ করিয়াও দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। লক্ষ লক্ষ মুদ্রা উপার্জনকারী বিখ্যাত ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন দাশ দেশের মুক্তিকামনায় সর্বস্ব দান করিয়া শেষে স্বয়ং আত্মাহুতি দিলেন। এ ত্যাগের তুলনা নাই। তাই বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন ঃ

এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ
মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান।

দেশবন্ধুর অন্তিম বাসনাকে রূপ দিতে হইবে। মহাত্মা গান্ধী ১০ লক্ষ টাকার জন্য আবেদন জানাইলেন। শুনিয়াছি একদিনেই নাকি বিপুল অর্থ সংগ্রহ হইয়াছিল। উদার হৃদয়ে মহাজন তাঁহার আড়াই লক্ষ টাকার ঋণপত্রখানি ছিঁড়িয়া মহাত্মাজীকে ফেরত দিয়াছিলেন।

কানপুর কংগ্রেস

এই বৎসর ডিসেম্বর মাসের শেষে কানপুরে জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশন বসিবে বলিয়া স্থির হইয়াছিল। ভারতের মহিয়সী বিদুষী মহিলা মিসেস্ সরোজিনী নাইডু সভানেত্রী নির্বাচিত হইয়াছেন। কানপুর শিল্পপ্রধান শহর। ডেলিগেটদের অবস্থানের জন্য শত শত তাঁবুর ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। পূর্বের ন্যায় বিভিন্ন প্রদেশের ডেলিগেটদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ব্লক চিহ্নিত করা হয়। আসাম, ব্রহ্ম, সিংহল দেশ হইতে ডেলিগেটগণ আসিয়াছিলেন। বেনারসের বাবু পুরুষোত্তম দাস টেণ্ডন ও বাবু ভগবান দাস অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি ও সেক্রেটারি নির্বাচিত হইয়াছিলেন। সভানেত্রী তাঁহার সুলিখিত অভিভাষণটি উর্দু ভাষায় পাঠ করিলেন, প্রথানুযায়ী উর্দু, ইংরাজী ও হিন্দু ভাষায় মুদ্রিত অভিভাষণ ডেলিগেটদের মধ্যে বিতরণ করা হইয়াছিল। অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির মেম্বরগণের আসন

বক্তৃতা মঞ্চের নিকটে ছিল। আমি অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির মেম্বার থাকায় বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দের মধ্যে বসিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। আমার পার্শ্বেই বেনারস হিন্দু ইউনিভারসিটির প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, তেজস্বী মুস্লিম জননেতা মৌলানা হসরৎ মহানী, রফি আহম্মদ কিদোয়াই ও আরও অনেকে বসিয়া ছিলেন। অপর পার্শ্বে আর্য্যসমাজের বৃদ্ধ নেতা স্বামী শ্রদ্ধানন্দ ছিলেন। এই সময় মৌলানা শওকত আলী তাঁহার বিরাট বপু লইয়া আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। বৃদ্ধ ক্ষীণকায় স্বামী শ্রদ্ধানন্দকে দেখিয়া তিনি হাসিয়া উঠিলেন—এ ভাই, হুঁসিয়ার হো যাও, রাস্তা সাফকর শওকত আলী আতা হায়। গির জায়গা তো তুম লোগ কো বহুৎ মুশিবৎ পয়দা হোগা। স্বামীজি ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—ভাই তুমভী হুঁসিয়ার হো যাও। এক দুবলা পাতলা বুড্ছা আদমী হ্যায়—ওছ পর খেয়াল রাখ। আমরা কয়েকজন একটু সরিয়া শওকত আলী সাহেবকে স্থান দিলাম। ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রেসিডেণ্ট ভিট্টল ভাই জাবের ভাই প্যাটেল (ভি. জে. প্যাটেল) নীরবে নীচে ডেলিগেটদের মধ্যে বসিয়া পড়িলেন। সভানেত্রী সরোজিনী নাইডুর ইহা চক্ষু এড়াইল না। তিনি বলিলেন—ওখানে কে বসিলেন? প্যাটেল সাহেব নহেন কি? মাথায় কাপড় দিয়া বসিলেও তাঁহার বিরাট দাড়ি প্রমাণ করিল তিনি প্যাটেল ছাড়া আর কেহ নহেন। আপনি ওখানে কেন বসিয়াছেন? এখানে আসুন। তিনি বলিলেন—সভার কার্য চলিতে থাকুক, আমি এখানে বেশ আছি। সভানেত্রী বলিলেন—দিল্লীতে ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনকালে আপনার সমস্ত পুলিশ অফিসার এমনকি স্বয়ং পুলিশ কমিশনার সভাস্থল ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এখানে আমার নেতৃত্বে এই সভার অধিবেশন চলিতেছে। সুতরাং আমার হুকুম আপনাকে তামিল করিতেই হইবে। অগত্যা প্যাটেল সাহেব উপরে আমাদের মধ্যে আসিয়া বসিলেন। কংগ্রেসের অধিবেশনে যেসব প্রস্তাব আলোচিত ও গৃহীত হয় তাহার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া সম্ভব নহে। প্রতিটি অধিবেশনের কার্য বিবরণীতে উহা লেখা থাকে।

এখানে হিন্দু-মুসলমান ডেলিগেটদের জন্য পৃথক পৃথক আহারের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। আমাদের নির্ধারিত ক্যাম্পে পাশাপাশি লাইন লইয়া বসিয়াছি। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, মৌলানা হসরৎ মহানী, আরও অনেকে বসিয়াছেন। মৌলানা শওকত আলী বোরখা-পরিহিতা বেগম মহম্মদ আলীকে সঙ্গে লইয়া আমাদের পার্শ্বে আসিয়া বসিলেন। পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু আমাদের সম্মুখ

দিয়া হিন্দু ক্যাম্পের দিকে যাইতেছিলেন মৌলানা শওকত আলি তাঁহাকে দেখিয়া হাক দিলেন—'এই পণ্ডিতজী ক্যাঁহা চলতে হো ? এধার আও। মেরে পাশ বাইঠো।' পণ্ডিতজী বলিলেন—ঠিক হ্যায় ভাইয়া বলিয়া হাসিতে হাসিতে আমাদের সঙ্গে আসিয়া বসিলেন। তাঁহার দেখাদেখি আরও অনেক হিন্দুনেতা তাঁহার অনুসরণ করিলেন। বেগম মহম্মদ আলী কৃষ্ণবর্ণ বোরখায় আবৃত ছিলেন। মৌলানা মহম্মদ আলী জেলে আবদ্ধ ছিলেন বলিয়া আসিতে পারেন নাই। পণ্ডিত নেহেরুর আদেশে পূর্ণ এক ধামা লুচি মৌলানা শওকত আলী সাহেবের সামনে রাখিয়া দেওয়া হইল। নেহেরুজী বলিলেন—লুচিগুলি শেষ না করিয়া তিনি উঠিতে পারিবেন না। শওকত আলী সাহেব বলিলেন—'ঠিক হ্যায়, তোম্ হামারা ভাই হো, ইসমে আধা তোমহারা হিস্সা ভী হ্যায়।' হাসাহাসি ও গল্পগুজবের মধ্য দিয়া ভোজনপর্ব শেষ হইল।

রাত্রে আহারের টেবিলে অনেকের সহিত বসিয়াছি। আমার ঠিক সম্মুখে সভানেত্রী সরোজিনী নাইডু আসিয়া বসিলেন। আমি সুযোগ পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—আপনি বাঙ্গালীর মেয়ে, আপনার দেশপ্রেম, প্রতিভা ও পাণ্ডিত্যে আমরা গৌরবান্বিত। আমাদের দুঃখ, আপনি মাতৃভাষা বাংলা বলিতে পারেন না। আপনার সহিত বাংলায় কথা বলিতে না পারিয়া আমরা তৃপ্তি পাই না। তিনি হাসিয়া বলিলেন—আমি এজন্য লজ্জিত। আপনারা হয়তো জানেন, আমার পিতামাতা বাঙালী হইলেও আমার জন্মস্থান হায়দ্রাবাদ, শিক্ষা ইংলণ্ডে। আমার স্বামী মাদ্রাজী, সুতরাং পিতৃভূমি বাংলার সহিত আমার কোন সম্বন্ধ ছিল না। তজ্জন্য আমার মাতৃভাষা আয়ত্ত করা সম্ভব হয় নাই। অবশ্য ইদানিং বাংলাদেশে আমি কয়েকবার গিয়াছি। বর্তমানে বাংলা ভাষা আয়ত্তেরও চেষ্টা করিতেছি। তখন হয়তো আপনাদের ক্ষোভের কারণ আর থাকিবে না। সরোজিনী নাইডু ঢাকা বিক্রমপুরনিবাসী অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা। তাঁহার পিতা হায়দ্রাবাদ নিজামের শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার জেনারেল ছিলেন। ইংরাজী ও উর্দ্দু ভাষায় তাঁহার অসাধারণ দক্ষতা ছিল।

ইংরাজী সাহিত্যে ইনি নামকরা কবি ছিলেন। কয়েকখানি ইংরাজী কাব্য-গ্রন্থও তিনি রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার সুললিত প্রাঞ্জল কবিত্বপূর্ণ ভাষা জনসাধারণকে মুগ্ধ করিত। পূর্বেই বলিয়াছি কানপুর শিল্পপ্রধান শহর। এখানে বহু কলকারখানা রহিয়াছে। সিপাহী বিদ্রোহের স্মৃতিচিহ্ন ব্যতীত এখানে অন্য কোন দ্রষ্টব্য জিনিস নাই। এই স্মৃতিচিহ্নটি ইংরেজ সরকার কর্তৃক কোম্পানী বাগানে স্থাপিত

হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ইহা সিপাহী বিদ্রোহ ছিল না। ইহা ছিল ভারতের স্বাধীনতা-কামী বীর সন্তানদের বিপ্লব। ভারতকে অধীনতার নাগপাশ হইতে উদ্ধার করিতে গিয়া অগণিত দেশপ্রেমিক সম্মুখ যুদ্ধে আত্মাহুতি দিয়াছেন। অকথ্য অত্যাচার ও নির্যাতনের মধ্য দিয়া ইংরেজ সরকার এই আন্দোলন দমন করেন। সরকারের জয় ঘোষণার জন্য এই স্মৃতিচিহ্নটি স্থাপিত হইয়াছিল। এখন উহা আছে কি না জানি না। স্বাধীন ভারতে এই স্মৃতিচিহ্নের অবস্থান লজ্জাকর। কলিকাতার হলওয়েল মনুমেণ্টের ন্যায় ইহার পরিণতি হওয়া আবশ্যক।

(২৯)

গৌহাটী কংগ্রেস

চিরাচরিত প্রথানুযায়ী ১৯২৬ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষে আসামের গৌহাটী নগরে জাতীয় মহাসভার অধিবেশন বসিবে স্থির হইয়াছে। মাদ্রাজ হাইকোর্টের বিখ্যাত আইনজীবী কংগ্রেসনেতা শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার এই মহাসভার সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন। হিলি হইতে আমরা পাঁচজন ডেলিগেট নির্বাচিত হইয়াছি। হিলির জমিদার রায় সাহেব কুমুদনাথ দাস, কামাখ্যা তীর্থদর্শনের নাম করিয়া আমাদের সহযাত্রী হইলেন। পার্বতীপুর জংসনে পৌঁছিয়া সংবাদ পাইলাম, আর্য-সমাজের নেতা স্বামী শ্রদ্ধানন্দকে আবদুর রসিদ নামক একজন মুসলমান যুবক রিভলভারের গুলিতে হত্যা করিয়াছে। আমরা এই দুঃসংবাদে আতঙ্কিত হইয়া উঠিলাম। তখন দেশশুদ্ধি আন্দোলনের ফলে হিন্দু-মুসলমানে বিরোধ চলিতেছিল। আর্যসমাজের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী দয়ানন্দের পর, স্বামী শ্রদ্ধানন্দ নেতা হইয়াছিলেন। আর্যসমাজীরা পশ্চিম ভারতের রাজপুত মুসলমান বলিয়া কথিত কতকগুলি দোমনা মুসলমানকে নানা প্রলোভন দিয়া শুদ্ধি করিয়া হিন্দুধর্মে ফিরাইয়া লইয়াছেন। এই হেতু আর্যসমাজীদের প্রতি মুসলমানদের তীব্র আক্রোশ বিদ্যমান ছিল।

কংগ্রেসের গৌহাটী অধিবেশনে এই মর্মান্তিক ব্যাপার লইয়া যে-কোন অনর্থের সৃষ্টি হইতে পারে বলিয়া আমরা আশঙ্কা করিতেছিলাম। গৌহাটী পৌঁছিয়া এই ব্যাপারে কর্তব্য নির্ধারণের জন্য মুসলিম নেতাগণ একত্রিত হইলেন। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, ডাঃ সৈয়দ মাহ্‌মুদ, মৌলানা শওকত আলী, প্রফেসার আবদুল বারী এবং আরও অনেকে একত্রিত হইয়া স্থির করিলেন যে, আততায়ী আবদুর রসিদের ঘৃণিত কার্যের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া মৌলানা শওকত আলী সভার প্রারম্ভেই

শোকপ্রস্তাব আনয়ন করিলেন। হিন্দু সমাজের অন্যতম নেতা, পণ্ডিত মদন-মোহন মালব্য এই অধিবেশনে যোগদান করিবেন না বলিয়া শুনিয়াছিলাম। কিন্তু অধিবেশনের দিনে দেখি মালব্যজী আসিয়া হাজির হইয়াছেন। আমরা শঙ্কিত হৃদয়ে সভায় যোগদান করিলাম। সার্ মহম্মদ সাদুল্লা আসামের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। আমার সহকর্মী বন্ধু আবদুল মতীন চৌধুরি অন্যতম মন্ত্রী ছিলেন। আমরা কয়েকজন পূর্বেই তাঁহাদের সহিত দেখা করিয়া অবস্থার গুরুত্ব তাঁহাদের বুঝাইয়াছিলাম। তাঁহারাও যে-কোন অবস্থা মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত থাকিবেন বলিয়া আশ্বাস দিয়াছিলেন। মহাসভার অধিবেশনের প্রথম দিকেই শওকত আলী সাহেবের পরিবর্তে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য শোকপ্রস্তাব উত্থাপন করিয়া অত্যন্ত তীব্র ভাষায় মুসলমান সমাজকে আক্রমণ করিয়া এক বক্তৃতা দিলেন। বক্তৃতায় হিন্দু ডেলিগেটদের ভিতরে ভীষণ উত্তেজনার সৃষ্টি হইল। অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া মহাত্মা গান্ধী শোকপ্রস্তাব সমর্থনের জন্য দাঁড়াইলেন। একটি উঁচু টুলের উপরে কম্বল বিছাইয়া তিনি বক্তৃতা দিতেন। বক্তৃতায় তিনি বলিলেন—আমার ভাই আবদুর রশীদ আমার অপর এক শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা স্বামী শ্রদ্ধানন্দকে হত্যা করিয়াছে। আমি ভ্রাতৃবিয়োগ-ব্যথা অনুভব করিতেছি। এ দুঃখের সান্ত্বনা নাই। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি, এই শোচনীয় হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী কে? শ্রদ্ধেয় পণ্ডিতজী গোটা মুসলমান সমাজকে দায়ী করিয়াছেন। আমি ইহার প্রতিবাদ করিতেছি। হত্যাকারী আবদুর রশীদ এই পৈশাচিক কার্যের জন্য ব্যক্তিগত ভাবে দায়ী। হয়তো কিছু সংখ্যক বিকৃতমনা ব্যক্তি তাঁহার পিছনে ছিল। কিন্তু এই কি সত্য নয় যে একদল উগ্র সঙ্কীর্ণমনা হিন্দু ও একদল সঙ্কীর্ণমনা মুসলমান দেশের মুক্তি-আন্দোলনে সহযোগিতা না করিয়া উগ্র সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি করিয়া মুক্তি-আন্দোলনে বাধা সৃষ্টি করিতেছে? আমরা যাঁহারা দেশের নেতৃত্বের দাবী করি, এই সঙ্কীর্ণ সর্বনাশা মনোভাবের বিরুদ্ধে কিছুই বলি নাই। ইহা প্রশমিত করার জন্য কোন চেষ্টাও করি নাই। আমি বিশ্বাস করি যদি আমরা হিন্দু মুসলমান নেতাগণ নিজ নিজ সমাজের এই সর্বনাশা মনোভাবকে দূর করার চেষ্টা করিতাম তাহা হইলে হয়তো আজ আমরা শ্রদ্ধানন্দকে হারাইতাম না। সুতরাং এ অপবাদ শুধু মুসলমান সমাজের উপর দেওয়া চলে না। আবদুর রশীদ ও তাঁহার মন্ত্রণাদাতারা গোটা মুসলমান সমাজ নহে। এই হিংসাত্মক মনোভাব উভয় সমাজের মধ্যে বিদ্যমান রহিয়াছে। এজন্য কি আমরা দায়ী নহি? আমি মনে করি আমি ও

পণ্ডিত মালব্যজী ও অন্যান্য হিন্দু-মুসলমান নেতাগণ, যাঁহারা এই দুষ্ট মনোভাবকে নষ্ট করিতে চেষ্টা করি নাই, তাঁহারা সকলেই দায়ী। মহাত্মাজীর মর্মস্পর্শী বক্তৃতায় দেখা গেল সভার মনোভাব অনেকখানি শান্ত হইয়া আসিয়াছে।

এইবার মৌলানা শওকত আলী প্রস্তাব সমর্থন করিতে উঠিয়া বলিলেন— স্বামী শ্রদ্ধানন্দের সহিত মতভেদ থাকিলেও তিনি আমার দীর্ঘদিনের সহকর্মী ও বন্ধু ছিলেন। তাঁহাকে পৈশাচিকভাবে হত্যা করিয়া আবদুর রশীদ আমাদের সমাজকে কলঙ্কিত করিয়াছেন। আমাদের ধর্মশাস্ত্রে এইরূপ কাপুরুষোচিত হত্যা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। আজ আমি এই সভায় আল্লাহ্‌র নাম লইয়া ঘোষণা করিতেছি আপনারা যদি কেহ শ্রদ্ধানন্দ হত্যার প্রতিশোধ লইতে চান আমি এই শওকত আলী বুক পাতিয়া দিতেছি। আপনারা আমাকে হত্যা করিয়া ইহার প্রতিশোধ গ্রহণ করুন। এই বলিয়া তিনি তাঁহার দুই বিশাল বাহু প্রসারিত করিয়া দিলেন। সভাস্থল তখন নীরব ও নিস্তব্ধ হইয়া গেল। সকলেই দাঁড়াইয়া শেষ প্রস্তাবটি গ্রহণ করিলেন। রাত্রে সাবজেক্ট কমিটির অধিবেশনে পণ্ডিত মাদনমোহন মালব্য একটি প্রস্তাবের উপরে বক্তৃতা করিতে যাইয়া দীর্ঘ সময় লইতেছিলেন, তাঁহার বক্তৃতায় অনেকেই বিরক্ত হইতেছিলেন। সভাপতি মহাশয়, বোধহয় পণ্ডিতজীর পদমর্যাদা ও ব্যক্তিত্বের জন্য তাঁহাকে কিছু বলিতে ইতস্ততঃ করিতেছিলেন। পার্শ্বে উপবিষ্ট মৌলানা মহম্মদ আলী সাহেবকে তিনি কি যেন ইঙ্গিত করিলেন। মহম্মদ আলী দাঁড়াইয়া পণ্ডিতজীর কতকগুলি অবান্তর বক্তৃতার উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে নিরস্ত করিবার জন্য সভাপতিকে অনুরোধ করিলেন। মালব্যজী তৎক্ষণাৎ বসিয়া পড়িলেন। জনৈক ইংরাজী অনভিজ্ঞ এক বিহারী ভদ্রলোক কিছু বুঝিতে না পারিয়া হিন্দী ভাষায় সভাপতিকে প্রশ্ন করিলেন। পণ্ডিতজী ও মৌলানা সাহেবের বক্তৃতা আমি কিছুই বুঝি নাই আমাকে বুঝাইয়া দেওয়া হউক। তিনি বার বার সভাপতিকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিতেছিলেন, কিন্তু সভাপতির দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হইল না। তখন বেনারসের প্রসিদ্ধ ধনকুবের বাবু সিউপ্রসাদ গুপ্ত সভাপতিকে লক্ষ্য করিয়া বিহারী ভদ্রলোকের বক্তব্যের প্রতি তাঁহার মনোযোগ আকর্ষণ করিলেন। এবার কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার ও সেক্রেটারি রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার দুই জনেই ছিলেন মাদ্রাজী। তাঁহারা তাঁহাদের মাতৃভাষা ও রাজভাষা ইংরাজী ব্যতীত ভারতীয় কোন ভাষার সহিত পরিচিত ছিলেন না। সভাপতি মহাশয় মাদ্রাজ হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট জেনারেল ছিলেন। তিনি দাঁড়াইয়া বলিলেন—লজ্জার সহিত স্বীকার করিতেছি,

বিহারী ভদ্রলোকের ভাষা আমি বুঝিতে পারি নাই। সুতরাং তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। ভদ্রলোকের বাক্যটি আমাকে ইংরাজীতে বুঝাইয়া বলিলে, আমি অবশ্যই তাহার জবাব দিব। আপনারা হয়তো মনে করিতেছেন যিনি এদেশের একটি প্রধান ভাষা বুঝিতে পারেন না, তেমন লোককে সভাপতি করা হইয়াছে কেন? কিন্তু এ ত্রুটি আমার নয়। এদেশে বহু অভিজ্ঞ পণ্ডিত ব্যক্তি বিদ্যমান থাকিতে, আমার ন্যায় অজ্ঞ ব্যক্তিকে সভাপতি করা আপনাদের উচিত হয় নাই। এজন্য দায়ী আপনারাই। সভার মধ্যে হাসির রোল পড়িয়া গেল। অবশেষে সভাপতির অনুমতি লইয়া গুপ্ত মহাশয় বিহারী ভদ্রলোককে হিন্দি ভাষায় সমস্ত বুঝাইয়া বলিয়া তাঁহাকে শান্ত করিলেন। যথাসময় গৌহাটির অধিবেশন শেষ হইল।

ব্রহ্মপুত্র নদীর তীরবর্তী গৌহাটি শহর আসাম প্রদেশের প্রধান নগর। স্থানীয় উদ্বাস্তু মুসলমানদের কতিপয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি আমাদের সহিত দেখা করিয়া বলিলেন—আমরা ময়মনসিংহ ও ঢাকা অঞ্চল হইতে প্রায় ১ লক্ষ মুসলমান আসামের বিভিন্ন স্থানে জঙ্গল কাটিয়া আবাদী জমি বাহির করিয়াছি এবং দুই-তিন পুরুষ যাবত বসবাস করিতেছি। কিন্তু আসাম সরকার এইসব জমিজমার উপরে আমাদের নিজস্ব স্বত্ব স্বীকার করিতেছেন না। এজন্য আমরা চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছি। আপনারা দেশের সম্মানিত নেতা দয়া করিয়া প্রধানমন্ত্রী সাদুল্লা সাহেবের সহিত দেখা করিয়া আমরা যাহাতে জমির উপরে কায়েমী স্বত্ব লাভ করিতে পারি তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিন। তাহাদের অনুরোধ অনুযায়ী মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, ডাক্তার সৈয়দ মাহমুদ, মওলানা মহাম্মদ আলী ও আসামের তৎকালীন জননায়ক মওলানা আবদুল হামীদ খান ভাসানী ও আরও কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তি সাদুল্লা সাহেবের বাড়ীতে গিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিলেন। মন্ত্রী জনাব আবদুল মতীন চৌধুরি, তথায় উপস্থিত ছিলেন। চৌধুরি সাহেব আমোদের সহকর্মী ও বিশিষ্ট বন্ধু। সাদুল্লা সাহেব সসম্মানে আমাদের অভ্যর্থনা জানাইয়া চা-নাস্তার বিপুল আয়োজন করিলেন।

আমাদের বক্তব্য বিষয় শুনিয়া তিনি বলিলেন—উদ্বাস্তু মুসলমানেরা আমার স্বজাতি। তাহাদের সুবিধার জন্য চেষ্টা করা আমার পক্ষে ফরজ, এই বিষয় লইয়া আমার বাড়ীতে আপনারা যে পদধূলি দিয়াছেন এইজন্য আমি কৃতার্থ। আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছি। আশা করি, সফলকাম হইতে পারিব; আমরা সংখ্যালঘু বিধায়

অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হইতেছি তবুও সাধ্যমত চেষ্টার ক্রটি করিব না। সাদুল্লা সাহেব কি করিয়াছিলেন জানি না। আমরা দেখিতেছি বর্তমান ভাগাভাগির পর যাহারা বনজঙ্গল কাটিয়া বন্য জন্তুর অত্যাচার সহ্য করিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছিল আজ তাহারা বিতাড়িত। অদৃষ্টের নির্মম পরিহাস ভিন্ন ইহা আর কি হইতে পারে?

কামরূপ কামাখ্যা

বহুদিন হইতে কাপরূপ কামাখ্যার কথা শুনিয়া আসিতেছি। এখানে নাকি মন্ত্রবলে মানুষকে ভেড়া বানাইয়া রাখা হইত। গৌহাটি শহরের অনতিদূরে ব্রহ্মপুত্র নদের উপরে এই কামাখ্যা শহর। পাহাড়ের চূড়ায় মন্দির অবস্থিত। আমরা চড়াই ভাঙিয়া উপরে উঠিতে লাগিলাম। রায় সাহেব কুমুদ বাবু স্থূলকায় মানুষ বলিয়া ১০ টাকা দিয়া ডাণ্ডি ভাড়া করিলেন, চারজন বাহকের সাহায্যে তিনি উপরে উঠিলেন। মন্দিরটি অনেক দিনের পুরাতন। অন্যান্য হিন্দু মন্দির হইতে ইহার গঠন ভিন্ন। দোচালা ঘরের মত কারুকার্যবিহীন প্রস্তরনির্মিত গৃহ।

কামাখ্যা পাহাড়ের উপরে বাড়ী-ঘর, বাজার, পোস্ট অফিস ও বহু পাণ্ডাঠাকুর বাস করেন। লোকবসতিও কম নয়, আমার হিন্দু সহযাত্রীরা মহাপীঠ দর্শনের জন্য মন্দির অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। মুসলমানদের প্রবেশ নিষিদ্ধ বলিয়া আমরা ছয় জন দরজায় দাঁড়াইয়া ভিতরে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলাম। অন্ধকারে বিশেষ কিছু দেখা গেল না। পুঞ্জীভূত অন্ধকার দূরীভূত করার জন্য বেদির নিকটে মিটমিট করিয়া ঘৃতপ্রদীপ জ্বলিতেছে। ক্ষীণ আলোরেখা মন্দির অভ্যন্তরে এক অজানা রহস্যের সৃষ্টি করিয়াছে। হিন্দুশাস্ত্রে বর্ণিত আছে পিতা দক্ষরাজ কর্তৃক পতিনিন্দায় আহত হইয়া অভিমানে সতী দেহত্যাগ করেন। শোক-সন্তপ্ত মহাদেব সতীর দেহ স্কন্ধে লইয়া তাণ্ডব নৃত্য করিতে করিতে সুদর্শনচক্রের দ্বারা দেহটি একান্ন খণ্ডে খণ্ডিত করেন। খণ্ডিত দেহ বিভিন্ন স্থানে পতিত হইয়া একান্নটি পীঠস্থানে পরিণত হয়। দেবীর স্ত্রী-অঙ্গ কামাখ্যায় পতিত হওয়ায় উহা মহাপীঠে পরিণত হইয়াছে। আষাঢ় মাসে অম্বুবাচীর সময় দেবীর রজঃস্বলা হয়। তখন বিরাট জনসমাগম হয়, স্ত্রী-অঙ্গের উপরে স্থাপিত তৈলসিন্দুরচর্চিত শিবলিঙ্গের অর্চনা হয়। সন্তানহীনা যুবতী মেয়েদের সন্তান কামনায় বীভৎস অনুষ্ঠানের কথা যাহা শুনিলাম, উহা লেখনীর সাহায্যে বর্ণনা করা সম্ভব নয়। কামাখ্যা পাহাড়ের পাদদেশ ধৌত করিয়া ব্রহ্মপুত্র নদ প্রবাহিত। অদূরে নদীর মধ্যস্থ একটি পাহাড়ের

উপরে উমানন্দ ভৈরব নামক শিবের মন্দির অবস্থিত। দেবদর্শনের জন্য নৌকা-যোগে মন্দিরে যাইতে হয়।

অপর একটি পাহাড়চূড়ায় মহাদেবের মন্দির ও একটি অতিথিশালা রহিয়াছে। এই অতিথিশালার বারান্দায় বসিয়া বহু নিম্নে ব্রহ্মপুত্রের প্রবহমান রজতশুভ্র জলধারা দেখিতেছি, ধীর-মন্থর গতিতে উহা বহিয়া চলিয়াছে। নৌকাগুলি মোচার খোলের মত ভাসিয়া বেড়াইতেছে। পর্বতগাত্রে ও নদীসৈকতে সবুজ বনানী অপূর্ব সৌন্দর্যের সৃষ্টি করিয়াছে। দক্ষিণ ভারতের ভিজিয়ানাগ্রামের কথা মনে পড়িল। তথায় এইরূপ প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিয়াছিলাম। আমরা মুগ্ধনেত্রে কিছুক্ষণ ধরিয়া এই মনোরম দৃশ্য দেখিলাম। প্রত্যাগমনকালে কতকগুলি কিশোর ও যুবতী মেয়ে আমাদের পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল। স্বল্পবাস-পরিহিতা নারী-সৈন্য কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া ভাবিতেছি ইহা আবার কি হইল? কামাখ্যায় আসিয়া আমরাও কি ভেড়া বনিয়া গেলাম নাকি? লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম পয়সা আদায়ের জন্য যাত্রীদিগকে ইহারা উত্যক্ত করিতেছে। সহযাত্রী রায় সাহেব জমিদার মানুষ। তিনি পূর্ব হইতেই রেজগি পয়সা সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন। অবস্থার গুরুত্ব বুঝিয়া তিনি উহা ছিটাইয়া দিলেন। মেয়েরা তখন তাহাকে ছাড়িয়া পয়সা কুড়াইতে ছুটিয়া গেল। তিনি তৎক্ষণাৎ ডাণ্ডিতে উঠিয়া পগার পার। বন্ধু প্রতাপ বাবু মহাজন-পন্থা অনুসরণ করিলেন, পয়সা ছুড়িয়া দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনিও নিষ্কৃতি পাইলেন।

এইবার আমার পালা। পুরাদস্তুর মুসলমান পোশাকে সজ্জিত থাকা সত্ত্বেও মেয়েরা আমাকে ঘিরিয়া ধরিল। বলিলাম—আমি মুসলমান, তীর্থযাত্রী নই। মন্দির দেখিতে আসিয়াছি। তাহারা আমার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া সরিয়া গেল। বসন্ত বাবু তাড়াতাড়ি পকেট হইতে গান্ধী টুপি বাহির করিয়া মাথায় দিয়া বলিলেন—আমিও মুসলমান। আমাকে দেখাইয়া বলিলেন—আমি এই মৌলভী সাহেবের শিষ্য। এই বলিয়া আমার পায়ে হাত দিয়া ছালাম করিলেন, মেয়েগুলি নিঃসন্দেহ হইল এবং আমাদিগকে ছাড়িয়া অন্য শিকারের দিকে ছুটিল। আমরা হাসিতে হাসিতে ফিরিয়া আসিলাম। ইতিপূর্বে আসামের জোড়হাট, নওগাঁ, তেজপুর প্রভৃতি শহরগুলি দেখিয়াছি, পাহাড়ের ধারে ধারে চা-বাগান। পাহাড়ী মেয়েগুলি মাথায় ঝুড়ি বাঁধিয়া চা-পাতা সংগ্রহ করিতেছে। কমলালেবুর বাগানে সুপক্ক কমলাগুলি অধোমুখে রূপের জৌলুষ ছড়াইয়া বাগানটি আলোকিত করিয়াছে। প্রতিটি শহরে

জুতা ও মনোহারী দোকান খুলিয়া ঢাকার মুসলমান ব্যবসায়ীরা জাঁকিয়া বসিয়াছেন। বাংলা-আসামের সর্বত্র এই ব্যবস্থা—ইহারা প্রায় একচেটিয়া করিয়া লইয়া বসিয়াছিলেন। পাকিস্তান হওয়ার পর আসাম হইতে ইহাদিগকে বিতাড়িত হইতে হইয়াছে। সেই বার প্রত্যাগমনকালে তেজপুর হইতে ব্রহ্মপুত্র নদ বাহিয়া ষ্টীমার যোগে গৌহাটি আসিয়াছিলাম। নদীপথে পাহাড়-পর্বত-বনজঙ্গল অতিক্রম করিয়া আসিতে যে মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করিয়াছি উহার কথা চিরকাল স্মরণ থাকিবে।

(৩১)

১৯২৭ সাল

ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতির বাৎসরিক অধিবেশন ডাক্তার আনসারীর নেতৃত্বে এবার মাদ্রাজে বসিয়াছিল। প্রজা আন্দোলন, মুসলিম লীগ, তবলীগ আন্দোলন ইত্যাদিতে ব্যাপৃত থাকায় এই অধিবেশনে আমি যোগদান করিতে পারি নাই। এবার কলিকাতায় টাউন হলে বিরাট জাঁকজমকের সহিত অল ইণ্ডিয়া মুসলিম লীগের বাৎসরিক অধিবেশন বসিয়াছিল। সার্ মহাম্মদ ইয়াকুব সভাপতি হইয়াছিলেন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি 'দি মুসলমান' সম্পাদক মৌলভী মুজিবর রহমান ও সেক্রেটারি ছিলেন মওলানা মহম্মদ আকরাম খাঁ। লীগের এই অধিবেশনে কংগ্রেসের মুসলমান নেতাগণও যোগদান করেন। কেন্দ্রীয় লীগের সেক্রেটারি ডাঃ সইফুদ্দীন কিচলু, মওলানা আবুল কালাম আজাদ, মওলানা মহম্মদ আলী, মিঃ জিন্নাহ্ সারা ভারতের বিশিষ্ট নেতাগণ উপস্থিত ছিলেন। বিশেষভাবে আমন্ত্রিত হইয়া কংগ্রেস-নেত্রী সরোজিনী নাইডু ও হোমরুল লীগ নেত্রী ডাঃ অ্যানি বেসান্ত যোগদান করেন।

মিসেস নাইডু ও ডাঃ বেসান্তের কথা পূর্বে বলিয়াছি। সভায় ইহারা মুসলিম লীগের দাবীদাওয়া সমর্থন করিয়া যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা দিয়াছিলেন। ইহাদের বক্তৃতার ফলে লীগের দাবীদাওয়ার গুরুত্ব বাড়িয়া গিয়াছিল। এই বৎসর কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ও প্রজা আন্দোলন লইয়া বহু সভাসমিতি আমরা করিয়াছি। নব্য তুরস্কের জন্মদাতা মোস্তফা কামালের দক্ষিণ হস্ত আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্না বিদুষী মহিলা খালেদা আদীব হানুম কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া সমাবর্তন উৎসবে বক্তৃতা দিয়াছিলেন। তাঁহার বয়স তখন যৌবনসীমা অতিক্রম করিয়াছে। সভায় এত জনসমাগম হইয়াছিল যে সিনেট হলে তিল ধারণের স্থান ছিল না। হলের প্রশস্ত বারান্দা ও কলেজ ষ্ট্রীট লোকারণ্য হইয়াছিল।

কংগ্রেসের সভা

তদানীন্তন দিনাজপুর জেলার নিতপুর, পোরসা অঞ্চলে কয়েকটি জনসভায় যোগদান করার জন্য কংগ্রেস-নেতা বাবু যোগেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী ও মৌলানা আবদুল্লাহিল বাকী ট্যাক্সি যোগে পোরসা রওনা হইলেন। তাঁহাদের নির্দেশমত আমি ও মৌলভী বসিরউদ্দীন খাঁ সাহেব রেল যোগে কাটিহার হইয়া মালদহ লাইনে সিংহাবাদ স্টেশনে পৌঁছাইলাম। কথা ছিল সিংহাবাদ স্টেশন হইতে সভাস্থলে পৌঁছাইবার জন্য হাতীর বন্দোবস্ত থাকিবে। কিন্তু ট্রেনের গোলোযোগে নির্দিষ্ট সময়ে পৌঁছাইতে না পারার জন্য হাতী ফেরত গিয়াছে। সন্ধ্যা সমাগত, স্টেশন প্রায় জনশূন্য। নিকটে হাটবাজার কিছুই নাই। বড় অসুবিধায় পড়িয়া গেলাম। স্টেশনমাস্টার আমাদিগকে বলিলেন—কিছু দূরে সিংহাবাদ জমিদারদের বাড়ী, আপনারা সেখানেই যান, কোন অসুবিধা হইবে না। অগত্যা প্রায় অর্ধ-মাইল পথ পদব্রজে অতিক্রম করিয়া জমিদার বাড়ীতে পৌঁছিলাম। জনৈক ভদ্রলোক সমস্ত শুনিয়া স্থানীয় এক মুসলমান মাতব্বরের বাড়ীতে আমাদিগকে পৌঁছাইয়া দিলেন। তাঁহারা আগ্রহ-সহকারে আমাদের আহারাদি ও রাত্রিবাসের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। এখান হইতে ছয় মাইল পথ অতিক্রম করিয়া নিতপুরে পৌঁছিতে হইবে। পর দিন সকালে চেষ্টা করিয়াও গরুর গাড়ী পাইলাম না। সুতরাং পদব্রজে রওনা হইতে হইল। বেলা প্রায় আটটার সময় একটি হিন্দুপল্লীতে পৌঁছাইলাম। আমার সঙ্গী মৌলভী বসির-উদ্দীন খাঁ সাহেব আমার পিতৃবন্ধু; নাটোরের নিকটে গোবিন্দপুর গ্রামে তাঁহার বাড়ী। তিনি একজন ঐ অঞ্চলের বিখ্যাত বক্তা ছিলেন। আমরা গ্রামে প্রবেশ করিয়া একটি বড় বাড়ীতে গেলাম। ইহারা জাতিতে গোয়ালা।

বাড়ীর মালিক আমাদিগকে দেখিয়া আমাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। আমার সঙ্গী মৌলভী সাহেব বলিলেন—বাপু, আমরা গান্ধী মহারাজার লোক, নিতপুর সভায় যাইব। আমাদের আহার হয় নাই। দৈ, ক্ষীর, মিষ্টি যাহা আছে জলদি আন এবং একটি গাড়ীর বন্দোবস্ত করিয়া দাও। গৃহস্বামী করজোড়ে দণ্ডবৎ করিয়া বসিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। দৈ-চিড়া-মুড়কি ও একবাটী ক্ষীর আমাদের সম্মুখে আনিয়া হাজির করিলেন। আমরা পরম পরিতৃপ্তির সহিত ভোজন করিলাম। গৃহস্বামীর নিজের গাড়ী ছিল, তৎক্ষণাৎ তাঁহার গাড়ীতে করিয়া আমাদের নিতপুর পৌছানোর ব্যবস্থা করিলেন। বিদায়ের সময় দুই হাত জোড় করিয়া বলিলেন—গান্ধী মহারাজার লোক, আপনারা দেবতা—হঠাৎ পদধূলি

দিয়াছেন, আপনাদের উপযুক্ত সেবা করিতে পারিলাম না, ক্ষমা করিবেন। আমরা আর কি বলিব, তাঁহাকে আশীর্বাদ জানাইয়া বিদায় লইলাম। গাড়ী ভাড়া কত দিতে হইবে জিজ্ঞাসা করায়, জিব কাটিয়া ছিঃ ছিঃ করিয়া উঠিলেন। বলিলেন—আপনাদের নিকট ভাড়া লইলে পাপ হইবে। শুধু আশীর্বাদ চাই। বুঝিলাম গান্ধী নামের মাহাত্ম্যেই আমাদের এই সৌভাগ্য। বেলা প্রায় বারটার সময় নিতপুর নদীর ঘাটে পেঁৗছাইলাম।

ঘাট মাঝি পারের কড়ি আদায় করার জন্য হাঁকডাক শুরু করিল, ধমক দিয়া বলিল—চুপকর গান্ধী মহারাজের লোক ওপারে সভায় যাইবেন। শীঘ্র পারের ব্যবস্থা কর। নৌকা তখন ছাড়িয়া দিয়াছে, মাঝি ব্যস্ত হইয়া হাঁকাহাকি করিয়া নৌকা ফিরাইয়া আনিল। যুক্তকরে প্রণাম করিয়া পয়সা চাওয়ার অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিল এবং আমাদের পারের ব্যবস্থা করিয়া দিল। নিতপুর বাজারে সভার আয়োজন করা হইয়াছিল। স্থানীয় ধনী ব্যবসায়ী রামটহল ভগতের পুত্র মুখলালপ্রসাদ অতি সমাদরে নিজ বাড়ীতে লইয়া গিয়া মধ্যাহ্ন ভোজের ব্যবস্থা করিলেন। লুচি, তরকারি ও সন্দেশের প্রচুর আয়োজন ছিল। মওলানা বাকী সাহেব ও যোগেন বাবু পূর্বেই পৌঁছিয়াছেন ও ডাক বাংলায় আছেন। বৈকালে সভা আরম্ভ হইল। বিপুল জনসমাগম হইয়াছিল। মওলানা বাকী সাহেব একটি দীর্ঘ বক্তৃতা করিলেন। অসাধারণ বক্তৃতাশক্তির অধিকারী মওলানা সাহেবের যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা শুনিয়া সভাস্থলেই প্রায় এক হাজার টাকা স্বরাজ্য ফণ্ডে চাঁদা আদায় হইল। আমরাও বক্তৃতা করিয়াছিলাম। রামটহল ভগত মহাশয় নিজেও এক হাজার টাকা দিলেন।

ভগতেরা বিহার প্রদেশের অধিবাসী। প্রথম জীবনে ইহারা এখানে সামান্য একটি মুদিখানার দোকান করেন। পরিশ্রম, সততা ও মিতব্যয়িতার ফলে আজ তিনি লক্ষপতি। অমিতব্যয়ী মুসলমানদের বহু ভূসম্পত্তি তিনি খরিদ করিয়াছেন। যখন তিনি রামটহল মুদি ছিলেন তখন তাঁহার পোশাক ও চালচলন যেমন ছিল আজ লক্ষপতি জমিদার হইয়া প্রাসাদতুল্য অট্টালিকায় বাস করিলেও তাঁহার চালচলন পূর্বের ন্যায় আছে। বাড়ীতে এত ধূমধাম ও বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির সমাগম—এসব কিছুই তাঁহাকে স্পর্শ করে নাই। তাঁহার পুত্রের উপর মেহমানদারির ভার দিয়া তিনি নিজের কাজ লইয়া আছেন। আধ-ময়লা ধুতি ও অপেক্ষাকৃত সাদা বিহারী ফতুয়া গায়ে দিয়া দালানের বারান্দার এক পার্শ্বে আমাদের সকলের সামনে বসিয়াই টাকুতে

পাট কাটিতেছেন। চিরকালের অভ্যাসের ফলে বৃদ্ধ বয়সেও তিনি কাজ করিয়া থাকেন। সঙ্কোচের কোন বালাই নাই। বাকসর্বস্ব বিলাসী বাবুদের ইহাকে দেখিয়া শিক্ষালাভ করা উচিত। নিতপুর হইতে পোর্শা জমিদার বাড়ী প্রায় এক মাইলের পথ। ইঁহারা তখন দিনাজপুর জেলার দক্ষিণ অঞ্চলের বিখ্যাত জমিদার।

বর্তমানে বহু শরিকে বিভক্ত হইয়াছে। হাজী ইব্রাহিম শাহ্ চৌধুরি তখন ইহাদের মধ্যে প্রধান ব্যক্তি ছিলেন। আমরা পরদিন তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করিলাম। যোগেন বাবু দিনাজপুরের সুবিখ্যাত উকিল ছিলেন। হাজী সাহেবের জমিদারী-সংক্রান্ত বড় বড় মামলায় যোগেন বাবুর সাহায্য লইতে হইত। মওলানা বাকী সাহেব দিনাজপুরের সর্বজনমান্য শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। তাঁহাদের প্রভাবে হাজী সাহেব স্বয়ং এক হাজার টাকা দিলেন, অন্যান্য শরিকদের নিকট হইতে আদায় হইল। পোর্শা হইতে যোগেন বাবু ও মওলানা সাহেব দিনাজপুরে ফিরিয়া গেলেন। আমরা ঐ অঞ্চলে আরও কয়েকটি সভা করিবার জন্য থাকিয়া গেলাম। পোর্শার পর ঘাটনগরের সভা হইল, প্রতি সভায় বিপুল জনসমাগম হইয়াছিল। মৌলভী বসিরউদ্দীন খাঁ সাহেব নিম্নলিখিত কবিতাটি সভায় পাঠ করিয়াছিলেন—

জান না শিয়ালকোটে গোরার লাথির চোটে
কালা নারীর অপমান
গোরার বিচার কি চমৎকার
পঞ্চাশ টাকায় পরিত্রাণ॥
জান না রাবণ রাজা কেমন সাজা
পেয়েছিল দোষে
পুড়ছিল সোনার লঙ্কা
এই কালা নারীর রোষে।
অহিংসা মন্ত্র তোমার তাই কর সার
সব সয়ে যাও বুকে
গোরা চাঁদের কীর্তি যত
দেখুক জগতবাসী চোখে।
ছিল এক গেঁজেল গদা আস্ত গাধা
তার বউ করে না ঘর

গদা বলে ওগো রাধা
আমি তোমার শ্যাম নটবর।
রাধা তো কয় না কথা মনের ব্যথা
মনেই রাখে চেপে
এ অপমান সয় না প্রাণে
তখন গদা গেল ক্ষেপে।
হাতে তার লম্বা লাঠি মাপের কাঠি
মান বুঝে সে নেবে
পিটিয়ে সটান করবে রাধায়
নতুবা নাক কেটে তার দেবে।
রাধা যে করবে না ঘর যমের দোসর
গেঁজেল স্বামী তার
সে যে খেতে দেয় না পরতে দেয় না
কেবল নাক ঝাঁকনি সার।
রাধা যায় বাপের বাড়ী তাড়াতাড়ি গদা গেল ঘরে
কাস্তে বটি হাতে নিয়ে তাড়ায়ে তারে ধরে
পাড়ার লোক সব জমিয়ে গেল হায় কি হল
রাধা বলে শোন ভাই
ইনি ভাত দিবার তো ভাতার নন
কিল মারবার গোঁসাই॥
তেমনি গোঁসাই গোরা মোদের
শুন ওগো ভাই
চল সরে পড়ি বাপের ঘরে
যদি নাক বাঁচাতে চাই।
গান্ধী রাজার কথা শুনে
চরকা ধর হাতে
মনের সুখে থাকবেরে ভাই
খাবে দুধে ভাতে।
আমার ভাল করব আমি

আমার গতর খেটে
আমার মাথা কাটিয়ে দিবে
অমনি বঁটির চোটে।
এমন বিচার কে দেখেছে
কে শুনেছ কজন
খাদির টুপী দেখলে গোরা
চমকে উঠে প্রাণে।
যেমন চমকে উঠে দুষ্ট গরু
লাল কাপড় দেখে
শিং নেড়ে আসে তেড়ে
আকাশে তাল ঠুকে।
মদ গাঁজা খেও না কেহ
যেও না ভাড়িখানা
ঐ কথাটি শুনলে পরে
গোরাচাঁদের হানা।
এমন কোর্‌আন পুরাণ পুড়ে' ফেল
ধর্মশাস্ত্র মিছে
পেনাল কোডের জয়জয়াকার
গোরোয় বিধান দিছে।
এমন গুরুদেব ঘরে এলে
মারিস টিকি ধরে' টান
মোল্লা সাহেব মসজিদে গেলে
টেনে ধরিস কান।
এখন মদ মাতালের পোয়া বারো
পাঁচ আইন নাই দেশে
গাঁজার কল্কি হাতে নিয়ে
দম মারে কষে।

কবিতাটি কাহার রচিত জানি না। মৌলভী সাহেব বক্তৃতামঞ্চে দাঁড়াইয়া এমন অঙ্গভঙ্গির সহিত উহা আবৃত্তি করিতেন যে লোকে হাস্য সংবরণ করিতে

পারিত না। আমরা পোর্শা হাজী সাহেবের বাড়ীতে আরও কয়েক দিন থাকিয়া এই অঞ্চলের কয়েকটি সভা করিয়াছিলাম। হাজী সাহেব আমাদের যথেষ্ট আদর যত্ন করিতেন। তিনি একজন স্বনামধন্য পুরুষ ছিলেন।

(৩২)

বালুরঘাট দুর্ভিক্ষ ঃ ১৯২৮ সাল

গত বৎসর অনাবৃষ্টির ফলে দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছিল। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু দুর্ভিক্ষপীড়িত অঞ্চলগুলি পরিদর্শন করার জন্য আসিয়াছিলেন। তিনি পত্নীতলা অঞ্চল পরিদর্শন করিয়া অনাহারক্লিষ্ট জনসাধারণের দুর্দশা স্বচক্ষে দেখিয়া যান। বালুরঘাটে নেতৃবৃন্দের সহিত পরামর্শ করিয়া তিনি একটি রিলিফ কমিটি গঠন করেন। কংগ্রেস রিলিফ কমিটি অর্থ সংগ্রহ করিয়া দুঃস্থ জনসাধারণের সাহায্য করিতেছিলেন কিন্তু ইহা পর্যাপ্ত ছিল না, অবস্থা ক্রমশঃ গুরুতর হইয়া পড়িল। প্রায় সহস্রাধিক লোক খাদ্যের দাবিতে বালুরঘাটের এস.ডি.ও. সাহেবের বাংলোর সম্মুখে 'হাঙ্গার স্ট্রাইক' করিল। এই সংবাদ শুনিয়া 'জনদরদী'-নেতা মওলানা আবদুল্লাহিল বাকী ও আমি বালুরঘাট পৌছিয়া আমরা এক অভাবনীয় দৃশ্যের সম্মুখীন হইলাম। উন্মুক্ত আকাশতলে খাদ্যের দাবীতে সহস্রাধিক লোক মৃতবৎ পড়িয়া আছে। স্ট্রাইকের তৃতীয় দিনে কেহ কেহ অজ্ঞান হইয়া পড়িতেছে। এস.ডি.ও. সাহেব প্রথমে ইহাদিগকে তাড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থকাম হইয়াছিল। মওলানা বাকী সাহেব দিনাজপুর জেলার কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ছিলেন। তাঁহার আগমন-সংবাদে স্থানীয় জননায়ক নলিনীকান্ত অধিকারী, সুরেশরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, মৌলভী সামসুদ্দীন আহমেদ, আমিরউদ্দীন চৌধুরি প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। কিংকর্তব্যবিমূঢ় এস.ডি ও. সাহেব আমাদিগকে আহ্বান করিয়া কর্তব্য নির্ধারণের জন্য পরামর্শ চাহিলেন। আমরা কমিশনার ও গভর্নরকে টেলিগ্রাম করিতে বলিলাম। ব্যাপকভাবে অর্থ সংগ্রহ করিয়া অবিলম্বে ইহাদিগকে সাহায্য করা কর্তব্য মনে করিলাম। কলিকাতায় গিয়া সংবাদপত্রে আন্দোলন ও তথাকার নেতৃবৃন্দের সহিত দেখা করিয়া যাহাতে মোটামুটি অর্থ সংগ্রহ করা যায় তাহার চেষ্টা করা উচিত মনে করিলাম। টেলিগ্রাম পাইয়া কমিশনার সাহেব দিনাজপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে সঙ্গে লইয়া বালুরঘাটে উপস্থিত হইলেন। তাহারা আমাদের সহিত আলোচনা করিয়া অবিলম্বে সরকার হইতে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি

দিলেন। আমরা অনশনকারী জনসাধারণকে সাহায্যের ব্যবস্থা করিব বলিয়া আশ্বাস দিয়া অনশনভঙ্গের জন্য অনুরোধ জানাইলাম। আমাদের অনুরোধে তাহারা অনশন ভঙ্গ করিতে সম্মত হইল। ডাক্তারের পরামর্শমত লেবুর রস শরবৎ ও সামান্য কিছু লঘু পথ্য দিয়া অনশন ভঙ্গ করা হইল, স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ তাহাদিগকে উত্তমরূপে আহার করাইয়া বিদায় দিলেন। সরকার হইতে পাঁচ লক্ষ টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা হইল। আমি, মওলানা বাকী সাহেব ও সামসুদ্দীন সাহেব ঐ রাত্রেই কলিকাতা রওনা হইলাম। কলিকাতায় পৌঁছিয়া মহম্মাদী পত্রিকার অফিসে মওলানা আকরম খাঁ সাহেবের সহিত দেখা করিলাম। কলিকাতার বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দের সহিত দেখা করিয়া আলোচনা করা স্থির হইল। 'দি মুসলমান' পত্রিকার সম্পাদক মৌলভী মুজিবর রহমান ও সুলতান পত্রিকার সম্পাদক মৌলানা মুনিরুজ্জামান ইস্‌লামাবাদী সাহেবের সহিত দেখা করিলাম। আমরা একত্রে চাঁদা সংগ্রহের জন্য বাহির হইব স্থির হইল এবং সংবাদপত্রেও আবেদন প্রকাশ করা হইবে। পরদিন মওলানা আক্রাম খাঁ ও মুজিবর রহমান সাহেবকে লইয়া সার্ আব্দুর রহিম সাহেবের বাড়ীতে গেলাম। সার্ আব্দুর রহিম স্বনামধন্য পুরুষ, তিনি মাদ্রাজ হাইকোর্টের জজ ছিলেন। অবসর গ্রহণের পর ভারতীয় ব্যবস্থাপকসভার সভাপতি নির্বাচিত হন। তখন তিনি বার্ধক্যের কোঠায় পৌঁছিয়াছেন। একটি হাত বাতব্যধিতে অবশ হইয়া গিয়াছিল। তিনি সমস্ত শুনিয়া কলুটোলা মার্চেন্ট এসোসিয়েশনের সেক্রেটারি হাজী আব্দুর রাজ্জাক, আব্দুর সাত্তার সাহেবকে টেলিফোন যোগে আমাদের আগমন ও উদ্দেশ্যের কথা জানাইলেন এবং তাঁহাদের এসোসিয়েশনের পক্ষ হইতে মোটামুটি অর্থ সংগ্রহের জন্য অনুরোধ করিলেন। সেক্রেটারি সাহেব পরদিন বেলা ৮টার সময় তাঁহার বাড়ীতে গিয়া দেখা করিতে বলিলেন। সার্ আব্দুর রহিম সাহেব শারীরিক অক্ষমতার জন্য কিছু করিতে পারিলেন না বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিলেন। অতঃপর আমরা সদলবলে ফুরফুরার পীর হজরত মওলানা আবুবকর সাহেবের খেদমতে হাজির হইলাম। কলিকাতার টিকিয়াটোলা তাঁহার বাসভবন-সংলগ্ন মস্‌জিদে আসরের নামাজ আদায় করিয়া কতিপয় মুরিদানসহ তিনি বসিয়াছিলেন। আমরা ছালাম দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি দাঁড়াইয়া আমাদের অভ্যর্থনা করিলেন। আমরা বালুরঘাট অঞ্চলের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের খবর দিয়া কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া দিতে তাঁহাকে অনুরোধ করিলাম। তিনি তৎক্ষণাৎ আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া ধর্মতলার প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী ওয়াসেল মোল্লা সাহেবের দোকানে উপস্থিত

হইলেন। লক্ষপতি ব্যবসায়ী মোল্লা সাহেব তাকিয়ায় ঠেস দিয়া গড়গড়ায় সুখটান দিতেছিলেন। আমরা দোকানে পৌঁছিবামাত্রই একজন কর্মচারী পীরসাহেবের আগমন সংবাদ তাঁহাকে জানাইলেন। মোল্লা সাহেব শুনিবামাত্রই ব্যস্ত হইয়া, 'হুঁকা সরাও', 'হুঁকা সরাও' বলিয়া তাঁহার খেদমতগারদের ডাকিতে লাগলেন। ইতিমধ্যে আমরা পৌঁছিয়া গিয়াছি। তিনি আমাদিগকে বসাইবার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। পীর সাহেব বলিলেন—আমাদের বসার জন্য তোমাকে ব্যস্ত হইতে হইবে না। আমরা বালুরঘাট দুর্ভিক্ষের জন্য কিছু চাঁদা চাই। মোল্লাজী বলিলেন—হুজুর, কত দিতে হইবে আদেশ করুন। আমরা আশা করিয়াছিলাম লক্ষপতি লোক অন্ততঃ হাজারখানেক টাকা তো পাওয়া যাইবে। কিন্তু আমরা নিরাশ হইলাম। পীর সাহেব বলিলেন—পঞ্চাশ টাকা দাও। তৎক্ষণাৎ তাঁহার আদেশ প্রতিপালিত হইল। আমরা হতবাক হইয়া পরস্পর মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিলাম। অতঃপর চাঁদনীচকের অন্যতম ব্যবসায়ী জয়নাল আবেদীন সাহেবের দোকানে গিয়া ঐ পঞ্চাশ টাকার দাবী তিনি করিলেন। আমরা আর কি করিব? অতঃপর তাঁহার ভক্ত মুরীদ গ্রাণ্ড স্ট্রীটের বকাউল্লা মল্লিককে সঙ্গে লইয়া নিউ মার্কেটে প্রবেশ করিলেন। এখানকার বাঙালী মুসলমান ব্যবসায়িগণ প্রায় সকলেই তাঁহার মুরীদ। তিনি তাঁহার ইচ্ছামত কাহারও নিকট দশ টাকা, কাহারও নিকট বিশ টাকা করিয়া আদায় করিতে লাগিলেন। এইরূপে প্রায় হাজার দেড়েক টাকা সংগৃহীত হইল। পীর সাহেবের বাড়ীর মসজিদে নামাজ পড়িয়া খিদিরপুর অঞ্চলে চাঁদা আদায়ের কথা তাঁহাকে বলিলাম। তিনি মওলানা রহুল আমীন সাহেবকে আমাদের সঙ্গে দিবেন বলিলেন। তখনি তাঁহাকে ডাকিয়া আনার আদেশ হইল, কলিকাতার পূর্বাঞ্চলে আইস ফ্যাক্টরী লেন-এ তখন তিনি থাকিতেন। আমি তাঁহার বাসায় গিয়া পীর সাহেবের আদেশ জানাইলাম। তিনি তখনই আমার সঙ্গেই চলিয়া আসিলেন। খিদিরপুরে চাঁদা আদায়ের তারিখ নির্ধারিত করা হইল। অতঃপর আমরা পীর সাহেবের নিকট বিদায় লইয়া রাত্রে বাসায় ফিরিলাম। পরদিন বেলা আটটার সময় স্যর্ আব্দুর রহিম সাহেবের কথামত কলুটোলা চুনাগলিতে হাজী আব্দুর রাজ্জাক ও আব্দুর সাত্তার সাহেবের সহিত দেখা করিলাম। তিনি আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া কলুটোলার বিখ্যাত গেঞ্জি ব্যবসায়ী জিয়নবক্স কোম্পানীর দোকানে উপস্থিত হইলেন। সেক্রেটারি সাহেব আমাদিগকে পরিচয় করিয়া দিয়া দোকানের মালিককে স্যর্ আব্দুর রহিম সাহেবের অনুরোধ জানাইলেন। আক্রাম খাঁ ও মুজিবর রহমান

সাহেব আমাদের সঙ্গে থাকায় অনেকটা সুবিধা হইয়াছিল। বণিক সমিতির সভাপতি জনৈক নওয়াব সাহেবকে ডাকিয়া পাঠান হইল। তিনি আসিলেন। সাদা পায়জামা, লম্বা কোর্তা, মাথায় দোপাল্লা সাদা টুপি পরিহিত, অশীতিপর এক বৃদ্ধ চাঁদার কথা শুনিয়াই চলিয়া গেলেন। 'মারগুল্লি মস্‌জিদ, মাদ্রাসা কা নাম লোক সব ধোকাবাজ, আপনা পেট কা লিয়ে তেজারতি শুরু কিয়া হ্যায়।' আমরা তো তাঁহার কথা শুনিয়া অবাক। মওলানা বাকী সাহেব রীতিমত চটিয়া গিয়াছেন, সেক্রেটারি সাহেব ব্যস্ত হইয়া বলিলেন—'নেহি নওয়াব সাহেব, ইস্ তরফ দেখিয়ে, মওলানা আকরাম খাঁ ও মৌলভী মুজিবর রহমান সাহেব ইনলোগ কা সাথ আয়ে হ্যায়। বালুরঘাট এলাকা মে বড় জোর কাহাত হুয়া হ্যায়। হাজারো আদমি ভুখা মরতা হ্যায়। সার্ আব্দুর রহিম সাহেব ভি ফোন কিয়া হ্যায়।' নওয়াব সাহেব এতক্ষণ আমাদের দিকে লক্ষ্য করেন নাই। তিনি আকরাম খাঁ ও মুজিবর রহমান সাহেবকে দেখিয়া বলিলেন—'ওহ্ আপ হ্যায় মওলানা আচ্ছালাম আলায় কুম। মেরা খেয়াল থা কই দোসরা আদমী হোগা।' মওলানা বাকী সাহেব বলিলেন—নওয়াব সাহেব, আমরা মস্‌জিদ মাদ্রাসার জন্য আসি নাই এবং চাঁদা আদায় আমাদের ব্যবসাও নয়। সংবাদপত্রে বালুরঘাট দুর্ভিক্ষের সংবাদ আপনারা দেখিয়া থাকিবেন।

কংগ্রেস হিন্দুরা সেখানে সাহায্য দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছেন। অথচ না খাইয়া মুসলমানরা মরিতেছে বেশী। লক্ষ লক্ষ মুসলমান আজ বিপন্ন। আমাদের কি কোন কর্তব্য নেই? আমরা নিজেরা কোন টাকা পয়সা চাই না। আপনারা মেহেরবানী করিয়া আমাদের সঙ্গে চলুন। সেখানকার অবস্থা দেখিয়া যদি সাহায্য করা উচিত মনে করেন আপনারা নিজেরাই গিয়া করিয়া আসুন। নওয়াব সাহেব বলিলেন—'ঠিক হ্যায় মওলানা, ম্যায় খোদ যাউঙ্গা।' আলোচনায় স্থির হইল পরের দিন দার্জিলিং মেলে নওয়াব সাহেব বালুরঘাট রওনা হইলেন। তখন আষাঢ় মাস। বর্ষাকাল, ঘোর মফঃস্বলে দুর্ভিক্ষপীড়িত অঞ্চলে নওয়াব সাহেবকে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করার জন্য মওলানা বাকী সাহেব, সামসুদ্দীন সাহেব ও আমি পূর্বেই বালুরঘাট চলিয়া আসিলাম। বর্ষাকালে পল্লী অঞ্চলে যাতায়াত অত্যন্ত কষ্টকর। ফার্সীপাড়ার বদান্য জমিদার জনাব মফিজউদ্দীন চৌধুরি সাহেবকে তাঁহার হাতীটি বালুরঘাট পাঠাইয়া দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হইল। হিলি হইতে বালুর-

ঘাট আঠার মাইল মোটরে যাইতে হয়। রাত্রে আড়াইটায় দার্জিলিং মেল হিলি পৌঁছাইবে। আমি নওয়াব সাহেবকে লওয়ার জন্য হিলি স্টেশনে উপস্থিত ছিলাম। যথা সময় ট্রেন পৌঁছিল। দেখিলাম একটি থার্ড ক্লাস কামরা হইতে নওয়াব সাহেব নামিয়া হাঁক দিলেন—বালুরঘাট কা কোই আদমী হ্যায়? সঙ্গে একটি চাকর ও বগলে একটি পোঁটলা। জি হ্যাঁ বলিয়া আমি তাঁহার নিকট হাজির হইলাম। নওয়াব সাহেবকে কলিকাতায় যে পোশাকে দেখিয়াছি তাহাই তাঁহার পরণে ছিল। তাঁহাকে লইয়া ট্যাক্সী যোগে বালুরঘাট রওনা হইলাম। উকিল আবদুর রউফ চৌধুরি সাহেবের বাসায় তাঁহার থাকিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। ঘরের ভিতরে বিছানা পাতা ছিল। কিন্তু নওয়াব সাহেব ভিতরে ঢুকিলেন না। বাইরের বারান্দায় একটি খালি চৌকির উপরে তাঁহার নিজের সুতি কম্বলটি পাতিয়া দিতে চাকরটিকে হুকুম করিলেন। আমি ঘরের ভিতরে বিছানার কথা তাঁহাকে বলিলাম। তিনি বলিলেন—'জরুরৎ নেহি।' কম্বলটি চৌকির উপরে ফেলিয়া কাপড়ের পোঁটলাটি মাথায় দিয়া তিনি শুইয়া পড়িলেন। তাঁহার ইঙ্গিতে সঙ্গের চাকরটির তাঁহার সাথে শুইয়া পড়িল। আমি আর কি করিব? শোয়া মাত্রই তাঁহার নাসিকা গর্জন শুরু হইল। তখন মাত্র ঘণ্টা দেড়েক রাত্রি ছিল। অদূরে সামসুদ্দীন সাহেবের বাসা। মাওলানা বাকী সাহেব সেখানেই ছিলেন। আমি তথায় দিয়া তাঁহাদিগকে নওয়াব সাহেবের আগমন-বার্তা জানাইলাম। রাত্রি ভোর হইয়া আসিল। নামাজের জন্য অজু করিতেছি, ইতিমধ্যে নওয়াব সাহেব আসিয়া হাঁক দিলেন—'সামসুদ্দীন সাহেব কা বাসা কাঁহা হ্যায়?' 'আইয়ে নওয়াব সাহেব' বলিয়া সাদর আহ্বান জানাইলাম। আমার ধারণা ছিল সারা রাত্রি জাগিয়া আসিয়া ছিলেন সুতরাং এই নাসিকা গর্জন বেলা আটটার পূর্বে আর শেষ হইবে না। কিন্তু আমার ভুল ভাঙ্গিয়া গেল। এই বৃদ্ধ বয়সে লোকটির কর্মতৎপরতা দেখিয়া বিস্ময় বোধ করিলাম। নামাজ পড়িয়া তিনি দুর্ভিক্ষপীড়িত অঞ্চলে পদব্রজে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইলেন। তখনও সূর্যোদয় হয় নাই, হাতীও আসিয়া পৌঁছায় নাই, কিন্তু তিনি হাতীর অপেক্ষা করিতে নারাজ। আমরা প্রমাদ গুনিলাম, বারো-চৌদ্দ মাইল দূরে যাইতে হইবে। পদব্রজে বর্ষার রাস্তায় মফঃস্বলে যাওয়া তাঁহাদের পক্ষে

সম্ভব নয়। আমরা হাতীর অপেক্ষায় কিছুক্ষণ তাঁহাকে আটকাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিলাম। স্থানীয় এস.ডি.ও. সাহেবের বাঙ্গলোয় তাঁহাকে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করিলাম। তিনি আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে একান্ত ইচ্ছুক। নওয়াব সাহেব উত্তেজিত হইয়া বলিলেন—হাম্ এস.ডি.ও. সাহেব কা নোকর নেহি। উঁহা জানেকা কই জরুরৎ নেহি হ্যায়। এস.ডি.ও. সাহেব মুসলমান হ্যায় ও বহুত আচ্ছা আদমি হ্যায়। খবর দেনেসে খোদ আপনা খেদমত মে হাজির হো যায়েগা। তিনি বলিলেন---মুসলমান হ্যায়? তব তো জানা চাহিয়ে, আচ্ছা চলিয়ে। ফারুক সাহেব তখন বালুর ঘাটের এস.ডি.ও.। তিনি ব্যক্তিগতভাবে ভাল লোক হইলেও তাঁহার পানদোষ অত্যন্ত প্রবল ছিল। দৈনিক মদ না হইলে তাঁহার চলিত না। আমরা পূর্বেই তাঁহাকে ঐ দিনটির জন্য প্রকৃতিস্থ থাকিয়া কলিকাতা হইতে আগত ভদ্রলোককে অভ্যর্থনা করার জন্য বলিয়াছিলাম। সামসুদ্দীন সাহেবের বাসা ও এস.ডি.ও. সাহেবের বাঙ্গলোর দূরত্ব প্রায় অর্ধ-মাইল। তখন ট্যাক্সি আনিতে লোক পাঠান হইল। কিন্তু তিনি ট্যাক্সির অপেক্ষা না করিয়া পদব্রজে রওনা হইলেন। আমরাও সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম। মওলানা সাহেবের কষ্ট হইতে লাগিল কিন্তু উপায় কি। যথা সময়ে এস.ডি.ও. সাহেবের বাঙ্গলোয় পৌঁছিলাম। এস.ডি.ও. সাহেব তাঁহার অনভ্যস্ত পায়জামা ও পাঞ্জাবী পরিয়া মাথায় টুপি দিয়া খাঁটি মুসলমান বেশে অভ্যর্থনার জন্য দাঁড়াইয়া আছেন। অভ্যর্থনা করিয়া সকলকে চা-নাস্তার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। ইতিমধ্যেই হাতী আসিয়া উপস্থিত হইল। মওলানা সাহেব, সামসুদ্দীন সাহেব হস্তিপৃষ্ঠে নওয়াব সাহেবকে লইয়া দুর্গত এলাকায় যাত্রা করিলেন। আমি তাঁহাদের নিকট বিদায় লইয়া ঐদিনই কলিকাতায় চলিয়া আসিলাম। পরদিন খিদিরপুর যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু হঠাৎ বালুরঘাটে যাওয়ায় দিন পরিবর্তন করিতে হইল। মওলানা রুহুল আমিন সাহেবকে সমস্ত কথা বলিলাম। পরদিন নওয়াব সাহেব, মওলানা সাহেব ও সামসুদ্দীন সাহেব কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। আমরা পুনরায় 'জিয়নবক্স' কোম্পানীর দোকানে মিলিত হইলাম। নওয়াব সাহেব দুর্ভিক্ষ পীড়িত এলাকার করুণ কাহিনী বর্ণনা করিলেন। বলিলেন—'ভাইও রুপিয়া নিকালো। কেয়া দেখ্‌কে আয়া হুঁ। সব ভূখা মরতে হ্যায়। রুপিয়া দো। মালিক জিজ্ঞাসা করিলেন—কত টাকা দিতে হইবে নওয়াব সাহেব? উত্তরে তিনি বলিলেন---আপাততঃ হাজার টাকা দাও। মালিক একটি কথা না বলিয়া তখনি টাকা বাহির করিয়া দিলেন। কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণ দুইশত টাকা দিলেন।

অতঃপর 'ইব্রাহিম ব্রাদার্স'-এর দোকান ও আরও কয়েকটি দোকান হইতে হাজার টাকা করিয়া লইলেন। আমরা আমড়াতলা আদমজীর আফিসে গেলাম, ম্যানেজার সাহেব দাঁড়াইয়া স্বাগত জানাইলেন। নওয়াব সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন—তোমহারা মালিক কাঁহা হ্যায়? ম্যানেজার উত্তরে বলিলেন—তিনি রেঙ্গুনে আছেন। নওয়াব সাহেব বলিলেন—তব তো তোমসে নেহি হোগা। বালুরঘাট কাহাত কে লিয়ে, আদমজীসে দশ হাজার রুপিয়া লেনা হোগা। তোম আদমজীকে পাস মৎ ভেজো। আমরা দেখিলাম ইহার সঙ্গে ঘুরিয়া অনর্থক সময় নষ্ট করা কোন অর্থ হয় না। আমরা বিদায় লইয়া বাসায় ফিরিলাম। পরদিন মওলানা রুহুল আমিন সাহেবকে সঙ্গে লইয়া সদলবলে খিদিরপুর গিয়াছিলাম। মওলানা আক্রাম খাঁ, মওলানা মুজিবর রহমান ও মওলানা রুহুল আমিন প্রভৃতির সমবেত চেষ্টায় প্রায় সহস্রাধিক টাকা ঐ অঞ্চলে পাওয়া গিয়াছিল। আলীপুর, পার্ক সার্কাস, নারিকেলডাঙ্গা প্রভৃতি স্থান হইতেও চাঁদা সংগ্রহ করি। এইরূপে প্রায় আট হাজার টাকা সংগৃহীত হয়। মওলানা আবুল কালাম আজাদ সাহেব তখন কলিকাতার বাহিরে ছিলেন। তাঁহার আগমন-সংবাদ পাইয়া আমরা সদলবলে তাঁহার বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের বাড়ীতে গিয়া হাজির হইলাম। সংবাদ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। সামসুদ্দীন সাহেব ছাড়া আমরা সকলেই তাঁহার সুপরিচিত। তাঁহাকে বালুরঘাট দুর্ভিক্ষের কথা বলা হইল। তিনি তাঁহার কয়েকজন প্রধান মুরিদের নামে পত্র দিয়া পরদিন বেলা নয়টার সময় দেখা করিতে বলিলেন। পত্রগুলি বিলি করার ভার আমার উপরে পড়িল। কলিকাতা হাওড়া ব্রিজের সম্মুখে ফলের দোকানের মালিকগণ আজাদ সাহেবের মুরিদ। হাজী ফকির মোহাম্মদ ও আর কয়েকজনের নামে পত্রগুলি ছিল। আমি ঐদিনই মালিকগণের নিকট পত্রগুলি পৌঁছাইয়া দিয়াছিলাম। পরদিন বেলা নয়টার সময় আজাদ সাহেবের বাড়ীতে হাজির হইলাম। তাঁহার মুরিদগণও আসিলেন। দেখিলাম পূর্বকালের নওয়াব বাদশাহ্‌দের দরবারে কুর্নিশ করার ভঙ্গিতে তাঁহারা আগাইয়া আসিলেন। আজাদ সাহেব তাঁহাদিগকে বসিতে বলিয়া বালুরঘাটের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের কথা বলিলেন। আমাদিগকে দেখাইয়া বলিলেন—ইহারা আমার পরিচিত বন্ধু লোক। তোমাদের উচিত সাধ্যমত দুঃস্থ ব্যক্তিদের সাহায্য করা। তোমাদের মধ্যে কেউ সেখানে গিয়া স্বচক্ষে অবস্থা দেখিয়া আইস ও মোটামুটি সাহায্য দানের ব্যবস্থা কর। তাঁহারা রাজী হইয়া বিদায় লইলেন। দেখিলাম কুর্নিশ করিতে করিতে পশ্চাদপসরণ করিয়া

বাহির হইয়া গেলেন। আমাদের সংগৃহীত চাঁদা মৌলভী মুজিবর রহমান সাহেবের নিকট জমা থাকিত। তাঁর সততার খ্যাতি সারাদেশে সুবিদিত ছিল। কলুটোলা অঞ্চলে নওয়াব সাহেব প্রায় ষাট হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়া স্বয়ং বালুরঘাট অঞ্চলে বিতরণ করিয়া আসেন। মওলানা আজাদ সাহেবের মুরিদগণ প্রায় বিশ হাজার টাকা দিয়াছিলেন। আমরা যাহা সংগ্রহ করিয়াছিলাম, তাহার পরিমাণ প্রায় আট হাজার টাকা। এই টাকাগুলি বালুরঘাট রিলিফ কমিটির মারফত বিতরণ করা হয়। এস.ডি.ও. সাহেব যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। সরকার হইতে যথেষ্ট সাহায্য ও ঋণ বাবদ পাঁচ লক্ষ টাকা দেওয়া হইয়াছিল। এস.ডি.ও. সাহেব ইহার কিছুদিন পরেই মারা গিয়াছেন। অতিরিক্ত মদ্যপানের জন্য তাঁহার ফুসফুস নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। মদে কত লোকের যে সর্বনাশ করিয়াছে, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? কলুটোলার নওয়াব সাহেব দ্বিতীয় বার আসিয়া আরও কিছু টাকা দিয়া গিয়াছিলেন। ইনি যুক্তপ্রদেশের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোক। একজন বড় ব্যবসায়ী হইয়াও তিনি আড়ম্বরহীন সাধারণ জীবন যাপন করিতেন। এই বৃদ্ধ বয়সে তাঁর জনসেবার উৎসাহ অনুকরণযোগ্য।

(৩৩)

১৯২৮ সালের ৩১শে ডিসেম্বর, কলিকাতায় জাতীয় মহাসমিতির বাৎসরিক অধিবেশন বসিয়াছিল। পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু সভাপতি নিযুক্ত হন। বিপুল আড়ম্বরে সভাপতিকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করা হয়। ১৬ ঘোড়ার সুসজ্জিত গাড়ীতে পণ্ডিতজী উপবিষ্ট ছিলেন। মিলিটারী পোশাকে সজ্জিত সহস্রাধিক স্বেচ্ছাসেবক অশ্বারোহণে ও পদব্রজে মার্চ করিয়া সভাপতির অগ্র-পশ্চাৎ চলিতেছিলেন। প্রিয়-দর্শন সুভাষচন্দ্র বসু জি.ও.সি. বেশে সজ্জিত হইয়া জাতীয় পতাকা হস্তে শোভা-যাত্রা পরিচালনা করিতেছিলেন। দেখিয়া মনে হইল, স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রপতির রাজকীয় শোভাযাত্রা বিপুল মর্যাদায় পরিচালিত হইতেছে। এই অধিবেশনে এত বেশী জনসমাগম হয় যে ১০ টাকা মূল্যের দর্শক টিকিট লক্ষাধিক বিক্রয় হইয়া যায়। বিভিন্ন প্রদেশের নেতৃবৃন্দ প্রায় সকলে যোগদান করিয়াছিলেন। বাঙালী মুসলিম নেতাগণ মৌলানা মনিরুজ্জমান ইসলামাবাদী, মৌঃ আকরাম খাঁ, মৌঃ মুজিবর রহমান, কবি ইস্‌মাইল হোসেন সিরাজী, কবি কাজী নজরুল ইস্‌লাম, মৌঃ আবদুল্লাহিল বাকী প্রমুখ বহু মুসলমান নেতৃবৃন্দ এই অধিবেশনে যোগদান করেন। পার্ক সার্কাস অঞ্চলে সভার অধিবেশন হইয়াছিল। তিন দিন পরে এই অধিবেশন শেষ হয়।

মুসলীম লীগের কথা

আর্যসমাজের নেতা স্বামী শ্রদ্ধানন্দ কংগ্রেসে যোগদান করিয়া যথেষ্ট ত্যাগ স্বীকার করেন। তিনি মুসলমানদেরও শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছিলেন। দিল্লীর ঐতিহাসিক মসজিদের বেদির উপরে দণ্ডায়মান হইয়া বক্তৃতা দেওয়ার অধিকার তাঁহাকে দেওয়া হইয়াছিল। তিনি সরকার কর্তৃক গ্রেফতার হইয়া লাহোর জেলে আবদ্ধ থাকেন। কারাগারে কিছুদিন অবস্থানের পর জনৈক উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মচারী জেলে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। পরে দেখা গেল কারাদণ্ডের মেয়াদ শেষ না হইতেই জেল হইতে তিনি মুক্তি পাইয়াছেন। জেল হইতে বাহির হইয়া তিনি কংগ্রেস ত্যাগ করিয়া 'শুদ্ধি'-আন্দোলন শুরু করিলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন—এদেশের অধিকাংশ মুসলমান হিন্দুদের বংশধর। তাহারা প্রলোভনে পড়িয়া মুসলমান হইয়াছিল। তাহাদিগকে মন্ত্রপাঠে শুদ্ধ করিয়া পুনরায় হিন্দু করিয়া লইতে হইবে। পশ্চিম ভারতে বিপুল উদ্যমে এই আন্দোলন চলিতে লাগিল। কতকগুলি দুর্বলচেতা মুসলমানদিগকে প্রলোভিত করিয়া তাহাদিগকে হিন্দুধর্মে দীক্ষা দিলেন। তিনি বই, পুস্তকে, প্রকাশ্য সভাসমিতিতে মুসলমান ধর্মের কুৎসা প্রচার করিতে লাগিলেন। আর্যসমাজীদের কার্যকলাপে মুসলমান সমাজ ক্ষেপিয়া গেল। 'শুদ্ধি'-আন্দোলনের প্রতিবাদ স্বরূপ পাঞ্জাবের জননায়ক ডাঃ সাইফ্‌উদ্দীন কিচ্‌লু ও সৈয়দ গোলাম ভিক-নারাং তবলিগ আন্দোলন আরম্ভ করিলেন। আর্যসমাজের অন্যতম নেতা রাজপাল রাঙ্গলা-রসুল নামে হজরতের কুৎসাপূর্ণ এক পুস্তক প্রচার করিলেন। মুসলমান সমাজ আরও ক্ষেপিয়া গেল। জনৈক মুসলমান যুবক রাজপালকে হত্যা করিয়া ফাঁসিকাষ্ঠে প্রাণ দিলেন। স্বামী শ্রদ্ধানন্দের হত্যার কারণও ইহাই। হিন্দুমহাসভাও নীরব ছিলেন না। তাঁহারাও মুসলমান সমাজের প্রতি আক্রমণ চালাইতে লাগিলেন। ভারতের আবহাওয়া বিষাক্ত হইয়া উঠিল। হিন্দুদের সহিত মিলিয়া মিশিয়া স্বাধীনতা-আন্দোলন পরিচালনা করা তখন আমাদের পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিল। এদিকে মুসলিম লীগ অন্তর্দ্বন্দ্বে জর্জরিত। কেন্দ্রীয় লীগ তখন দ্বিধা বিভক্ত। সার্ সেকান্দার হায়াৎ খাঁন এক দলের নেতা ও সার্ মোহম্মদ শফি অন্য দলের কর্ণধার। বাঙ্গলায় মুস্‌লিম লীগের আন্দোলন বলিতে কিছুই নাই। লীগকে শক্তিশালী করার জন্য কলিকাতা ক্যামাক স্ট্রীটে ইস্পাহানী সাহেবের বাড়ীতে এক সভায় আমরা মিলিত হইলাম। কলিকাতার বিশিষ্ট মুসলিম নেতাগণ প্রায় সকলেই তথায় উপস্থিত ছিলেন। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অবসরপ্রাপ্ত স্কুল ইন্সপেক্টর মৌলভী আবদুল করিম

সাহেবকে সভাপতি ও মৌলভী মুজিবর রহমান সাহেবকে সেক্রেটারি নিযুক্ত করিয়া নূতন মুসলীম লীগ গঠন করা হইল। লীগ-কর্মিগণ উৎসাহ ও উদ্যম লইয়া কার্য আরম্ভ করিলেন। জেলা শহরগুলিতে ও মফঃস্বলে লীগের শাখা অফিস স্থাপিত হইল। হিন্দুমহাসভা ও আর্যসমাজীদের কার্যকলাপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও মুসলমান সমাজের স্বার্থ রক্ষার জন্য সর্বত্র সভাসমিতি হইতে লাগিল। উত্তর বঙ্গের হিলিতে তবলীগ আন্দোলন পরিচালনার জন্য একটি বিরাট জনসভা আহ্বান করা হইল। সভাপতি মনোনীত হইলেন জনাব মৌলানা মুনিরুজ্জমান ইসলামাবাদী সাহেব। মৌলানা আবদুল্লাহিল বাকী, মৌলানা মনিরুদ্দীন আনোয়ারী ও আরও বিশিষ্ট জন-নায়কগণ এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। ইস্‌লাম মিশন নামক একটি প্রতিষ্ঠান এই সভায় গঠিত হয়। বগুড়া জেলার মৌলভী বশিরউদ্দীন সাহেবকে মিশনের প্রধান প্রচারক নিযুক্ত করা হইল। বিধর্মীদের আক্রমণের প্রতিবাদে কতকগুলি বিজ্ঞাপন ও পুস্তিকা প্রচার করা হইল।

কলিকাতা প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি সাম্প্রদায়িক বিষয় আলোচনার জন্য একটি সভা আহ্বান করিলেন। নেতৃস্থানীয় হিন্দু-মুসলমান এই সভায় যোগদান করেন। বহু আলোচনার পর স্থির হইল বিদেশী সরকারের প্রবঞ্চনায় দেশের এই শোচনীয় পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে। ইংরেজ সরকার হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে তিক্ততার সৃষ্টি করিয়া স্বাধীনতা-সংগ্রামকে বানচাল করিয়া দিতে চান। আমাদের উদ্দেশ্য ইংরেজ সরকারকে তাড়াইয়া দিয়া স্বাধীন ভারতের প্রতিষ্ঠা করা। যাহাই কিছু হোক ইংরেজের কারসাজিতে সংকল্পচ্যুত হইলে চলিবে না। আমরা পূর্ণ উদ্যমে স্বাধীনতা-আন্দোলন চালাইয়া যাইব।

(৩৪)

১৯২৯ সাল : এলাহাবাদ বৈঠক

১৯২৯ সালের জুলাই মাসে অল-ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন এলাহাবাদে হইবে। নোটিশ পাইয়া কলিকাতায় পৌঁছিলাম। কলিকাতা হইতে বিভিন্ন জেলার সমাগত মেম্বারগণ সহ এলাহাবাদ যাত্রা করিলাম। এলাহাবাদের খ্যাতনামা ব্যারিস্টার ও জননায়ক জনাব তসাদ্দেক আহমদ সেরুয়ানী অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি ছিলেন। আমরা তাঁহারই আতিথ্য গ্রহণ করিলাম। কমিটির মূল সভাপতি ছিলেন পণ্ডিত

মতিলাল নেহেরু। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, মৌলানা হাস্‌রত মহানী, রফি আহম্মদ কিদওয়ায়ী, ডাঃ সৈয়দ মহম্মদ প্রমুখ বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। কংগ্রেসের আগামী লাহোর অধিবেশনের কার্যাবলী লইয়া আলোচনা হয়। নেহেরু পরিবারের প্রায় সকলেই এই অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। এলাহাবাদ শহরেই পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর বিখ্যাত বাসস্থান 'আনন্দ ভবন' অবস্থিত। অল-ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির সদর দফ্‌তর এইখানে।

এলাহাবাদ যুক্ত প্রদেশের রাজধানী ও ঐতিহাসিক শহর। গঙ্গা ও যমুনা নদীর সঙ্গমস্থলেই ইহা অবস্থিত। এইখানেই সম্রাট আকবরের নির্মিত লাল কেল্লা। বর্তমানে যমুনা একটু দূরে সরিয়া গিয়াছে। গঙ্গা এখনও দুর্গপ্রাকার ধৌত করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। দিল্লী ও আগ্রা দুর্গের অনুরূপ এই দুর্গটিও সুদৃঢ় লাল প্রস্তরে নির্মিত। হিন্দুতীর্থ অক্ষয়বট কেল্লার ভিতরে ভূগর্ভে অবস্থিত। দুর্গ-প্রাকারের বাহিরে একটি সুড়ঙ্গ পথ দিয়া যাত্রিগণ উহা দেখিতে যান। একটি পুরাতন বটবৃক্ষের গুঁড়িতে সব সময় দুই-চারিটি করিয়া সবুজ পাতা দেখিতে পাওয়া যায়। মাটির নীচে অন্ধকারে আলোকের সাহায্য পুণ্যকামী হিন্দু নরনারীরা ইহা দর্শন করিয়া থাকেন। আমরা মুসলমান বলিয়া প্রবেশের অনুমতি পাই নাই। এই অক্ষয়বট সম্বন্ধে বহুদিন পূর্বে 'ভারতী' মাসিক পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ পড়িয়াছি। 'ভারতী'-সম্পাদিকা কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠা ভগিনী স্বর্ণকুমারী দেবী স্বচক্ষে দেখিয়া এই প্রবন্ধটি লিখিয়াছেন। তিনি বলেন—পাতাল পুরীতে মৃদু আলোকের সাহায্যে এই অক্ষয়বট দেখিলাম। একটি বটবৃক্ষের পুরাতন গুঁড়িতে কয়েকটি নূতন ডাল ও পাতা রহিয়াছে। আমার মনে হইল পাণ্ডাগণ সুকৌশলে গুঁড়ির সঙ্গে লাগাইয়া দিয়া পঞ্চমুখে তীর্থ মাহাত্ম্য কীর্তন করে ও সরল তীর্থযাত্রী-দিগকে ভুলাইয়া পয়সা আদায় করিয়া থাকে। আমার কথা নহে, স্বর্ণকুমারী দেবীর উক্তি। এই দুর্গটি দেখিবার সুযোগ আমাদের হয় নাই। আমরা কয়েক বন্ধু মিলিয়া গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমস্থল দেখিতে চারি আনায় একটি নৌকা ভাড়া লইলাম। অপরূপ দৃশ্য। গঙ্গার ঘোলা জলের সহিত যমুনার কালো জল মিশিয়া দুইটি অভিন্ন হৃদয়-সখীর মত ধীর ও মন্থর গতিতে বহিয়া চলিয়াছে। ইহাই ত্রিবেণী সঙ্গম। গঙ্গা-যমুনা ও সরস্বতী নদীর সঙ্গমস্থল বলিয়া ত্রিবেণী নামে খ্যাত হইয়াছে। কিন্তু সরস্বতী নদী এখন আর নাই। উহা বহুদিন হইল লুপ্ত হইয়াছে।

দ্বাদশ বৎসর পর পর এখানে 'কুম্ভ' মেলার অধিবেশন হয়। ভারতের বিভিন্ন দেশ হইতে আগত সাধু-সন্ন্যাসীগণের এবং লক্ষ লক্ষ লোকের সমাগমে বিরাট মেলা বসিয়া থাকে। খস্রুবাগ এখানকার প্রসিদ্ধ দ্রষ্টব্য স্থান। বহুদূর প্রাচীরবেষ্টিত বাগান। এই সুদৃশ্য বাগানটির মধ্যে পাশাপাশি দুইটি সমাধি সৌধ রহিয়াছে। এই দুইটি নাকি শূন্য কবর। কাহাকেও সমাধিস্থ করা হয় নাই। বিভিন্ন রঙের বহু গোলাপ ফুল ফুটিয়া বাগানটিকে আলোকিত করিয়াছে। গোলাপ গাছের এইরূপ বিপুল সংগ্রহ আর কোথাও দেখি নাই। এখানকার মেয়ে কলেজটি দেখিলে চক্ষু জুড়ায়। এমন সুন্দর কারুকার্যখচিত কলেজ ভবন আর কোথাও দেখি নাই। কমিটির অধিবেশন দুইদিন চলিয়াছিল। সেরুয়ানী সাহেব শেষ দিনে একটি ভোজসভায় আমাদিগকে আপ্যায়িত করেন। শহরের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকেও আমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। প্রসিদ্ধ ব্যারিস্টার স্যার তেজবাহাদুর সাপ্রু, পাইয়নিয়ার-পত্রিকার সুবিখ্যাত সম্পাদক সি. ওয়াই চিন্তামনির নাম উল্লেখযোগ্য। নেহেরু পরিবারের পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু, তাঁহার সহধর্মিণী স্বরূপরাণী নেহেরু, পুত্র জহরলাল ও পুত্রবধূ কমলা ও জহরলালের কন্যা ইন্দিরা উপস্থিত ছিলেন। নেহেরু পরিবারের সৌন্দর্যের খ্যাতি সুবিদিত। আনন্দ ভবন প্রাসাদ অন্যতম দর্শনীয়। এলাহাবাদের পেয়ারা সুবিখ্যাত। শহরের উপকণ্ঠে অসংখ্য পেয়ারার বাগান দেখিলাম। শত শত ঝুড়ি পেয়ারা এখান হইতে কলিকাতা ও ভারতের বিভিন্ন স্থানে রপ্তানি হয়।

লাহোর কংগ্রেস

পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুর সভাপতিত্বে ঐতিহাসিক লাহোর নগরে ১৯২৯ সালের ২৯শে ডিসেম্বর জাতীয় মহাসভার অধিবেশন হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। আমরা দিনাজপুর হইতে ১৫।১৬ জন ডেলিগেট লাহোরের পথে কলিকাতা পৌঁছিলাম। বিভিন্ন জেলা হইতে আগত ডেলিগেটগণ আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। যথাসময়ে আমরা লাহোর পৌঁছিলাম। শহরের উপকণ্ঠে ইরাবতী নদীর তীরে এক শিশু বাগানে আমাদের অবস্থানের জন্য অসংখ্য তাঁবু খাটান হইয়াছিল। বগুড়া ও দিনাজপুরের ডেলিগেট-গণ পাশাপাশি কয়েকটি তাঁবু দখল করিলাম। আমি ও পার্বতীপুরের মৌলভী আবদুর রহমান সৈয়দী সাহেব এক তাঁবুতে দুটি পাশাপাশি খাটিয়ায় আশ্রয় লইলাম লাহোরে ভীষণ শীতের জন্য লেপ তোশক শীতবস্ত্র সঙ্গে লইয়াছিলাম। রাতে আহারাদির পর শয়ন করিলাম। কিছুক্ষণ পরেই বুঝিলাম লেপ তোশক কম্বলে

অগ্রাহ্য করিয়া শীত প্রবলবেগে আমাদিগকে আক্রমণ করিয়াছে। তখন দুইজন এক খাটিয়ায় ডবল বিছানা করিয়া রাত্রি অতিবাহিত করিলাম। পরদিন তাঁবুতে আগুনের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। প্রথানুযায়ী বিভিন্ন প্রদেশের প্রতিনিধি এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ হইতে আগত দর্শক ও সাংবাদিকগণ যোগদান করিয়াছিলেন। বিরাট আড়ম্বরে শোভাযাত্রা করিয়া সভাপতিকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করা হয়। এই সম্মেলনে আসন্ন গোলটেবিল বৈঠক বর্জন ও লবণ আইন ভঙ্গ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবীতে এই সভায় প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল। কংগ্রেস ওযার্কিং কমিটির মেম্বর নির্বাচনকালে বিরুদ্ধ দলের প্ররোচনায় সুভাষচন্দ্র বসুকে বাদ দেওয়া হইলে সভায় তুমুল হট্টগোলের স্থষ্টি হয়। আমরা সুভাষচন্দ্র বসুর অনুগামীরা সুভাষচন্দ্র বসু সহ 'ওয়াক আউট' করিয়া বাহিরে চলিয়া আসি। Film Company র মালিক গণ্যমান্য ব্যক্তিরা যাহাতে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে বাহির হন তাহার জন্য আমাদিগকে অনুরোধ করেন। ক্যামেরার সাহায্যে 'Walk out'-এর Film প্রস্তুতের জন্য এই অনুরোধ। একদিন রাত্রে বিষয়-নির্বাচনী সভার বৈঠক চলিতেছিল। সভাপতি জহরলাল নেহেরুর পার্শ্বে মহাত্মা গান্ধী উপবিষ্ট ছিলেন। নেতাগণকে দর্শনের জন্য অসংখ্য লোক প্রবেশ-গেটের সম্মুখে দণ্ডায়মান ছিল। কমিটির মেম্বর ব্যতীত সভাস্থলে প্রবেশাধিকার ছিল না। ডেলিগেটগণেরও নহে। বিষয়-নির্বাচনী সভা রাত্রি ২।৩টা পর্যন্ত চলিত। গান্ধীজী প্রস্রাব করার জন্য অনতিদূরে প্রস্রাব খানায় ঢুকিলেন। কয়েকজন ভলেন্টিয়ার বাহিরে দাঁড়াইয়াছিল। কেমন করিয়া জানি না বাহিরের দর্শন-আকাঙ্ক্ষী জনতা উহা টের পাইয়া 'মহাত্মাজী কি জয়' বলিয়া তাঁহাকে দর্শনের জন্য প্রস্রাবখানা ঘিরিয়া ফেলিল। অবস্থা এমন হইল যে, তাঁহাকে প্রস্রাবখানা হইতে সভাস্থলে আনয়ন এক দুঃসাধ্য ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইল। একজন বুদ্ধিমান স্বেচ্ছাসেবক কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবক সহ সভাস্থলের বিপরীত দিকে মহাত্মাজী কি জয় বলিয়া চিৎকার দিয়া উঠিলেন। চিৎকারের সঙ্গে সঙ্গে জনতা বিপরীত মুখে ছুটিল। এই সুযোগে মহাত্মাজীকে আবার সভাস্থলে আনয়ন করা হইল। ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী ও লবণ আইন ভঙ্গ করার প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর সরকারী মহলে এক ভীষণ উদ্বেগের স্থষ্টি হইল। কমিটির মেম্বরগণকে লাহোরে গ্রেপ্তার করা হইবে বলিয়া কানাঘুষা চলিতে লাগিল। কিন্তু সেসব কিছু হইল না। মহাসভার অধিবেশন শেষ হইল। এখানকার দর্শনীয় স্থানগুলি দেখিবার জন্য আরও দুই দিন আমরা তথায় রহিয়া গেলাম।

(৩৫)

লাহোরের দ্রষ্টব্য স্থান

লাহোর পাঞ্জাবের তৎকালীন রাজধানী ও জনবহুল শহর। মোঘল বাদশাহ্‌দের বহু কীর্তি এখানে বিদ্যমান। দিল্লীর বিখ্যাত জামে মস্‌জিদের পর এখানকার শাহী মস্‌জিদের প্রসিদ্ধি আছে। সুন্দর কারুকার্যখচিত বিশাল মস্‌জিদটি অতীত মুস্‌লিম গৌরবের নিদর্শনস্বরূপ দণ্ডায়মান রহিয়াছে। সিঁড়ির পার্শ্বে শিখরাজ রণজিত সিংহের :সমাধি। পাকিস্তানের স্বপ্নদ্রষ্টা কবি সার্‌ ইক্‌বাল অপর পার্শ্বে চিরনিদ্রায় শায়িত। ইরাবতী নদীর অপর পারে সম্রাট জাহাঙ্গীরের সমাধি। আমরা নদীর পুল অতিক্রম করিয়া সমাধি ভবনে পৌঁছিলাম। রাজকীয় আড়ম্বরে প্রাসাদোপম অট্টালিকা। দুইটি সুউচ্চ মিনার এবং একটি পুষ্প উদ্যান। সমাধি-ভবনে সান্ধ্য বায়ু সেবন করিতে বহু জনসমাগম হয়। গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের পার্শ্ব দিন রেল-লাইন চলিয়া গিয়াছে। রাস্তার অপর পার্শ্বে সম্রাট মহিষী নূরজাহানের কবর। সম্রাটের সমাধিটি যেরূপ জাঁকজমক ও আড়ম্বরের সহিত রহিয়াছে এখানে তাহার অভাব দেখিলাম। সাধারণ একটি সমাধি সৌধ। চারিদিকে 'বেলা' ঘাসের জঙ্গল। সমাধি সৌধের প্রাঙ্গণের ইটগুলি খসিয়া পড়িতেছে। সুন্দরী-শ্রেষ্ঠা সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের অন্তিম শয্যার দৈন্য দশা দেখিয়া বেদনা বোধ করিলাম। ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম বেগমের স্বরচিত কবিতাটি দেয়ালে খোদিত রহিয়াছে—

"বর মাজারে মা গরীবাঁ
ন চেরাগে না গুলে
না পারে পরওয়ানা সায়েদ
না সদায়ে বুলবুলে।"

"গরীব গোরে দ্বীপ জেলনা
ফুল দিও না কেউ ভুলে,
শ্যামা পোকার না পুড়ে পাখ
দাগা না পায় বুলবুলে।"

বিনয়ের পরাকাষ্ঠা আর কি। যে সম্রাজ্ঞীর অংগুলি হেলনে সমগ্র ভারত কম্পিত হইত, যাঁহার অসাধারণ প্রজ্ঞা ভারতে বিস্ময়ের সৃষ্টি করিয়াছিল, স্বামীর নামে

যিনি দোর্দণ্ড প্রতাপে ভারত শাসন করিয়াছিলেন, তাঁহার এই দীন সমাধিভবনটি দেখিলে কাহার না দুঃখ হয়। পাকিস্তান হওয়ার পর সমাধি ভবনটি নূতন করিয়া সংস্কার করা হইয়াছে বলিয়া শুনিয়াছি।

আমরা জিয়ারৎ করিয়া বিদায় লইলাম। লাহোরের অন্যতম দর্শনীয় শালীমারবাগ, শহর হইতে খানিকটা দূরে অবস্থিত। এই মনোরম উদ্যান বাটীকার সৌন্দর্য বর্ণনা করা সহজ নয়। কৃত্রিম জলপ্রপাত, ফোয়ারা ও বহুবিধ ফুলগাছ বাগানের শোভা বর্ধন করিতেছে। পুরাতন বড় বড় বৃক্ষগুলি শ্রেণীবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। বৈকালের দিকে বিভিন্ন শ্রেণীর সমাগত নরনারী ও বালক-বালিকার আনন্দ-কোলাহলে স্থানটি মুখরিত হইয়া উঠে। এখানকার 'ইসলামীয়া কলেজ ভবন' মুসলিম স্থাপত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। আনারকলির বিখ্যাত মাজারের একটি উপাখ্যান আছে। যুবক 'সেলিম' (জাহাঙ্গীর) একটি সাধারণ ঘরের সুন্দরী মেয়েকে বিবাহ করিতে উদ্যত হওয়ায় সম্রাট আকবর উহা জানিতে পারিয়া অত্যন্ত কুপিত হন। তিনি নাকি মেয়ে আনারকলিকে জীবন্ত সমাহিত করার আদেশ দেন। জাহাঙ্গীর পরে সম্রাট হইয়া প্রিয়তমার সমাধির উপরে একটি সৌধ নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

ডাঃ সাইফুদ্দীন কিচলু জাতীয় মহাসভার অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি ছিলেন একথা পূর্বেই বলিয়াছি। সভার অধিবেশন শেষ হইলে তিনি আমাদিগকে বিদায় দাওয়াৎ দিয়া আপ্যায়িত করিয়াছিলেন। বহু ডেলিগেট চলিয়া গেলেও প্রায় সহস্রাধিক প্রতিনিধিকে তিনি ভূরিভোজে পরিতৃপ্ত করেন। পরিবেশকদের মধ্যে মেয়েদের সংখ্যা অধিক ছিল। সুন্দরী সুসজ্জিতা মেয়েদের নিপুণ হস্তের পরিবেশন আমাদের আনন্দ দিয়াছিল। পরিবেশনকারিণী মেয়েদের 'বব' চুল ও স্নো-পাউডার-চর্চিত ও রক্তরাগরঞ্জিত ওষ্ঠাধার দেখিয়া মনে হইল দেশের পুরুষদের অপেক্ষা নারীরা অধিক সংখ্যক পাশ্চাত্য প্রভাবে প্রভাবান্বিতা হইয়াছেন। পাঞ্জাবী মুসলমানেরা হিন্দুদের বহু পূর্ব হইতেই স্বাধীনতা-আন্দোলন পরিচালনা করিতেছিলেন। পরবর্তী কালে কংগ্রেসের সহিত হিন্দু, মুসলমান ও শিখ সকলে যোগদান করেন। বিপ্লবী দল গুলির মধ্যে গার্দার পার্টি প্রধান ছিল। হরদয়াল সিংহ এবং কর্তার সিংহ ইহাদের নেতা ছিলেন। সৈন্যদের মধ্যে ইংরেজবিদ্বেষ প্রচার ও গোপনে অস্ত্রবিপ্লবের পরিকল্পনা তাঁহারা করিয়াছিলেন। পরে ধরা পড়িয়া সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যায়।

স্বাধীনতা-সংগ্রামে হিন্দু শিখ নেতাগণের সঙ্গে মুসলমান নেতাগণ সমভাবে অগ্রসর হইয়াছিলেন। ডাঃ সাইফুদ্দীন কিচলু, ডাঃ মোহাম্মদ আলম, মৌলানা আতাউল্লা সাহেব বোখারী, মৌলনা আবদুল কাদের কসুরী, "জমিদার"-পত্রিকার খ্যাতনামা সম্পাদক মৌলানা জাফর আলী খাঁ প্রমুখ জননেতাগণ যে ত্যাগ ও সাধনার মধ্য দিয়া স্বাধীনতা-সংগ্রামকে জয়যুক্ত করিয়া গিয়াছেন উহার তুলনা বিরল।

অমৃতসর

লাহোর হইতে পূর্ব দিকে ২৪।২৫ মাইল দূরে অমৃতসর নগর। আমরা কয়েকজন বন্ধুবান্ধব মটর বাস যোগে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরিয়া অমৃতসর পৌঁছিলাম। সম্রাট শের সাহের তৈয়ারী প্রশস্ত পিচ-দেওয়া রাস্তা। এখানকার শিখদিগের স্বর্ণ মন্দির বিখ্যাত। শহরে পৌঁছিয়া প্রথমেই মন্দির দেখিতে গেলাম। একটি বৃহৎ পুষ্করিণীর মধ্যস্থলে মন্দিরটি অবস্থিত। মন্দির কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অনুযায়ী জুতা মোজা খুলিয়া পা ধুইয়া লইলাম। সুন্দর একটি সেতুর উপর দিয়া মন্দিরে পৌঁছিতে হইল। মন্দির চূড়াটি স্বর্ণমণ্ডিত। সেতু এবং মন্দিরের পার্শ্বে অবস্থিত স্তম্ভগুলির শীর্ষদেশ সোনার পাত দিয়া মোড়ানো। মন্দিরের অভ্যন্তরে উচ্চ বেদীর উপরে মূল্যবান বস্ত্রাবৃত শিখ ধর্মগ্রন্থ 'গ্রন্থ সাহেব' রক্ষিত। ধূপ, ধুনা ও পুষ্পযোগে গুরুমুখী ভাষায় উচ্চারিত মন্ত্র পাঠ করিয়া গ্রন্থ সাহেবের পূজা হইতেছে। শিখেরা একেশ্বরবাদী বলিয়া শুনিয়াছিলাম। কিন্তু মন্দিরে দেখিলাম 'গ্রন্থ সাহেবই' ঈশ্বরের স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। মন্দিরটি বড় নহে। একত্রে ৫০।৬০ জন লোক বসিতে পারে। চতুর্দিকে জলবেষ্টিত ছবির ন্যায় মন্দিরটির পবিত্রতা আমাদিগকে মুগ্ধ করিল। জাতিধর্মনির্বিশেষে সকলেরই প্রবেশাধিকার আছে। অতঃপর আমরা স্বাধীনতা-আন্দোলনের পীঠস্থান জালিওয়ানওয়ালাবাগ দেখিতে গেলাম।

জালিয়ানওয়ালাবাগ

এইখানকার পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডের বিবরণ পূর্বে কিছু লিখিয়াছি তিন দিকে অট্টালিকা ও প্রাচীরবেষ্টিত এই স্থান। ইহা প্রকৃত বাগান নহে কয়েকটি বড় বড় গাছ ও একটি ইঁদারা ব্যতীত এখানে আর কিছু নাই হত্যাকাণ্ডের ছয় বছর পর আমরা এই অভিশপ্ত বাগান দেখিতেছি

বালক-বৃদ্ধ-স্ত্রী-পুরুষের করুণ আর্তনাদ আজও যেন বাগানের চতুর্দিকে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। আমরা ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তথা হইতে বিদায় লইলাম। অতঃপর আমরা কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলাম। শুনিলাম ম্যাডান থিয়েটারে লাহোরে আমাদের 'ওয়াক আউট' Filmটি দেখান হইতেছে। কৌতূহলের বশবর্তী হইয়া উহা দেখিতে গেলাম। সর্বাগ্রে সুভাষ বাবুর পশ্চাতে আমরা শ্রেণীবদ্ধভাবে চলিয়াছি। বন্ধু জালালউদ্দীন হাসেমী ক্র্যাচের সাহায্যে এক পা লইয়া অগ্রসর হইতেছেন। আমরা বেশ আনন্দ অনুভব করিলাম।

(৩৬)

১৯৩০ গোলটেবিল বৈঠক

এই সালে দেশের সর্বত্র ভীষণ ধর পাকড় আরম্ভ হয়। অধিকাংশ নেতাগণ কারাগারে আবদ্ধ হন। সাইমন কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী ভারতবাসীর সহিত একটা মীমাংসার উদ্দেশ্যে বিলাতে 'প্রথম গোলটেবিল বৈঠক' আহুত হইল। কংগ্রেস এই বৈঠক বর্জন করিলেন কিন্তু মৌলানা মোহাম্মদ আলী দেশের ও জাতীয় কল্যাণ কামনায় অসুস্থ শরীর লইয়াও এই বৈঠকে যোগদান করেন। হিন্দুমহাসভা, মুস্লিম লীগ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ সরকার কর্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া বৈঠকে উপাস্থিত হন। লীগ নেতাদের মধ্যে মহামান্য আগা খাঁ, মহম্মদ আলী জিন্নাহ্, এ. কে. ফজলুল হক, সার্ আবদুল হালিম গজনভী, সার্ মহম্মদ শফি ও আরও অনেকে এই বৈঠকে যোগদান করেন। প্রায় ৩ মাস ধরিয়া এই বৈঠক চলিয়াছিল। খানাপিনা, আদর অভ্যর্থনা প্রচুর হইয়াছিল। লীগদলের নেতা ছিলেন আগা খাঁন। স্বয়ং সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ নেতাদের সঙ্গে করমর্দন করিয়া সকলকেই আপ্যায়িত করেন। মিঃ জিন্নাহ্ মুসলমান জনমত তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ যুক্তি-তর্কের দ্বারা পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করিয়াছিলেন। মৌলানা মহম্মদ আলী অত্যধিক পরিশ্রমে, দীর্ঘ কারাভোগ ও নির্যাতনে ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া পড়িয়াছিলেন। বোম্বাই বন্দরে ষ্ট্রেচারে করিয়া তাঁহাকে জাহাজে তুলিতে হইয়াছিল। দেশের মুক্তি-কামনায় দৃঢ় আশা বুকে লইয়া এই রোগজীর্ণ দেহে তিনি বিলাত গিয়াছিলেন। তাঁহার দীর্ঘ বক্তৃতার শেষের দিকে উদাত্তস্বরে তিনি বলিয়াছিলেন—তোমরা যদি ভারতকে স্বাধীনতা দান না কর তাহা হইলে বিদেশেই আমার কবরের জন্য স্থান নির্ধারণ করিও। এই অসুস্থ শরীর লইয়া রিক্ত হস্তে আর আমি গোলামের দেশে

ফিরিয়া যাইব না। এই স্বধর্মনিষ্ঠ ত্যাগের জলন্ত প্রতিমূর্তি পুরুষসিংহ মোহম্মদ আলীর ভবিষ্যৎ বাণী সত্য হইয়াছিল। সারা দুনিয়ার কোটী কোটী লোককে কাঁদাইয়া তিনি লণ্ডনেই ইন্তেকাল করিলেন। সেদিন ছিল ১৯৩১ সালের ৪ঠা জানুয়ারি। পৃথিবীর সুধীবৃন্দ এই দুঃসংবাদ শুনিয়া তাঁহার পরিবারবর্গের নিকট শোক প্রকাশ করিয়া অজস্র টেলিগ্রাম প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার অন্তিম ইচ্ছানুযায়ী মৃতদেহ বিমানযোগে বয়তুল মোকাদ্দসে আনয়ন করা হয় ও খলিফা ওমরের বিখ্যাত মস্‌জিদের পার্শ্বে সমাধিস্থ করা হয়। প্রথম গোলটেবিল বৈঠক খানাপিনা আয়াস আরাম ব্যতীত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক

কংগ্রেস এই বৈঠকে যোগদান করিয়াছিলেন। একমাত্র প্রতিনিধি ছিলেন মহাত্মা গান্ধী। বিলাতের বিখ্যাত রাজনীতিজ্ঞ সার্ উইন্‌স্টন চার্চিল গান্ধীজীকে 'অর্ধনগ্ন ফকির' বলিয়া বিদ্রূপ করিতেন। মহাত্মাজী লণ্ডনে পৌঁছিলে এই অর্ধনগ্ন ফকিরকে দর্শনের জন্য জাহাজ ঘাটে অসম্ভব ভিড় হইয়াছিল। তাঁহারা দেখিল জগতের এক শ্রেষ্ঠ পুরুষ কটিবাস পরিহিত অবস্থায় খদ্দরের মোটা চাদরে আবৃত দেহে এক সাধারণ চপ্পল পায়ে দিয়া বিশাল ভারতের প্রতিনিধি হইয়া আসিয়াছেন। শ্বেতদ্বীপের কৌতূহলী নরনারী বিস্ময়দৃষ্টিতে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য গোঁড়া হিন্দু হইলেও যুক্তপ্রদেশের জাতীয় পোশাক আচকান, পাঁজামা ও মাথায় পাগড়ী বাঁধিতেন। গলায় একটি চাদর জড়াইয়া দুই ধারে ঝুলাইয়া দিতেন। কপালে চন্দনের টিপ্ থাকিত। যতবার তাঁহাকে দেখিয়াছি এই পোশাক ব্যতীত অন্য পোশাকে দেখি নাই। পণ্ডিতজী বেনারসের অধিবাসী। যুক্তপ্রদেশের মুসলমানগণ সংখ্যালঘু হইলেও শিক্ষা ও প্রভাব প্রতিপত্তিতে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। নবাবী আমল হইতেই পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদিতে হিন্দুগণ মুসলমানী সভ্যতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। যুক্তপ্রদেশে হিন্দু-মুসলমানের ভাষাও ছিল উর্দ্দু। মালব্যজী হিন্দুত্ব বজায় রাখিবার জন্য তাঁহার পূজার উপকরণ কোশাকুশী ও এক কলসী গঙ্গাজল বিলাত যাত্রাকালে সঙ্গে লইয়াছিলেন। শুনিয়াছি তাঁহার পরিচারক গঙ্গাজলের কলসীটি মাথায় লইয়া যাইবার কালে সহযাত্রীদের অনেকেই কানাকানি ও মুখ টিপিয়া হাসিতেন। পণ্ডিতজী উহা লক্ষ্য করিলেও গ্রাহ্য করিতেন না। এই বৃদ্ধ বয়সে এক সাধু তাঁহার তারুণ্য ফিরাইয়া আনিয়া দিবেন বলিয়া

তাঁহাকে প্ররোচিত করেন। পুনরায় যৌবন লাভের আশায় তিনি সাধুর উপদেশমত কতকদিন নির্জনবাস করিয়া 'কায়কল্প' চিকিৎসাধীন থাকেন। এই চিকিৎসায় তারুণ্য তো দূরের কথা বার্ধক্যের দিকেই তাঁহাকে অনেকখানি আগাইয়া দিয়াছিল। পণ্ডিতজী বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক। প্রাজ্ঞ ও বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তি হইয়াও একজন অজ্ঞাতনামা সাধুর প্ররোচনায় কি করিয়া তিনি ভুলিলেন তাহা বুঝিতে পারা যায় না। এবারও দীর্ঘদিন ধারয়া গোলটেবিল বৈঠক চলিয়াছিল। গান্ধীজী বৈঠকের পরিণতি বুঝিয়া পূর্বেই চলিয়া আসিয়াছিলেন। অজস্র অর্থ ব্যয়ে খানাপিনা ও আলাপ-আলোচনা ব্যতীত পূর্বের ন্যায় ইহাও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছিল।

লবণ আইন ভঙ্গ

গান্ধীজী গোল টেবিল হইতে বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। লাহোর কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী 'লবণ আইন' ভঙ্গ করার জন্য তিনি প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। আরব সাগরের তীরে 'ডাণ্ডী' লবণ উৎপাদনের কেন্দ্র। গান্ধীজীর সবরমতি আশ্রম হইতে ডাণ্ডীর দূরত্ব প্রায় ২০০ মাইল। তথায় গিয়া তিনি স্বহস্তে লবণ প্রস্তুত করিয়া আইন ভঙ্গ করিবেন। এই দীর্ঘ রাস্তা পদব্রজে অতিক্রম করার উদ্দেশ্যে তিনি দলবলসহ যাত্রা করিলেন। পরণে কটিবাস, গায়ে খদ্দরের মোটা চাদর, পায়ে সেই সনাতন স্যাণ্ডেল। দীর্ঘ যষ্টি হাতে অনুচরবর্গসহ ধীর ও মন্থরগতিতে তিনি অগ্রসর হইতেছেন। গায়ে জামা না থাকায় পকেট ঘড়িটি তাঁহার ট্যাঁকে গোঁজা থাকিত। গমনপথে অসংখ্য দর্শনপ্রার্থীর ভীড় জমিতে লাগিল। অনেকে তাঁহার সহযাত্রী হইয়া ডাণ্ডী চলিলেন। সারা দেশে অভূতপূর্ব উত্তেজনার সৃষ্টি হইল। সর্বত্র গান্ধীজীর অনুকরণে লবণ আইন ভঙ্গের চেষ্টা চলিতে লাগিল। সীমান্তের জননায়ক আব্দুল গফ্ফার খাঁন, তাঁহার দলবল লইয়া লবণ আইন ভঙ্গ করিতে আরম্ভ করিলেন। সরকার পক্ষ অতিমাত্রায় সশঙ্কিত হইয়া সর্বত্র ধরপাকড় শুরু করিলেন। পেশোয়ারে ভয়ানক গোলমাল চলিতে লাগিল। প্রকাশ্য রাজপথে গুলি চলিল। রক্তরঞ্জিত পেশোয়ারের অবস্থা দেখিয়া একদল গাড়ওয়ালী সৈন্য গুলি চালাইতে অস্বীকার করিল। আবদুল গফ্ফার খাঁন বহু অনুচর-সহ গ্রেপ্তার হইয়া কারাবরণ করিলেন। 'খোদাই খেদমতগার' প্রতিষ্ঠানটি বেআইনী ঘোষিত হইল। ইহাতেও বিদেশী সরকারের তৃপ্তি হইল না। লোকের ঘরবাড়ী জ্বালাইয়া স্থান বিশেষে মেয়েদেরকে বেইজ্জত করিয়া এক ভয়াবহ অবস্থার

সৃষ্টি করিল। দুর্দ্ধর্ষ পাঠান অহিংসামন্ত্রে দৃঢ় থাকিয়া অকাতরে নির্যাতন সহ্য করিলেন। কেহ কেহ গুলির মুখেও প্রাণ দিলেন। আব্‌দুল গফ্‌ফার খাঁন ও তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা ডাঃ খাঁন সাহেব তখন পাঠানদিগের অবিসংবাদিত নেতা। দৃঢ়চেতা কর্মনিষ্ঠ ত্যাগের জ্বলন্ত মূর্তি খাঁন আব্‌দুল গফ্‌ফার খাঁন স্বাধীনতা-যুদ্ধের একজন শ্রেষ্ঠ সেনানী। অন্যায়ের সহিত তিনি কখনও আপস করিতে পারেন নাই। স্বাধীন পাকিস্তান তাঁহার মনোমত হয় নাই বলিয়া স্বেচ্ছায় তিনি নির্বাসন গ্রহণ করিয়াছেন। লবণ আইন ভঙ্গের জন্য সারা ভারতে ধরপাকড় ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা চলিতে লাগিল। সরকার কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানকেও বেআইনী ঘোষণা করেন। গান্ধীজী ও অন্যান্য নেতাগণ কারাগারে আবদ্ধ হইলেন। কংগ্রেস বেআইনী ঘোষিত হওয়ায় ১৯৩০ সালে কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশন বসিতে পারে নাই। কলিকাতা প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির গোপন অধিবেশন হিন্দুস্থান বিল্ডিংয়ের ৪ তালার উপরে এক কক্ষে বসিত। প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে সভাপতি করিয়া কার্য পরিচালনা করা হইত। হিন্দুস্থান কোম্পানীর জেনারেল ম্যানেজার নলিনীরঞ্জন সরকার আমাদের চা নাস্তার ব্যবস্থা করিতেন। অধিকাংশ নেতা কারাগারে আবদ্ধ থাকায় আমরা শরৎবাবু, নলিনীবাবু, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, প্রসিদ্ধ দন্ত-চিকিৎসক ডাঃ আর আহম্মদ আরও অনেকে একত্রে মিলিত হইতাম। গোপনে কংগ্রেস বুলেটিন লিথো প্রেসে ছাপাইয়া গোপনে প্রচার করা হইত। শরৎবাবু বৃদ্ধ বয়সে কালাচাঁদের (আফিম) ভক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার পাশে একটি গড়গড়া থাকিত। দুই-একটা টান দিয়া আফিমের নেশায় তিনি ঝিমাইতেন। দাদা বলিয়া ডাক দিতেই তাঁহার তন্দ্রা ছুটিয়া যাইত। ডাঃ আর আহম্মদ অস্থায়িভাবে এই গুপ্ত সমিতির সেক্রেটারি নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ডাঃ আর আহম্মদের জীবনকাহিনী উপন্যাসের মত কৌতূহলোদ্দীপক। তিনি ছিলেন দরিদ্রের সন্তান। জাহাজে খালাসির চাকুরি লইয়া আমেরিকায় গিয়াছিলেন। তথায় তিনি বাবুর্চীগিরি ও নানা ভাবে কায়িক পরিশ্রম করিয়া অর্থ উপার্জন করিতেন। উপার্জিত অর্থদ্বারা পুস্তক খরিদ করিতেন। অসাধারণ নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের ফলে তিনি দন্ত-চিকিৎসায় কৃতিত্ব অর্জন করেন এবং সর্বোচ্চ ডিগ্রী লইয়া দেশে ফিরিয়া আসেন। তখন তাঁহার তুল্য দন্ত-চিকিৎসক এদেশে আর কেউ ছিল না। পরবর্তী কালে তিনি পশ্চিম বাঙ্গালার মন্ত্রিত্বের পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই বৎসরের অন্যতম ঘটনা চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার-লুণ্ঠন। সূর্য সেন, গণেশ ঘোষ, অম্বিকা চক্রবর্তী, লোকনাথ বল ও মহিলা বিপ্লবী প্রীতিলতা ওয়াদ্দেয়ার যে দুঃসাহসিক কার্যদ্বারা

অস্ত্রাগার-লুণ্ঠন ও চট্টগ্রামকে কিছু দিনের জন্য ব্রিটিশ শাসন হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন উহা স্বাধীনতা-আন্দোলনের ইতিহাসে এক বিস্ময়কর ঘটনা। এই মুক্তিপাগল বিপ্লবীদল যাঁহারা হাসিমুখে ফাঁসির মঞ্চে অকাতরে প্রাণ বিসর্জন দিয়া জীবনের জয়গান গাহিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে দেশবাসী চিরকাল স্মরণ করিবে।

(৩৭)

লক্ষ্ণৌ কনফারেন্স

১৯৩১ সালে জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের কর্তব্য নির্ধারণের জন্য মহারাজা মাহমুদাবাদ লক্ষ্ণৌ শহরে এক কন্‌ফারেন্স আহ্বান করিলেন। ভারতের বিশিষ্ট আইনজীবী পাটনার বিখ্যাত ব্যারিস্টার সার্ আলী ইমাম এই সভার সভাপতি মনোনীত হইয়াছেন। আমরা যথা সময়ে নিমন্ত্রণপত্র পাইয়াছিলাম। যোগদান করিব কিনা চিন্তা করিতেছি, এমন সময় ডাঃ আনসারী সাহেবের এক জরুরী টেলিগ্রাম পাইয়া কন্‌ফারেন্সের উদ্দেশ্যে কলিকাতা রওয়ানা হইলাম। কলিকাতা আল্‌বার্ট হলে একটি পার্টি মিটিং ছিল। ১৪ই এপ্রিল উক্ত মিটিংয়ে যোগদান করিলাম। দিনাজপুরের জননায়ক জনাব মৌলানা আব্দুল্লাহিল বাকী সাহেবের এই সভায় সভাপতিত্ব করার কথা ছিল। কিন্তু কোন কারণে তিনি উপস্থিত হইতে না পারায় তাঁহার পরিবর্তে মৌলভী মুজিবর রহমান সাহেবকে সভাপতি করা হইল। স্বতন্ত্র ও মিশ্র নির্বাচন লইয়া সভায় তুমুল বিতর্কের সৃষ্টি হয়। মৌলানা আকরম খাঁ সাহেবের সহিত মতভেদ হওয়ায় তিনি সভা ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। ঐ দিনই আমরা লক্ষ্ণৌ যাত্রা করি। যাত্রীদের মধ্যে মৌলভী মুজিবর রহমান, মৌলভী আব্দুল করিম (অবসরপ্রাপ্ত স্কুল ইন্সপেক্টর) ফরিদপুরের মুয়াজ্জেম হুসেন চৌধুরী (লালমিঞা), মৌলানা আব্দুল্লাহিল কাফি (বাকী সাহেবের কনিষ্ঠ ভ্রাতা) মোহাম্মাদী-সম্পাদক নজির আহম্মদ চৌধুরী, সৈয়দ জালালউদ্দীন হাসেমী ও কুষ্টিয়ার মৌলভী আফিসারুদ্দীন আহম্মদ প্রমুখ অনেকে ছিলেন। এতগুলি বক্তা, সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও রাজনীতিকের একত্রে সমাবেশে নানা আলোচনায় গাড়ীখানি মুখরিত হইয়া উঠিল। সকলেই চিৎকার করিয়া বলেন কিন্তু কাহারও কথা কেউ শোনেন না। বর্ধমান স্টেশনে পৌঁছিবার পূর্বেই আমি দাঁড়াইয়া বলিলাম—আপনারা থামুন, আমার একটি জরুরী প্রস্তাব আছে। বন্ধু জালালউদ্দীন হাসেমী সকলকে শান্ত হইতে অনুরোধ করিলেন। আমি বলিলাম—কোন প্রস্তাব গ্রহণ করিতে হইলে সভার

একজন সভাপতি দরকার। আমার প্রস্তাব নজির আহম্মদ চৌধুরী সাহেবকে সভাপতি করা হউক। সকলেই সমস্বরে সমর্থন করিলেন। ইতিপূর্বে মৌলানা কাফী ও নজির আহম্মদ সাহেবের মধ্যে মিশ্র স্বতন্ত্র নির্বাচন লইয়া তর্কবিতর্ক চলিতেছিল। নজির আহম্মদ সাহেব সভাপতি হইবেন না বলিয়া বিরক্তি প্রকাশ করিলেন কিন্তু কে শোনে কাহার কথা। আমি প্রস্তাব করিলাম যেহেতু আমাদের মধ্যে লালমিঞা সাহেব একজন ধনী জমিদার ও সদাশয় ব্যক্তি। আমরা শীঘ্রই বর্ধমান পৌঁছিতেছি। বর্ধমানের মিহিদানা ও সীতাভোগের সুখ্যাতি আপনাদের অজানা নাই। (সকলেই হিয়ার হিয়ার বলিয়া সমস্বরে চিৎকার করিয়া উঠিলেন।) সুতরাং এই দুইটি উপাদেয় জিনিস উপভোগ করার জন্য লালমিঞা সাহেব আমাদের সুযোগ করিয়া দিবেন। বিপুল উল্লাসধ্বনির মধ্যে প্রস্তাবটি সমর্থিত হইল। তখন আমাদের অনিচ্ছুক সভাপতি সাহেব উল্লাসে দাঁড়াইয়া চিৎকার করিয়া বলিলেন— আমি সভাপতি প্রস্তাবটি পাস হইল বলিয়া ঘোষণা করিতেছি। লালমিঞা সাহেব আর কি করেন বর্ধমান স্টেশনে কয়েক ঝুড়ি মিষ্টান্ন খরিদ করিতে বাধ্য হইলেন। মিষ্টান্ন ভাগ হইতেছে, হাসেমী সাহেব আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—প্রস্তাবকের ভাগ কিছু বেশী হওয়া উচিত। নজির আহম্মদ সাহেব বলিলেন—আর সভাপতি বুঝি কিছুই না? বিরাট আনন্দ কোলাহলের মধ্যে মিষ্টান্ন ভোজনপর্ব শেষ হইল। লালমিঞা সাহেবের কিছু অর্থদণ্ড হইল বটে কিন্তু ভদ্রলোক তাহাতে আনন্দিত হইলেন। ট্রেনখানি আসানসোল জংশনে পৌঁছিল। আমাদের মধ্যে মৌলভী আফ্‌সারউদ্দীন সাহেব বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। তিনি কৃষিমন্ত্রী সামসুদ্দীন সাহেবের জ্যেষ্ঠভ্রাতা, সুবক্তা ও রসিক লোক। তাঁহার নানীর গান অপূর্ব অঙ্গভঙ্গিসহকারে আবৃত্তি করিয়া আমাদিগকে আনন্দ দিতেছিলেন। মৌলানা আব্দুল্লাহিল কাফী সাহেবের রাজনৈতিক গবেষণা-নজির আহম্মদ চৌধুরীর স্বতন্ত্র ও মিশ্র নির্বাচন তত্ত্ব জালালউদ্দীন হাসেমীর 'পার্টি পলিটিক্স'-এর তত্ত্ব-বিশ্লেষণ আমরা কোন্‌টা রাখিয়া কোন্‌টা শুনিব। ট্রেন মোকামাঘাট পৌঁছিল। হাসেমী সাহেব নৈশাহারের জন্য বন্দোবস্ত করিতে তৎপর হইলেন। আগামী স্টেশনে উত্তম আহারের ব্যবস্থা হইবে বলিয়া আমাদিগকে আশ্বাস দিলেন। যথাসময় বাবুর্চী খানা লইয়া আসিল। যে পরিমাণ পোলাও কোর্মা ছিল তাহাতে আমাদের জঠরানল নির্বাপিত হইল না। অধিকন্তু মূল্যস্বরূপ অধিক অর্থ দিতে হইল। হাসেমী সাহেব নিজের অকৃতকার্যতার জন্য নিজেই চটিয়া আগুন হইলেন। আমরা আর কি করিব।

সকলে সমস্বরে তাঁহার জয়ধ্বনি করিলাম। হাসেমী সাহেব গাড়ীর দরজার পাশে বসিয়াছিলেন। বাহিরের কোন যাত্রী গাড়ীতে উঠিবার চেষ্টা করিলে তাঁহার ধমক্ খাইয়া ফিরিয়া যাইত। এবার আমরা প্রসিদ্ধ 'মোগলসরাই' জংশনে পৌঁছিলাম। এখানে কয়েকজন ভদ্রলোক হাসেমী সাহেবের তর্জনগর্জন উপেক্ষা করিয়া কামরায় ঢুকিয়া পড়িলেন। আগন্তুকগণ দেখিলেন এই ব্যক্তির বসিয়া বসিয়া চিৎকার করা ছাড়া তাহার কিছুই করিবার শক্তি নাই। দাঁড়াইতে হইলেও তাহাকে যষ্টির সাহায্য লইতে হয়। তখন তাহারা মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিলেন। ট্রেন বেনারস অতিক্রম করিল। নৈশাকাশের নক্ষত্রমালা ও শহরের বৈদ্যুতিক আলোগুলি অর্ধ-চন্দ্রাকারে গঙ্গার বক্ষে প্রতিফলিত হইয়া মনোরম দৃশ্যের সৃষ্টি করিয়াছিল। পরদিন ট্রেনখানা অযোধ্যায় পৌঁছিল। এখন আর সে রামও নাই সে অযোধ্যাও নাই। অযোধ্যা এখন একটি সাধারণ শহর। কিন্তু রামচন্দ্রের ভক্ত বংশধরগণকে নির্বিবাদে বিচরণ করিতে দেখা গেল। যাত্রীদের নিকট হইতে কলা বিস্কুট, রুটি ইত্যাদি পাওয়ার আশায় দলে দলে বানর প্লাটফর্মে হাজির হইল। উক্ত বীর হনুমানের বংশধরগণ অযোধ্যার প্রাচীন ঐতিহ্যের নিদর্শনস্বরূপ বিদ্যমান রহিয়াছে। আমরা ভারতের বিলাস নগরী লক্ষ্ণৌ আসিয়া পৌঁছিলাম। বিরাট স্টেশন। একদল স্বেচ্ছা-সেবক আমাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া বলরামপুর হাউসে লইয়া গেল। তথায় আমাদের থাকিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। বাঙ্গালী আমরা সংখ্যায় ১৫।১৬ জন ছিলাম। বিভিন্ন প্রদেশ হইতে আগত ডেলিগেটদিগের জন্য ভিন্ন ভিন্ন স্থান নির্ধারিত ছিল। লক্ষ্ণৌয়ের শেষ নবাব ওয়াজেদ আলী সাহেবের বিশাল কানন 'কৈশোর বাগের' কাচনির্মিত প্রশস্ত হলঘরে সন্ধ্যার প্রাক্কালে সভার অধিবেশন বসিল। সারা ভারতের প্রায় সহস্রাধিক মুস্লিম লীগ নেতা সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। আমার যতদূর মনে হয় সভাপতি সার্ আলী ইমাম স্বতন্ত্র নির্বাচন সমর্থন করিয়া ভাষণ দিয়াছিলেন। সুবৃহৎ কৈশোর বাগের পূর্বদিকের দ্বিতল বাড়ীটি বলরামপুরের রাজা সাহেবের এবং পশ্চিম দিকের বাড়ীটি মহারাজা মাহমুদাবাদ সাহেবের ছিল। পৌষ মাসে লাহোরের প্রচণ্ড শীত অনুভব করিয়াছি। এবার বৈশাখের প্রথমে লক্ষ্ণৌয়ে গ্রীষ্মের ভীষণতা বুঝিতে পারিলাম। ৫টার পূর্বে ঘরের বাহির হওয়া আমাদের পক্ষে অসম্ভব ছিল। বাতাস যেন আগুনের হল্কা। দুই দিন ধরিয়া সভার অধিবেশন হয়। মুসলমান সমাজের বিভিন্ন জাতীয় সমস্যা লইয়া আলোচনা হইয়াছিল। স্থানীয় বিখ্যাত আলেম মৌলানা কুতুবুদ্দীন আবদুলওয়ালী অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন।

আলী ইমাম ও আলী হাসান ভ্রাতৃদ্বয় পাটনার বিখ্যাত ব্যারিস্টার ও স্বনামধন্য পুরুষ। হাসান ইমাম সাহেব কিছুদিন কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারক নিযুক্ত হন। অত্যন্ত তেজস্বী ও স্বাধীনচেতা লোক বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল। তখনকার দিনে রেলগাড়ীতে এদেশীয় লোকের সঙ্গে যাতায়াত ইংরেজেরা পছন্দ করিত না। রাজার জাতি বলিয়া তাহারা অত্যন্ত গর্ববোধ করিত। ভারতীয়দিগকে 'নেটিভ' বলিয়া তাহারা ঘৃণা করিত। এদেশের প্রথম শ্রেণীর যাত্রীদিগকেও তাহাদের সঙ্গে বসিতে দিত না। হাসান ইমাম সাহেব ইংরেজদের ঔদ্ধত্য বরদাস্ত করিতে পারিতেন না। একদা তিনি পাটনা স্টেশনে এক শ্বেতাংগ যাত্রীর কামরায় উঠিয়া পড়িলেন। সাহেব রক্ত চক্ষু দেখাইয়া তাঁহাকে নামিয়া যাইতে বলিলেন কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না। আগন্তুক উহা গ্রাহ্যই করিলেন না। 'নেটিভের' গোস্তাখী দেখিয়া সাহেব মুষ্টি বাগাইয়া অগ্রসর হইলেন। ইমাম সাহেবের ভোজপুরি চাপরাসী তাঁহার সঙ্গেই ছিল। প্রভুর ইঙ্গিত পাইয়া পায়ের নাগরা জুতা খুলিয়া সাহেবকে বেদম প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। আচ্ছা কয়েক ঘা বসাইয়া দিয়া সাহেবকে প্ল্যাটফর্মে ফেলিয়া দিল। সাহেবের নাম ছিল মিস্টা. ক্লেটন। ই. আই. রেল-এর একজন পদস্থ অফিসার। গোলমালে বহুলোক জমিয়া গেল। লোক দেখিল কলিকাতা হাই-কোর্টের জজ হাসান ইমাম সাহেবের চাপরাসী বেয়াদব সাহেবকে কিছু তরিবৎ দিয়াছে। তখন তাহারা খুশিই হইল। এইরূপ একাধিক ঘটনা তাঁহার জীবনে ঘটিয়াছে।

(৩৮)

আমরা মহারাজা মাহমুদাবাদের গেস্ট ছিলাম। মহারাজার বাড়ীতে দ্বিতলে একটি প্রশস্ত কক্ষে ফরাশের উপর দস্তরখানা বিছাইয়া আমাদের আহারের ব্যবস্থা করা হইল। দস্তরখানার চারিদিকে আমরা গোলাকারে বসিতাম। রাজঅতিথি ছিলাম। সুতরাং আহার্যের ব্যবস্থাও তদনুযায়ী ছিল। পোলাও কোর্মা, পরটা, বিরিয়ানী, সাদা রুটি, উৎকৃষ্ট দধি, মিষ্টান্ন পর্যাপ্ত পরিমাণ দস্তরখানায় মজুত থাকিত। অভিন্ন রুচি অনুযায়ী আমরা আহার্যবস্তুগুলির সদ্ব্যবহার করিতাম। নিমন্ত্রিতদের মধ্যে হাকিম আজমল খাঁ, ডাঃ আনসারী, মৌলানা আজাদ, রফি আহম্মদ কিদওয়ায়ী, ব্যারিস্টার সৈয়দ মামুদ, মৌলানা আতাউল্লা শাহ্ বোখারী এবং আরও অনেকে। মহারাজ কোন দিন আম্মাদের শরিক হইতেন, চৌধুরী খালেকুজ্জামান আহারের সময়

পস্থিত থাকিয়া আমাদের তত্ত্বাবধান করিতেন ; লক্ষ্ণৌ যুক্তপ্রদেশের বিখ্যাত শহর। নবাবদের দেশ বলিয়া শহরটিতে আজও বিলাসিতার প্রাচুর্য রহিয়াছে। নবাবেরা দেশের মালিক ছিলেন বলিয়া যুক্তপ্রদেশের জমিদারদের উপাধি হিন্দু-মুসলমান-নির্বিশেষে রাজা ও মহারাজা। পূর্বে বলিয়াছি এই প্রদেশের মুসলমানেরা অত্যন্ত প্রভাবশালী ও শিক্ষায় উন্নত ছিলেন। মহারাজা মাহমুদাবাদের সার্ মাহমুদ আলী খাঁন একজন শ্রেষ্ঠ জমিদার ও জাতীয়তাবাদী মুসলমান ছিলেন। সমাজ ও দেশের উন্নতির জন্য তিনি অনেক কিছু করিয়াছেন। ১৯২৮ সালে কলিকতার মুস্‌লিম লীগের অধিবেশনে মহারাজা সভাপতি হইয়াছিলেন। এখানকার মাহমুদাবাদ হউস নামক বিরাট অট্টালিকাটি একটি মিউজিয়াম। এখানে বহু মূল্যবান ও দুষ্প্রাপ্য দ্রব্যের সংগ্রহ আছে। বহু অর্থব্যয় করিয়া মহারাজা মিউজিয়ামটি সুসজ্জিত করিয়াছেন। অতঃপর আমরা নওয়াব বাড়ী দেখিতে গেলাম, সুবিখ্যাত নওয়াব আস্‌ফৎ দৌলা অতি বদন্য ব্যক্তি ছিলেন। প্রার্থীকে কখনও তিনি রিক্ত হস্তে ফিরাইয়া দিতেন না। প্রবাদ আছে—

জিস্ কো না দো মৌলা,
উস্ কো দেতা আস্‌ফৎ দৌলা।

লক্ষ্ণৌর শেষ নওয়াব ওয়াজেদ আলী শ.হ্‌কে পদচ্যুত করিয়া ইংরেজরা কলিকাতা মেটিয়া বুরুজে নির্বাসিত করেন। মেটিয়া বুরুজের নবাবের বাসভবন আমরা দেখিয়াছি। সরকার নাকি তাঁহাকে মাসিক ১ লক্ষ টাকা ভাতা দিতেন কিন্তু তাহাতেও তাঁহার খরচ সংকুলান হইত না। শুনা যায় তাঁহার নাকি তিন শত বেগম ছিল। বেগমদের জন্য নির্মিত বহু কামরা আমরা দেখিয়াছি। সেগুলি এখন অযত্নে পড়িয়া আছে। একটি কামরায় নওয়াব সাহেব অন্তিম শয্যায় শায়িত আছেন। বিলাসিতা ও আত্মকলহের ফলে মুসলমান জগৎজোড়া সাম্রাজ্য হারাইয়াছে। আজও ধনী মুসলমানেরা বিলাসিতায় হাবুডুবু খাইতেছেন। দেশের লোক না খাইয়া মরুক, সংক্রামক ব্যাধিতে উজাড় হইয়া যাউক তাহাতে তাহাদের কিছুই আসে যায় না। অনেকের সৎকাজে হস্ত সঙ্কুচিত, অসৎ কাজে দরাজ দিল। লক্ষ্ণৌর ইমামবাড়া বিশাল দ্বিতল অট্টালিকা। ইহার প্রশস্ত দীর্ঘ ছাদটি কড়িবর্গাবিহীন। ইহার নির্মাণকৌশল আগ্রার রংমহলের ছাদের অনুরূপ। তখন সিমেন্ট ছিল না অথচ কোন্ উপকরণ দিয়া এইরূপ ছাদ নির্মিত হইয়াছিল কে জানে যাহা আজও কালের ভ্রূকুটি উপেক্ষা করিয়া অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। গোমতী নদী লক্ষ্ণৌয়ের পাদদেশ

ধৌত করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। শহরের বাহিরে নবাবী আমলের অসংখ্য বাগবাগিচা অযত্নে নষ্ট হইয়া যাইতেছে। আমি ও লালমিঞা সাহেব একদিন প্রধান বাজারটি দেখিতে গেলাম। ভদ্রলোকেরা সাদা পাজামা, পাতলা পাঞ্জাবী ও দোপাল্লা টুপি ধোপদস্ত পোশাকে আতর এসেন্সের সুবাস ছড়াইয়া বাজারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। লক্ষ্ণৌয়ের খরবুজা বিখ্যাত, লালমিঞা সাহেব কয়েকটি খরিদ করিয়া বাসায় আনিলেন। উহার মিষ্ট স্বাদ আজিও ভুলিতে পারি নাই। অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষ হইতে কয়েকটি বড় বড় 'তরমুজ' আমরা পাইয়াছিলাম, এমন রসনাতৃপ্তিকর সুমিষ্ট তরমুজ আর কোথাও খাইয়াছি বলিয়া মনে হয় না। লক্ষ্ণৌয়ের ঠুংরী, গজল ও কাওয়ালী গানের প্রসিদ্ধি আছে। আমরা কয়েক বন্ধু মিলিয়া একদিন থিয়েটারে যাইবার সংকল্প করিলাম। সন্ধ্যার কিছু পূর্বে একটি বর্ষীয়সী মহিলার আহ্বানে আমরা বাহিরে আসিলাম। দেখিয়া আশ্চর্য হইলাম, আধুনিক বেশবাসে সুসজ্জিতা তিনটি অনিন্দ্যসুন্দরী তরুণী আমাদের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। উগ্র প্রসাধানচর্চিতা বিপজ্জনক সুন্দরী দেখিয়া আমরা শংকিত হইয়া উঠিলাম। বিস্ময়ের ঘোর না কাটিতেই তরুণীরা পরিষ্কার উর্দ্দু ভাষায় বলিলেন—আমাদের হঠাৎ অনাহুত আগমনের জন্য আপনাদের কাছে মাফ চাচ্ছি। আপনারা কলিকাতা হইতে আসিয়াছেন জানিয়া আমাদের থিয়েটারের ম্যানেজার সাহেব আজ রাত্রে আপনাদিগকে সাদর আমন্ত্রণের জন্য আমাদিগকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। আজ আমাদের নাচ-গানের ভাল প্রোগ্রাম আছে। আপনারা দয়া করিয়া আসিলে আমরা খুব খুশি হইব। এই বলিয়া মিষ্ট হাসির সহিত বিনীত অভিবাদন জানাইয়া তাহারা চলিয়া গেল। বন্ধু জালালউদ্দীন হাসেমী এতক্ষণ যেন কোন স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করিতেছিলেন। আমাদের অবস্থাও তথৈবচ, একটা অদ্ভুত ব্যাপার বটে, থিয়েটারের নিমন্ত্রণের জন্য কর্তৃপক্ষ কার্ড পাঠাইলেই তো পারিতেন কিন্তু এই অপ্সরাগণকে পাঠাইবার হেতু কি? লালমিঞা সাহেব বলিলেন —নবাবের দেশ লক্ষ্ণৌ। নবাবী কাণ্ড কারখানার সহিত আমরা পরিচিত নহি। তাই হয়তো বিস্ময়বোধ করিতেছি। আমরা তো পূর্বেই থিয়েটারে যাওয়ার জন্য সংকল্প করিয়াছিলাম, তাহার উপর এই সাদর আমন্ত্রণ সুতরাং না যাইয়া উপায় কি? রাত্রে আহারাদির পর 'রয়েল' থিয়েটারে যোগদান করিলাম। ১০ টাকা দিয়া লালমিঞা সাহেব ২খানা টিকেট ক্রয় করিলেন, আমাকে আর টিকেটের মূল্য দিতে হয় নাই। হাসেমী সাহেব এবং আমাদের দলের আরও অনেককে সেখানে দেখিলাম। স্বয়ং

ম্যানেজার সাহেব আমাদের অভ্যর্থনা জানাইলেন। আমন্ত্রণকারিণী মেয়ে-তিনটি আমাদের সহিত দেখা করিয়া ধন্যবাদ জানাইয়া গেলেন। নৃত্যগীত চমৎকার হইয়াছিল। রাত্রি প্রায় ২টা পর্যন্ত পরমানন্দে উপভোগ করিয়া আমরা বাসায় ফিরিলাম। পরদিন সকালে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মৌলানা সাহেবের বাসভবনে আমাদের চায়ের নিমন্ত্রণ ছিল। এইখানেই সদ্য কারামুক্ত মৌলানা আতাউল্লা শাহ্ বোখারী সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ হইল। ১৯৩০ সালে অক্টোবর মাসে ভারতের অগ্নিপুরুষ মৌলানা সাহেব দিনাজপুরে গ্রেপ্তার হইয়া কলিকাতা প্রেসিডেন্সী জেলে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। ইহা তাঁহার তৃতীয় কারাবাস। তাঁহার শারীরিক গঠন, দুর্দমনীয় সাহস তাঁহার বীরত্বের অনুরূপ ছিল। আমাকে ও লালমিঞা সাহেবকে তিনি দুই বগলে চাপিয়া একটি নিভৃত স্থানে লইয়া গেলেন। অনেকক্ষণ ধরিয় দেশের কর্মপন্থা লইয়া আলোচনা হইল। এমন অমায়িক বন্ধুবৎসল মানুষ কমই দেখিয়াছি। তিন দিন ধরিয়া রাজঅতিথি রূপে পোলাও কোর্মা ইত্যাদিতে আমাদের অরুচি ধরিয়া গিয়াছে। মাছ ভাত ডাইল হইলে আমরা তৃপ্তির সহিত খাইতে পারি, কোন নিমন্ত্রণ উপলক্ষে অথবা আত্মীয়স্বজনের আগমনে পোলাও কোর্মা আমাদের ভাগ্যে জুটিয়া থাকে, লক্ষ্ণৌ মুস্‌লিম সভ্যতা কৃষ্টির তমুদ্দ্যুনের জন্য খ্যাত। এখানকার ভাষা উর্দ্দু, অতি প্রাঞ্জল ও চমৎকার। রাজধানী দিল্লীর ভাষাও এত সুন্দর নয়। লক্ষ্ণৌয়ের 'খরমুজা' কিছু সঙ্গে লইয়া যাইব ইচ্ছা ছিল কিন্তু আসিবার সময় উহা ভুলিয়া গিয়াছিলাম। মির্জ্জাপুর স্টেশনে গাড়ী পৌঁছিলে প্লাটফর্মে 'খরমুজা' বিক্রয় হইতে দেখিয়া লালমিঞা সাহেব কয়েকটি কিনিয়া লইলেন। উহার স্বাদ লইয়া দেখা গেল লক্ষ্ণৌয়ের খরমুজার সহিত ইহার কোন তুলনা হয় না। আমরা পরদিন কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলাম।

(৩৯)

প্রজা-আন্দোলন

মৌলভী রজিবুদ্দীন তরফদার সাহেবের আহ্বানে বগুড়া টাউনে এক প্রজা কন্‌ফারেন্স আহুত হয়। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু উহার সভাপতি মনোনীত হন। কবি কাজী নজরুল ইস্‌লাম, বিখ্যাত লেখিকা অনুরূপা দেবী, বিমল প্রতিভা দেবী, মৌলানা আবদুল্লাহিল বাকী প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এই সভায় যোগদান করেন। কাজী নজরুল ইস্‌লাম তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ অনুপম ভঙ্গি ও ভাষাতে স্বরচিত একটি

কবিতা পাঠ করেন। অনুরূপা ও বিমল প্রতিভা দেবী কৃষকের দুর্দশা সম্বন্ধে লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। মৌলানা বাকী সাহেব, কবি নজরুল ইসলাম ও আমরা কয়েকজন একত্রে বসিয়াছিলাম। কি একটা কথা লইয়া কবি মৌলানা সাহেবের মধ্যে কথা কাটাকাটি হইতেছিল। বিতর্ক ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাওয়ায় সুভাষ বাবু ও আমাদের অনুরোধে উভয়ে নিবৃত্ত হন। সভায় জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ করা হউক বলিয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়। রাজশাহী জেলার আত্রাই 'বৃকুৎসা থামার' গ্রাম ইত্যাদি প্রজাসভায় উপরোক্ত মর্মে প্রস্তাব পাস হয়। বগুড়া জেলার জয়পুরহাটে উত্তরবঙ্গ ছাত্র সম্মেলন আহ্বান করা হইয়াছিল। প্রসিদ্ধ কংগ্রেস-নেতা চট্টগ্রাম কলেজের প্রিন্সিপাল নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, কবি ইসমাইল হোসেন সিরাজী এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। সভার সভাপতির আসন আমাকেই গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, স্বনাম-খ্যাত স্বামী বিবেকানন্দের ভ্রাতা বিখ্যাত সাহিত্যিক ও বিপ্লবী নেতা ছিলেন। কবি সিরাজী সাহেব একাধারে কবি, সাহিত্যিক, রাজনৈতিক নেতা ও প্রসিদ্ধ বক্তা ছিলেন। তাঁহার গলার স্বর যেমন গুরুগম্ভীর ছিল তেমনি তাঁহার বক্তৃতা ছিল অসাধারণ। সভায় ছাত্রদের অভাব-অভিযোগ ও অন্যান্য বিষয় লইয়া আলোচনা হইয়াছিল। বালুরঘাটে এক সভায় যোগদানের জন্য নৃপেন বাবু ও ডাঃ দত্ত হিলি আসিয়া আমার আতিথ্য গ্রহণ করেন। বালুরঘাট সভা করিয়া তাঁহারা আত্রাই যান। এখানেও এক বিরাট সভায় বক্তৃতা করেন। জার্মানী প্রত্যাগত ডাঃ সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাজশাহীর নিরলস কর্মী প্রভাসচন্দ্র লাহিড়ী এই সভায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন। এখানেও আমাকে সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হয়। এখান হইতে নাটোর টাউনে এক প্রজাসভায় আমরা যোগদান করি। নৃপেন বাবু সভাপতির পদ গ্রহণ করেন। জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ করা হউক বলিয়া এইসকল সভায় প্রস্তাব গৃহীত হয়।

মুকুন্দ দাস

বরিশালের চারণকবি স্বনামখ্যাত মুকুন্দ দাস তাঁহার স্বদেশী যাত্রার দল লইয়া দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত অকুতোভয়ে জাগরণী সঙ্গীত গাহিয়া গিয়াছেন। বিদেশী সরকারের রক্ত চক্ষু অত্যাচারী জমিদার মহাজনের ভ্রূকুটি উপেক্ষা করিয়া সিংহবিক্রমে তিনি মুক্তির বাণী প্রচার করিয়া গিয়াছেন। স্বরচিত

সঙ্গীত ও অভিনয়ের মধ্য দিয়া গণ-আন্দোলনকে শক্তিশালী করিয়া গিয়াছেন। স্বদেশী যাত্রায় কোন দেবদেবীর কাহিনী থাকিত না। সরকার ও সরকারের এজেন্ট জমিদার মহাজনদিগের অত্যাচারের কাহিনী তাঁহার অভিনয়ের মধ্য দিয়া ফুটিয়া উঠিত। হিলিতে দুই বার তিনি আসিয়াছিলেন। এত জনসমাগম হইয়াছিল যে, প্রবেশ-মূল্য লইয়াও দর্শকদিগের বসিবার ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় নাই। সত্য প্রচারের অভিযোগে তাঁহাকে কয়েক বার কারাদণ্ড ভোগ করিতে হয়। দেশের মুক্তিসংগ্রামে তাঁহার দান অপরিসীম। দেশবাসী শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার কথা স্মরণ করিবে।

ফরিদপুর কন্‌ফারেন্স

১৯৩১ সালের ২৬শে জুন ফরিদপুর শহরে জাতীয়তাবাদী মুসলমানদিগের এক কন্‌ফারেন্স বসিল। স্বনামখ্যাত ডাঃ মোখ্‌তার আহম্মদ আনসারী সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন। জননেতা জনাব মোয়াজ্জেম হোসেন চৌধুরী (লালমিঞা) সাহেবের আহ্বানে এই সভা আহুত হইয়াছিল। দিনাজপুরের মুস্‌লিম লীগ কর্মী ও জননায়ক মৌলভী হাসান আলী ও আমি একত্রে এই সভায় যোগদান করি। ফরিদপুর স্টেশন হইতে শোভাযাত্রা করিয়া আমাদিগকে সভাস্থলে লইয়া যাওয়া হয়। লালমিঞা সাহেব অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন। লালমিঞা সাহেবের চেষ্টা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে অত্যন্ত জাঁকজমকের সহিত এই কন্‌ফারেন্স শেষ হয়। লালমিঞা সাহেব পদ্মা নদীর ইলিশ মাছ আমাদিগকে প্রচুর পরিমাণে খাওয়াইয়াছিলেন। তাঁহার আতিথ্য সৎকারের কথা কখনো ভুলিতে পারিব না।

বসু বিজ্ঞানমন্দির

সভা শেষ হইলে ডাঃ আন্‌সারী সাহেব কলিকাতা রওয়ানা হইলেন। আমরাও সঙ্গে চলিলাম। শিয়ালদহ স্টেশনে বহু লোক শোভাযাত্রা সহ ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় মহাশয়ের বাড়ী আমাদিগকে লইয়া গেলেন। ২০শে জুন কলিকাতা টাউন হলে কলিকাতা কর্পোরেশনের পক্ষ হইতে তাঁহাকে এক মানপত্র দেওয়া হয়। কর্পোরেশনের তদানীন্তন মেয়র, ডেপুটি মেয়র মৌলভী এ. কে. ফজলুল হক, জনাব শহীদ সোহ্‌রাওয়ারদী সাহেব ও কলিকাতার বহু বিশিষ্ট হিন্দু-মুসলমান উপস্থিত ছিলেন। বাবু সুভাষচন্দ্র বসু মেয়রের পক্ষ হইতে মানপত্রখানা পাঠ করেন। সভায় বিপুল জনসমাগম হইয়াছিল। টাউন হলের বিরাট অট্টালিকায় তিল ধারণের স্থান

ছিল না। সুপ্রশস্ত সিঁড়ি ও সম্মুখস্থ ময়দানে অসংখ্য লোক দাঁড়াইয়া ছিলেন; নিমন্ত্রিতদের মধ্যে হাবলুল মতিন সম্পাদক আগামইনুল ইস্‌লাম ও উর্দ্দু সাহিত্যের খ্যাতনামা দিকপাল মওলানা শাহ্‌ আবদুর রউফ দানাপুরী উপস্থিত ছিলেন*। সভা শেষে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গকে মিষ্টি মুখে আপ্যায়িত করা হয়। প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের বসু বিজ্ঞানমন্দির পরিদর্শনের জন্য অপরাহ্নে আন্‌সারী সাহেব আমাদিগকে লইয়া তথায় গমন করেন। আচার্য মহাশয়ের সহধর্মিণী সমাগত অতিথিবর্গকে সাদর অভ্যর্থনা জানাইলেন। তিনি স্বয়ং সঙ্গে থাকিয়া তাঁহার স্বামীর আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি দেখাইলেন। যে যন্ত্রের সাহায্যে উদ্ভিদের প্রাণশক্তির স্পন্দন পরিষ্কারভাবে ধরা পড়ে তাহা দেখিলাম। উদ্ভিদের খাদ্য আহরণের দৃশ্য স্পষ্ট অনুভব করা গেল। এই বাঙ্গালী বৈজ্ঞানিক বেতারযন্ত্রের মূল সূত্রগুলিরও আবিষ্কারক। কিন্তু তাঁহার আবিষ্কারের কথা প্রচার হওয়ার পূর্বে ইটালীর বৈজ্ঞানিক মার্কনীর নাম প্রচার হইয়াছিল। বাঙ্গালী বৈজ্ঞানিকের আবিষ্কারের গুরুত্ব বিজ্ঞানজগৎ এখন আর অস্বীকার করে না। লেডী বসু অতঃপর চা-পানে আমাদিগকে আপ্যায়িত করিলেন। তথা হইতে লিবার্টি পত্রিকার বিশাল ভবনের দ্বারোদ্ঘাটনের জন্য আনসারী সাহেব আহুত হন। ডাঃ আনসারী স্বাধীনতা-সংগ্রামের অন্যতম বীর সেনানী। তিনি দিল্লীর অধিবাসী। তখনকার দিনে সমগ্র ভারতে তাঁহার তুল্য শল্যচিকিৎসক আর কেহই ছিলেন না। কলিকাতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় তাহার বিশিষ্ট বন্ধু ও সহকর্মী ছিলেন। নৈশাহারের ব্যবস্থা সেখানেই হইয়াছিল। পরদিন হাওড়া স্টেশনে গিয়া আমরা তাঁহাকে বিদায় দিলাম।

বহরমপুর কন্‌ফারেন্স

ডিসেম্বরের প্রথম ভাগে প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্সের অধিবেশন বহরমপুরে বসিল। কুমিল্লার প্রবীণ জননায়ক হরদয়াল নাগ সভাপতি হইয়াছিলেন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন বহরমপুরের প্রসিদ্ধ উকিল জনাব আবদুস্‌ সামাদ সাহেব। আমরা দিনাজপুর হইতে কংগ্রেস-নেতা যোগেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী, নিশীথনাথ কুণ্ডু ও আরও কয়েক জন যোগদান করিয়াছিলাম। বিশেষভাবে আমন্ত্রিত হইয়া ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ, প্রফেসার আবদুল বারী প্রমুখ কতিপয় নেতা সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। কন্‌ফারেন্স শেষ হইলে আমরা মুর্শিদাবাদ নবাব

বাড়ী দেখিতে গেলাম। নবাব সিরাজদ্দৌলার পতনের সঙ্গে সঙ্গে মুর্শিদাবাদের গৌরব-রবি অস্তমিত হইয়াছে। বর্তমানে বহরমপুর জেলার সদর। মুর্শিদাবাদ শুধু অতীতের ধ্বংসাবশেষ বুকে লইয়া ক্ষুদ্র একটি মহাকুমা শহরে পরিণত হইয়াছে। ভাগীরথীর তীরে অবস্থিত নবাব বাড়ীর সাবেক জৌলুশ আর নাই। বিখ্যাত হাজার দুয়ারী ঘর ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিলাম। মীরজাফর, জগৎশেঠ, উমিচাঁদ প্রভৃতি নিমকহারামদের বাসভবন ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়াছে। ইতিহাসপ্রসিদ্ধ মতিঝিল ও হিরাঝিল এখন কচুরিপানায় পূর্ণ। দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে গিয়া সিরাজদ্দৌলা বেইমানদের ঘৃণিত ষড়যন্ত্রে অতি নিষ্ঠুরভাবে ঘাতকের হস্তে শহীদ হইয়াছেন। অতীতের এই শোকাবহ কাহিনী স্মরণ করিয়া হৃদয় বিষাদে আচ্ছন্ন হইল। কলনাদিনী ভাগীরথী আজ শীর্ণকায়া। নদীর অপর পারে খোশবাগে শহীদ সিরাজের কবর অবস্থিত। প্রসিদ্ধ ইস্‌লাম প্রচারক মুন্সী শেখ জমিরউদ্দীন সাহেব খোশবাগ পরিদর্শন করিয়া 'ইস্‌লাম প্রচারক' পত্রিকায় দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে যে কবিতাটি লিখিয়াছিলেন উহা এখানে উদ্ধৃত করিতেছি—

কোন্ শান্তি সাধনায় মগ্ন তুমি আজ
হে বঙ্গ গৌরব রবি নবাব সিরাজ!
পার্শ্বে তব মাতামহ আলিবর্দী খাঁন,
জুড়াতে তোমার ক্লান্তি, অনুতপ্ত প্রাণ।
তোমারই ভগ্ন স্বরে মিশাইয়া তান,
গাহিছে অনন্ত গীত, ঐ 'খোশ বাগান'
ব্যথিতের অশ্রুজল দিতেছে প্লাবিয়া,
পথিক দাঁড়ায় আসি স্তম্ভিত হইয়া;
হে সিরাজ! মহাবীর ইস্‌লাম রতন,
গুপ্ত শান্তিবাসে হায় বসি অনুক্ষণ
এখনও কি ভাব দেব আমাদের তরে,
এখনও কি বঙ্গ রাজ্য কভু মনে পড়ে?
নিয়তির কালচক্রে হইয়া চক্রিত
যদিও হে, হলে তুমি অকালে নিদ্রিত।
তথাপি ওখান হতে কর আশীর্বাদ,
যেন মোরা ভুলে যাই সন্তাপ ও বিষাদ।

শান্তি দেবী আসি নিত্য দিন দরশন,
তুমিও ভুলিয়া যাও সংসার স্বপন।
পথিকের দুই বিন্দু তপ্ত অশ্রুজলে,
দয়া করে উপহার লও পদতলে।

মুর্শিদাবাদ শহরের প্রতিষ্ঠাতা নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ কাটরার মস্‌জিদের সিঁড়ির নিচে অনন্তশয্যায় শায়িত। বোধহয় তাঁহার অন্তিম বাসনা ছিল যে, নামাজী মুস্‌লিমদের পদধূলিস্পর্শে হয়তো তাঁহার পারলৌকিক আত্মার কল্যাণ হইবে।

(৪০)

১৯৩২ সাল

বন্দিজীবন

কর্মজীবনে সরকারী আতিথ্যলাভ ইতিপূর্বে আর আমার ভাগ্যে ঘটে নাই। সরকার কয়েক বার ১৪৪ ধারা জারি করিয়া সভাসমিতিতে বক্তৃতা দেওয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। অর্ডিনান্স জারি করিয়া হিলির বাহিরে যাওয়া নিষিদ্ধ করা হইয়াছিল। তাহাতেও তৃপ্তি না হওয়ায় অবশেষে আমাকে গ্রেপ্তার করিলেন। সেদিন ছিল ১৯৩২ সালের ২২শে জানুয়ারি। শুক্রবারে জুম্মার নামাজ পড়িয়া বাড়ীতে আসিয়াছি। এমন সময় সশস্ত্র পুলিশসহ স্বয়ং ডি. এস. পি. সাহেব উপস্থিত হইয়া জানাইলেন, আপনাকে গ্রেপ্তার করা হইল। সেদিন বাড়ীতে আমার স্ত্রী ও দুই-তিনটি ছোট ছেলেমেয়ে ছাড়া আর কেহই ছিল না। আমাকে শীঘ্রই ধরিয়া লইয়া যাইবে ইহা পূর্বেই আমার স্ত্রীকে জ্ঞাত করাইয়াছিলাম। আমি ডি. এস. পি. সাহেবকে বলিয়া দুই-একখানা প্রয়োজনীয় কাপড় নেওয়ার জন্য বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলাম। স্ত্রীকে বলিলাম—আজ সত্য সত্যই পালে বাঘ পড়িয়াছে। আমি গ্রেপ্তার হইয়াছি। তুমি ঘাবড়াইও না। আল্লার উপর নির্ভর করিয়া সাহসের সহিত সংসারের কাজকর্ম করিয়া যাইবে। সে অবিচলিত চিত্তে আমার মুখের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ছোট ছেলেমেয়েগুলিকে একটু আদর করিয়া বাহিরে আসিলাম। আমার ওয়ালিদ সাহেব তখন জীবিত ছিলেন ও গ্রামের বাড়ীতে থাকিতেন। ভ্রাতাগণ সংসারের কাজকর্ম দেখিতেন। সুতরাং সংসার লইয়া আমার বিশেষ উদ্বেগ ছিল না। বাহিরে আসিয়া পুলিশের

নিকট আত্মসমর্পণ করিলাম। আমাকে একটা গলিপথে ডাকবাংলায় লইয়া গেল। হিলি তখন বগুড়া জেলার অধীন ছিল। ১৯৩২ সালে অক্টোবর মাসে বিপ্লবীদল হিলি স্টেশনে চড়াও করিয়া সরকারী টাকা লুণ্ঠন করিয়া লওয়ার পর, হিলি দিনাজপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়। ডাকবাংলায় পৌঁছিয় দেখি হিলির অন্যতম কংগ্রেস-কর্মী প্রতাপচন্দ্র মজুমদারকেও গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। মুহূর্ত মধ্যে আমাদের গ্রেপ্তারের সংবাদ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। দলে দলে লোক ডাকবাংলায় আসিয়া ভীড় জমাইতে লাগিল। পুলিশ কর্তৃপক্ষ অবস্থার গুরুত্ব বুঝিয়া আর ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করিলেন না। ট্যাক্সিযোগে আমাদিগকে ৭ মাইল দূরে পাঁচবিবি থানায় লইয়া গেলেন। পাঁচবিবির ডাঃ আবদুল কাদেরকে গ্রেপ্তার করিয়া আমাদের সঙ্গী করা হইল। তখন রমজান মাস। পাঁচবিবি আমার জামাই বাড়ী। জামাতা ফজলার রহমান ও আর কয়েকজন আত্মীয়স্বজন সন্ধ্যায় আমাদের আহারের ব্যবস্থা করার জন্য দারোগা সাহেবের অনুমতি চাহিলেন। দারোগা সাহেব বলিলেন—আমি মুর্গি জবাই করিয়া দিয়াছি এবং ইফ্‌তারের ব্যবস্থাও করিয়া দিয়াছি। আপনাদিগকে কিছুই করিতে হইবে না। দারোগা সাহেব যত্নের সহিত আমাদিগকে খাওয়াইয়া রাত্রের ট্রেনে বগুড়া পৌঁছাইয়া দিলেন। বগুড়া কতোয়ালী থানায় শেষরাত্রে সেহেরীর ব্যবস্থাও হইয়াছিল। পরদিন বেলা ৮টার সময় আমাদিগকে বগুড়া জেলে আবদ্ধ করা হইল। বগুড়ার কর্মীদের মধ্য স্বনামখ্যাত যতীন্দ্রমোহন রায়, সুরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত, সৈয়দ আবদুল করিম ও আরেফর রহমান শুধারামী প্রভৃতি বন্ধুদের সহিত মিলিয়া জেলখানায় আনন্দেই আমাদের দিনগুলি কাটিতে লাগিল। সপ্তাহ কাল পরে বিচারের জন্য আমাদিগকে এস. ডি. ও কোর্টে হাজির করা হইল। বিচারের ফলাফল জানিবার জন্য প্রায় সহস্রাধিক লোক এস. ডি. ও. কোর্টে হাজির হয়। এই বিপুল জনসমাগম দেখিয়া এস্. ডি ও. সাহেব বিচার স্থগিত রাখিয়া পুনরায় আমাদিগকে জেলে পাঠাইয়া দিলেন। তিন দিন পর জেলের মধ্যেই আমাদের বিচার আরম্ভ হইল।

পুলিশ ইন্‌স্‌পেক্টর আমাদের সঙ্গী আব্দুল কাদের সাহেবের ভগ্নীপতি। তিনি জেলখানায় বণ্ড দিয়া মুক্ত হওয়ার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। এস. ডি. ও. সাহেবও আমাদিগকে বহু উপদেশ দিলেন। কিন্তু কোন ফল হইল না। আমরা তাঁহাদের প্রস্তাব হাসিয়া উড়াইয়া দিলাম। অতপর বিচার প্রহসনে ৬ মাস হইতে ১ বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ড ও ২০০ টাকা হইতে ৫০০ টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা

করা হইল। দণ্ডাদেশ প্রদানের পর এস. ডি. ও. সাহেবের অনুরোধ রাখি নাই বলিয়া তিনি দুঃখ প্রকাশ করিলেন এবং আমাদিগকে প্রথম শ্রেণীর বন্দী করার জন্য সুপারিশ করিলেন। কয়েকদিন পর গভীর রাত্রে বগুড়া হইতে দমদমে স্পেশাল জেলে স্থানান্তরিত করার জন্য দরজা বন্ধ-করা ঘোড়ার গাড়ীতে করিয়া আমাদিগকে রেল-স্টেশনে আনা হইল। অত রাত্রেও দেখি বহুলোক স্টেশনে জমা হইয়া আল্লাহু আকবার ও বন্দেমাতরম ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত করিতেছে। আমরা ৮ জন কয়েদী মাত্র দুই জন পুলিশ কর্মচারীর তত্ত্বাবধানে কলিকাতা যাত্রা করিলাম। সান্তাহার স্টেশনে ট্রেনের অপেক্ষায় পায়চারি করিতেছি। পরিচিত কয়েকজন লোক আমাদিগকে দেখিয়া মনে করিলেন আমরা বুঝি মুক্তি পাইয়াছি। কেননা কয়েদীর-চিহ্ন পোশাক ও দড়িবেড়ী কিছুই আমাদের ছিল না। তাঁহাদিগকে বলিলাম—মুক্তি আমাদের হয় নাই। ক্ষুদ্র বন্দিশালা হইতে বৃহত্তর বন্দিশালায় চলিয়াছি। এখনকার মত রেলভ্রমণ এত কষ্টকর ছিল না। দার্জিলিং মেইল, আসাম মেইল, নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্রেস ও অনেকগুলি প্যাসেঞ্জার ট্রেন এই পথে যাতায়াত করিত। কলিকাতা যাত্রীদের যাতায়াতের সুবিধার জন্য বিশেষ শ্রেণী weekend রিটার্ণ টিকিটের প্রচলন ছিল। ২২৪ মাইল পথের যাতায়াত ভাড়া মাত্র ৫৷৴০ আনা। হিলি হইতে কলিকাতা দীর্ঘ রাস্তা অতিক্রম করিতে ৬ ঘণ্টা সময় লাগিত। আমরা আসাম মেইল ধরিয়া বেলা ১৷৷ সময় কলিকাতায় পৌঁছিলাম। মেইল ট্রেন দমদম্ স্টেশনে ধরে না বলিয়া কলিকাতায় যাইতে হইল। সঙ্গের পুলিশ কর্মচারীদ্বয়কে বলিলাম—অনেক দিন বন্দিজীবন যাপন করিতে হইবে সুতরাং কলিকাতার বন্ধুবান্ধবদিগের সহিত দেখা করার জন্য আপনাদের অনুমতি চাহিতেছি। সন্ধ্যার পূর্বেই আমরা আবার শিয়ালদহ স্টেশনে ফিরিয়া আসিব। তাহারা সম্মতি দিলে আমরা শহরের দিকে চলিয়া গেলাম। সারাদিন শহরে ঘুরিয়া ৪টার সময় ফিরিয়া লোকাল ট্রেনে দমদম্ পৌঁছিলাম। জেল গেটে বহুক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল। পূর্ব হইতেই আরও অনেক জন রাজবন্দী জেল গেটে থাকায় জেলের খাতায় তাহাদের রেজেস্টারি করিতে অনেক সময় লাগিল। প্রায় ২ ঘণ্টা অপেক্ষা করিয়া সূর্যাস্তের কিছু পূর্বে আমরা দমদম্ জেলে প্রবেশ করিলাম। দমদমে কোন জেলখানা ছিল না। কলিকাতা প্রেসিডেন্সি জেল ও আলিপুর সেন্ট্রাল জেল ২টি বৃহৎ বন্দিশালা ভর্তি হইয়া যাওয়ায় স্থানাভাববশতঃ দমদমের এই পরিত্যক্ত 'গান ফ্যাক্টরি'র চারিদিকে ডবল কাঁটা তারের বেড়া দিয়া অস্থায়ী জেল প্রস্তুত করা হইয়াছিল। বড় বড় ফ্যাক্টরি গৃহগুলিতে

লোহার খাটিয়া বিছাইয়া আমাদের থাকার ব্যবস্থা করা হইল। প্রায় ৮০০ রাজবন্দী হিন্দু-মুসলমান একত্রে ছিলাম। মেদিনীপুর জেলার হিন্দু বন্দী ও কুমিল্লা জেলার মুসলমানদের সংখ্যা অধিক ছিল। জেলখানায় প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, তখনও অনেকগুলি ঘর খালি পড়িয়া রহিয়াছে। কয়েক দিনের মধ্যেই দলে দলে বন্দী আসিয়া ঘরগুলি পূর্ণ করিয়া ফেলিল। দিনাজপুরের নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে মৌলানা আবদুল্লাহিল বাকী ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মৌলানা আবদুল্লাহিল কাফি, মৌলভী আবদুর রহমান সৈয়দী, নিশীথনাথ কুণ্ডু, বালুরঘাটের সুরেশরঞ্জন ও সুশীলরঞ্জন চ্যাটার্জী প্রমুখ ৫০।৬০ জন রাজবন্দী ছিলেন। কুমিল্লার জমিদার আস্‌রাফউদ্দীন চৌধুরী, উকিল হবিবর রহমান, মুখলেসার রহমান অসিমউদ্দীন মিঞা, তারু মিঞা আরও বহু ভদ্রলোক আমাদের সঙ্গী হইলেন। ফরিদপুরের স্বনামখ্যাত জমিদার মোয়াজ্জেম হোসেন চৌধুরী ওরফে লালমিঞা, বরিশাল ব্রজমোহন কলেজের পরিচালক সরলকুমার দত্ত, ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ (পরে পশ্চিম বাঙ্গালার মুখ্যমন্ত্রী) প্রমুখ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি, ১২ জন এম.বি ডাক্তার, ১৮ জন কলেজের প্রফেসার পাশাপাশি আস্তানা গাড়িয়াছিলাম। আমাদের বাসগৃহটি ছিল দ্বিতল। মেদিনীপুরের গোবিন্দবাবু, নিকুঞ্জ মাইতি এবং আরও অনেকে উপরের তলায় থাকিতেন। ব্যারিস্টার বীরেন্দ্রনাথ শাসমল ছিলেন মেদিনীপুরের মুকুটহীন রাজা। নড়াজলের রাজা নরেন্দ্রলাল খাঁ কংগ্রেস আন্দোলন করিতে গিয়া কারাবরণ করিয়াছিলেন। আমরা প্রথম শ্রেণীর বন্দী বলিয়া বিড়ি-সিগারেট পান-সুপারি দেওয়া হইত। কিছু-দিন পরে আবার শ্রেণীবিভাগ হইল। মাত্র ৫।৬ জনকে প্রথম শ্রেণীতে রাখিয়া আমাদিগকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে নামাইয়া দেওয়া হইল। কর্তাদের খেয়াল খুশিমত এই শ্রেণীবিভাগ করা হয়। দিনাজপুর মনহলীর জমিদার মনীষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নিশীথনাথ কুণ্ডু, মুরারিমোহন গোস্বামী, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ইত্যাদি বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ তৃতীয় শ্রেণীতে স্থান পাইলেন। আবার অনেক নামগোত্রহীন লোক দ্বিতীয় শ্রেণীতে রহিয়া গেলেন। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য লোহার খাট, তোশক, বিছানার চাদর, কম্বল, বালিশ, মশারি, জুতা-মোজা, তোয়ালে দেওয়া হইল। প্রতি সপ্তাহে কাপড় কাঁচা ও গায়ে-মাখা সাবান দেওয়া হইত। গোসলের জন্য হাউসে পানি সাপ্লাই হইত। আমরা সশ্রম কারাদণ্ডের কয়েদী বলিয়া চরকা ও তকলিতে সুতা কাটা আমাদের কাজ ছিল। চরকা ও তুলা কর্তৃপক্ষ সাপ্লাই দিতেন। সুতা তাঁহারা লইতেন। রেশনের চাউল, ডাইল ইত্যাদি আমরা দেখিয়া লইতাম।

খারাপ জিনিস ফেরত দেওয়া হইত। সপ্তাহে দুই দিন মাছ-মাংসের ব্যবস্থা ছিল। দুধ-দৈও মাঝে মাঝে দেওয়া হইত। সকালে চা-রুটি পাইতাম। আমাদের ইচ্ছানুযায়ী ৮০০ হিন্দু-মুসলমানের শ্রেণীবিভাগ উঠাইয়া দিয়া একসঙ্গে পাকের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। সাধারণ মুসলমান কয়েদীরা পাকের কাজ করিত। জনকয়েক মাড়োয়ারী ও কিছুসংখ্যক গোঁড়া হিন্দু স্বতন্ত্র পাকের ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছিলেন। প্রাচীর ও কাঁটা তারের বেষ্টনীর মধ্যে আবদ্ধ থাকা ব্যতীত আমাদের আর-কোন অসুবিধা ছিল না। যাঁহারা জেল আইন ভঙ্গ করিয়া উচ্ছৃঙ্খলতা দেখাইতেন তাঁহাদিগকে শাস্তি দেওয়া হইত। প্রসিদ্ধ নৃত্যশিল্পী মহারাজা বসুকে ডাণ্ডা বেড়ী দিয়া রাখিত। জেলের পাহারাদারগণ অধিকাংশ শিখসম্প্রদায়ভুক্ত ছিল। তাহাদের সহৃদয়তায় দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর জন্য নিষিদ্ধ বিড়ি-সিগারেট পাইতে আমাদের কোন অসুবিধা হইত না। সংবাদপত্রের মধ্যে সাপ্তাহিক 'সঞ্জীবনী' ও 'ইংলিশম্যান' পত্রিকা দেওয়া হইত। মৌলানা বাকী সাহেব বহু বই পুস্তক লইয়া গিয়াছিলেন।

বগুড়ার নিষ্ঠাবান কংগ্রেস-কর্ম্মী যতীন্দ্রমোহন রায় ও সুরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত 'এন্‌সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা' ভলুম সঙ্গে নিয়াছিলেন এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের নিকট বই-পুস্তক ছিল। আমি সুতা কাটিতে অভ্যস্ত ছিলাম না, দিনরাত পড়াশুনা লইয়া থাকিতাম। মৌলানা বাকী সাহেবের নিকট সকালে আরবী ও উর্দু পড়িতাম। যতীন বাবু ও প্রফুল্ল বাবুর নিকট ইংরেজী পড়িতাম। সত্য কথা বলিতে কি স্কুল কলেজে শিক্ষার বিশেষ কোন সুযোগ আমার হয় নাই। কারাগারেই সেই সুযোগ কিছু দিনের জন্য পাইয়াছিলাম। সন্ধ্যার পর আমাদের ক্লাস বসিত। প্রফেসারগণ অর্থ, সমাজনীতি ও জ্ঞানবিজ্ঞান প্রভৃতি বহু বিষয়ে মূল্যবান বক্তৃতা দিতেন। মৌলানা বাকী সাহেব কোরান ও ইসলামের শিক্ষা সম্বন্ধে ধারাবাহিক ব্যাখ্যা করিতেন। মৌলানা সাহেবের গভীর জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের জন্য সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিত। বন্দীদের সুবিধা-অসুবিধা অভাব-অভিযোগের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়। জেলে বহু সুপণ্ডিত ও প্রতিভাবান ব্যক্তি থাকিতে সকলে একবাক্যে মৌলানা সাহেবকে কমিটির সভাপতি নির্বাচন করেন। জেলে দীর্ঘ দিন তাঁহার পবিত্র সঙ্গলাভের সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল। তিনি আমার প্রায় সমবয়সী হইলেও কর্মজীবনে সহকর্মী শ্রদ্ধেয় নেতা ও কারাজীবনে শিক্ষাগুরুর আসন তাঁহাকে দিয়াছি। তাঁহার যাবতীয় ফাইফরমাস আঞ্জাম দিয়াছি। তাঁহার ব্যক্তিত্বের প্রভাব

কেহই উপেক্ষা করিতে পারিতেন না। আমি আবদুর রহমান সৈয়দী ও ডাঃ আবদুল কাদের, মৌলানা সাহেবের পাশাপাশি থাকিতাম। কেহই তাঁহার সেবা করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। হিন্দু-মুসলমান সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিত। আমরা তাঁহাকে লইয়া গর্ব করিতাম। ঈদলফেতর-এর নামাজ আমরা জেলেই পড়িয়া ছিলাম। মৌলানা সাহেব তখন দমদম্ জেলে আসেন নাই। আমি ইমাম হইয়া নামাজ পড়াইয়া ছিলাম। ঈদুজ্জোহা নামাজের সময় মৌলানা সাহেব ইমামতি করেন। ঈদের জন্য সরকারের তরফ হইতে আহারাদির বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। অনেকের আত্মীয়স্বজন পোলাও ও মিষ্টান্ন বাহির হইতে পাঠাইয়া দিতেন। আস্‌রাফউদ্দীন চৌধুরী সাহেবের শ্বশুর হাজী আবদুর রশিদ সাহেব কলিকাতা কর্পোরেশনের ডেপুটী একজিকিউটিভ অফিসার ছিলেন। পার্ক সার্কাসে তাঁহার বিরাট বাড়ী ছিল। ঈদের দিনে তিনি প্রচুর পরিমাণ পোলাও ও মাংস পাঠাইয়াছিলেন। লালমিঞা সাহেবের বন্ধুবান্ধবরা পর্য্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্য পাঠাইয়া ছিলেন। বৈকালে সবগুলি একত্র করিয়া বন্ধুদের দাওয়াৎ দেওয়া হইল। হিন্দু-মুসলমান প্রায় শতাধিক লোক মহানন্দে খাদ্যগুলি উদরস্থ করিয়া ফেলিলেন। বলা বাহুল্য হিন্দুর নিষিদ্ধ মাংস যথেষ্ট পরিমাণ ছিল কিন্তু সে সম্বন্ধে কেহই কোন প্রশ্ন তুলিলেন না। কয়েক দিন পর সংবাদ পাওয়া গেল লালমিঞা সাহেবের একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছে। আমরা তাঁহাকে গিয়া পাকড়াও করিলাম। মিষ্টি মুখ করাইতে হইবে। তিনিও আনন্দের সঙ্গে রাজী হইলেন এবং ভুরিভোজে আপ্যায়িত করিলেন। লালমিঞা তখন যুবক, মাথায় পরিপাটী ঝাঁকড়া চুল সুন্দর যুবজনোচিত প্রেমিক, প্রেমিক চেহারা দেখিলেই ভালবাসিতে ইচ্ছা করে। ধনী জমিদার হইলেও তাঁহার কোন অহঙ্কার ছিল না। সকলের সঙ্গে সমানভাবে মিশিতেন। তিনি আমার অপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন। দীর্ঘ দিন একত্র বাস ও কর্মজীবনের সঙ্গী হেতু আমাদের মধ্যে প্রগাঢ় প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল। পরবর্তী কালে তিনি আবদুল্লা জহিরউদ্দীন নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। পাকিস্তান সরকারের মন্ত্রী হিসাবে দায়িত্বপূর্ণ পদে অবস্থানের সময় আকস্মিকভাবে তিনি ইন্তেকাল করেন। তাহার অকাল মৃত্যুতে আত্মীয়বিয়োগ-বেদনা অনুভব করিয়াছি।

কি কারণে জানি না হঠাৎ একদিন শিখনেতা বাবা গুরুদিৎ সিংকে দমদম্ জেলে আনয়ন করা হয়। এই বিপ্লবী পুরুষ ১৯১৪ সালে তাঁহার দলবল সহ 'কোমা

গাটামারু' নামক এক জাপানী জাহাজ ভাড়া করিয়া কোন গোপন উদ্দেশ্যে ক্যানাডা যাত্রা করেন। ক্যানাডার কর্তৃপক্ষ তাঁহার অভিসন্ধি পূর্বেই জ্ঞাত হওয়ায় জাহাজখানা 'ভাঙ্কুভার' পৌঁছিলে সরকার পক্ষ তাঁহাদিগকে অবতরণ করিতে বাধা দেন। গুলিগোলার ভয় দেখাইলে জাহাজখানা কলিকাতায় ফিরিয়া আসে। কলকাতায় তাঁহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হয়। মাত্র ৪ দিন তিনি আমাদের সঙ্গে ছিলেন পরে অন্য কোন জেলে তাঁহাকে স্থানান্তরিত করা হয়। এই শুভ্রকেশ শুভ্রশ্মশ্রু সৌম্যদর্শন বৃদ্ধ তঁ হার দীর্ঘ কর্মজীবনের রোমাঞ্চকর কাহিনী আমাদিগকে শুনাইতেন। তিনি বলিলেন —সরকারী অতিথিশালায় আমার যৌবন কাটিয়াছে। এখন আমি বৃদ্ধ তবুও সরকার আমাকে ছাড়িতেছে না। একটু থামিয়া তিনি দৃঢ়কণ্ঠে বললেন—ভারতের স্বাধীনতা একদিন আসিবেই। আমি হয়তো উহা দেখিয়া যাইতে পারিব না কিন্তু তাহাতে আমার কোন আপসোস নাই। আমার কর্তব্য আমি করিয়াছি। আপনারা স্বাধীন ভারতের সম্মানিত নাগরিকের মর্যাদা লাভ করুন ইহাই আমার একান্ত কাম্য।

হঠাৎ একদিন বিকট শব্দে ঘণ্টা বাজিতে লাগিল। চারিদিকে হল্লা শুরু হইল। দলে দলে সশস্ত্র পুলিশ জেলে আসিয়া ঢুকিতে লাগিল। শুনিলাম পাগলা ঘণ্টা বাজিতেছে। ব্যাপার কি কিছুই বুঝিলাম না। পরে জানিলাম জেলে কোন গণ্ডোগোল উপস্থিত হইলে ঘণ্টা বাজাইয়া পুলিশ ডাকা হয়। কিন্তু এখানে তো কোন গোণ্ডগোল হয় নাই তবু পাগলা ঘণ্টি কেন বাজিতেছে? জানিয়া আস্বস্ত হইলাম মধ্যে মধ্যে এই রূপ রিহারসাল দেওয়া হয়। ঘণ্টা বাজিলেই পুলিশ যেখানেই থাকুক ছুটিয়া তাহাকে আসিতেই হইবে। বন্দীদের মধ্যে অধিকাংশ ভদ্রলোক ধীর, স্থীর ও শান্ত প্রকৃতির ছিলেন। কতকগুলি যুবক জেলের শৃংখলা মানিতে চাহিত না। উচ্ছৃঙ্খল যুবকদিগকে এখান হইতে প্রেসিডেন্সী জেলে স্থানান্তরিত করা হইত। প্রেসিডেন্সী জেলে বন্দীদের শাস্তি দানের বহু রকম ব্যবস্থা ছিল। কুখ্যাত প্রেসিডেন্সী জেলের কথা আমরা সকলেই অবগত ছিলাম।

মৌলানা আবদুল্লাহিল কাফি অসুস্থ হইয়া পড়ায় তাঁহাকে আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে পাঠান হয়। ইনি বিখ্যাত সাহিত্যিক ও তেজস্বী বক্তা ছিলেন। আরবী, পারশী, উর্দু, ইংরেজী ও বাংলা ভাষায় তাঁহার সমান বুৎপত্তি ছিল। 'তরজমাহুল হাদিস' পত্রিকার তিনি সম্পাদক ছিলেন। ১৯২৬ সালে কলিকাতা হইতে 'সত্যাগ্রহী' নামক উচ্চাংগের একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা তিনি প্রকাশ করেন। 'দৈনিক সেবক' ও উর্দু পত্রিকা 'জমানার' তিনি সহকারী সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার লিখিত কয়েকটি মূল্যবান গ্রন্থ রহিয়াছে।

সাহিত্যসাধনার কৃতিত্বের জন্য প্রেসিডেন্ট পুরস্কার তিনি লাভ করেন। এই অকৃতদার জ্ঞানতপস্বী সারা জীবন জ্ঞানের সাধনায় অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন। আবদুর রহমান সৈয়দী 'সত্যাগ্রহী' পত্রিকার অন্যতম পরিচালক ও সহকারী সম্পাদকরূপে কার্য করিতেন। প্রথিতযশা কবি, সাহিত্যিক খাঁন মোহম্মাদ মঈনউদ্দীন সৈয়দী সাহেবের সহকারী রূপে কার্য করিতেন। ইহাদের চেষ্টায় সত্যাগ্রহী যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিল। বালুরঘাটের কুমুদকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় নামক একটি সুদর্শন তরুণ যুবক আমাকে দাদা বলিয়া সম্বোধন করিত। আমিও তাহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতাম। জেলের এক প্রৌঢ় বিহারী জমাদার আমাদের তত্ত্বাবধান করিত। কুমুদের সহিতও মেদিনীপুরের ভাস্করচন্দ্র মহাপাত্র নামক আর-এক তরুণের সঙ্গে তাঁহার বেশ ভাব জন্মিয়াছিল। আমাদের সকলকেই সে সম্ভ্রমের সহিত দেখিত। আমাদের অসুবিধা যতটা সম্ভব দূর করিতে চেষ্টা করিত। জেলের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া আমাদের ইচ্ছামত ঘরে তালা লাগাইত ও প্রত্যুষে খুলিয়া দিত। অবসরমত কত সুখদুঃখের গল্প তাহার সহিত হইত। কুমুদের সহিত আলাপ জমিত ভাল। কুমুদ বলিত—দাদা ঠাকুর, বাড়ী যান নাই কত দিন হইতে? দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিত—ভাইয়া এক বরস সে কুছ উপর হোগা।—আপনি তো কাজ ভালো করেন নি দাদাঠাকুর, দিদিমনি কো বহুৎ তখলিফ আপনে দেতে হ্যায়। উনকো দেখনে কে শওখ আপকি নাহি হোতা? গোঁফের ফাঁক দিয়া বৃদ্ধের ঈষৎ করুণ হাসির ঝিলিক দেখা যাইত। শীঘ্রই ছুটি লইয়া সে দেশে যাইবে বলিয়া আত্মতৃপ্তি লাভ করিত। আমাদের মুক্তির দিনে এই স্নেহপ্রবণ বৃদ্ধ অশ্রুসজল নেত্রে আমাদিগকে বিদায় দিয়াছিল। বর্ধমানের আবুল হায়াত সাহেব আমাদের সমবয়সী ও হাস্যরসিক আমুদে লোক ছিলেন। ইনি চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনার খাঁন বাহাদুর আবদুল মোমেন সাহেবের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। এক অভিজাত পরিবারে তাঁহার জন্ম। বর্ধমানের সম্ভ্রান্ত মুসলমানগণ নিজেদের আশরাফ বলিয়া দাবী করেন। অন্যেরা আশরাফ (নিচ) বলিয়া কথিত হয়। হায়াৎ সাহেব আমাদিগকে এক গল্প শুনাইলেন। এক আতরাফ যুবক আশরাফ হওয়ার সংকল্প করিয়া নিজেকে সৈয়দ বলিয়া প্রকাশ করিত। সে বলিত—

আব্বা মেরা থা জোলহা
আম্মা মেরী দরজী
দোনও মিলকে আব হাম সৈয়দ
ইয়ে খোদাকা মর্জি।

এইরূপ মজার গল্প বলিয়া তিনি আমাদিগকে আনন্দ দিতেন। আমাদের দীর্ঘ কারাবাস ইহার সংস্পর্শে আনন্দেই কাটিয়াছিল। অনেকের ওজন বাড়িয়া গিয়াছিল। আমার নিজের ওজন ৫ পাউণ্ড বাড়িয়াছিল। দেখিতে দেখিতে কারা জীবনের মেয়াদ শেষ হইয়া আসিল। কয়েক দিন পরপর সঙ্গীরা মুক্তি পাইতে লাগল। আমাদের সঙ্গে অনেকগুলি মহিলা বন্দিনীও ছিলেন। তাঁহারা পৃথক ওয়ার্ডে থাকিতেন। কুমুদ একদিন ছুটিয়া আসিয়া আমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল —দাদা আজ আমার মুক্তির দিন। আপনাদিগকে ছাড়িয়া যাইতেছি বলিয়া দুঃখ হইতেছে। আবার পিতামাতাকে দেখিতে পাইব বলিয়া আনন্দ পাইতেছি। আমি খবর শুনিয়া যুগপৎ আনন্দ ও দুঃখিত হইলাম। কুমুদের অদর্শনে কষ্ট পাইব ভাবিয়া হৃদয় ভারাক্রান্ত হইল। কিন্তু উপায় নাই। যথাসময়ে আলিঙ্গন দিয়া অশ্রুসজল নেত্রে তাহাকে বিদায় দিলাম। এইবার আমার পালা। ১৩ই সেপ্টেম্বর ৭ মাস ২৫ দিন কারাগারে অতিবাহিত করিয়া মুক্তি পাইলাম। বন্ধুদের সজল চক্ষু, নিজের ভারাক্রান্ত হৃদয় ও মুক্তির আনন্দ একত্রে এক নূতন ভাবের ব্যঞ্জনা লইয়া জেল-গেটের বাহিরে আসিলাম। মৌলানা বাকী সাহেব গলা জড়াইয়া ধরিয়াছিলেন। অবশ্য কিছুদিন পরেই তাঁহার মুক্তির সম্ভাবনা ছিল, বন্ধু সৈয়দী ও ডাঃ আবদুল কাদের তাঁহার সঙ্গী ছিলেন বলিয়া কোন অসুবিধা হয় নাই।

কলিকাতায় পৌঁছিয়া কয়েকজন বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে দেখা করিতে গেলাম। কলিকাতা ক্লিনিক ও রিসার্চ এসোসিয়েশনের সুবিখ্যাত ডাঃ জে. এম. দাশগুপ্ত মহাশয়ের সঙ্গে তাঁহার অফিসে গিয়া দেখা করিলাম। মাত্র কয়েক দিন হইল তিনি আলীপুর সেন্ট্রাল জেল হইতে মুক্তি পাইয়াছেন। আমাকে দেখিয়া তিনি আলিঙ্গন করিলেন এবং সঙ্গে করিয়া বাড়ী লইয়া গেলেন। আমার আর সেদিন বাড়ী যাওয়া হইল না। তাঁহার একান্ত অনুরোধে ১ দিনের জন্য আতিথ্য গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলাম। টেবিলের উপরে রঙ্গিন কালিতে মুদ্রিত একখানা নিমন্ত্রণপত্র দেখিয়া পড়িতেছিলাম। ডাঃ দাশগুপ্ত বলিলেন—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন উৎসবের নিমন্ত্রণপত্র, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ভাষণ দিবেন। আমার যাওয়া হইবে না। আমার পরিবর্ত্তে আপনি যান। আমি পত্র দিতেছি। আপনার ভিতরে প্রবেশের কোন অসুবিধা হইবে না।

রবীন্দ্রনাথ

জগৎবরেণ্য মহাকবিকে আমি দেখি নাই। কয়েক বার ইচ্ছা করিয়াও সুযোগ পাই নাই। আমি তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত হইয়া কলেজ স্কোয়ারে হাজির হইলাম কিন্তু অবস্থা দেখিয়া চক্ষু স্থির। হেয়ার স্কুল হইতে কলুটোলার মোড় পর্যন্ত লোকে লোকারণ্য। সিনেট হাউসে প্রবেশ করিবার উপায় নাই। সদর দরজা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। বিশ্বকবিকে দেখিতে পাইব না ভাবিয়া হতাশ হইলাম। তবুও ভীড় ঠেলিয়া ক্রমশঃ দরজার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। আশা যদি কোন সুযোগ মিলিয়া যায়। হঠাৎ দেখি একটি যুবক আমার দিকে তাকাইয়া উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিতেছে। অত্যধিক ভীড়ের জন্য অগ্রসর হইতে পারিতেছি না দেখিয়া সে নিজেই আসিয়া ভীড় সরাইয়া আমাকে দরজার নিকট লইয়া গেল এবং দরজায় করাঘাত করিতে লাগিল। ইনি আমার কর্মজীবনের সঙ্গী নৃত্যশিল্পী মহারাজ বসু। আমাকে লইয়া যুবকটি ভিতরে প্রবেশ করিল। বিশাল হল ঘরটিতে তিল ধারণের স্থান নাই। বিশ্বকবির নিকটে মহারাজের জনৈক বন্ধু বসিয়াছিলেন। তাঁহাকে উঠাইয়া তাঁহার স্থানে আমাকে বসাইয়া দিল। বিশ্বকবির পার্শ্বে বসিতে পাইয়া নিজেকে সৌভাগ্যবান বলিয়া মনে করিলাম ও মহারাজকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিলাম। কবি তখন ভাষণ দিতেছিলেন। তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় উজ্জ্বল দেহকান্তি, আবক্ষ-লম্বমান শুভ্র শ্মশ্রু, শুভ্র নাতিদীর্ঘ কেশ, পরণে পাজামা প্রায় পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত লম্বমান, উজ্জ্বল কৃষ্ণ বর্ণের চাপকান। মাথায় কালো টুপী দেখিয়া মনে হইতেছিল একজন জবরদস্ত মৌলানা বক্তৃতা করিতেছেন। জগৎবিখ্যাত মহাকবি হাফেজ ও সাদীর কবর দর্শনের জন্য ইনি পারস্যের সিরাজনগরে গিয়াছিলেন। পৃথিবীর বহু দেশ তিনি দেখিয়াছেন। জনৈক বিদেশী মুসলমান কবিকে দেখিয়া প্রশ্ন করিয়াছিলেন, হিন্দুস্থানী মৌলানা নামাজ পড়েন না কেন? একজন উত্তরে বলেন—ইনি মুসলমান নহেন হিন্দু। অনেকেই নাকি তাহা বিশ্বাস করেন নাই। কবি তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ চমৎকার বাঙ্গলাভাষায় বক্তৃতা করিতেছিলেন। মানুষ তন্ময় হইয়া উহা শুনিতেছিল। আমি তাঁহার প্রতিভাদীপ্ত মুখের দিকে অনিমেষ-লোচনে তাকাইয়া কত কথা ভাবিতেছিলাম, বৃদ্ধ বয়সে মানুষ যে এত সুন্দর হয় তাঁহাকে না দেখিলে বিশ্বাস করা যায় না। সভা শেষ হইলে ভীড় এড়াইবার জন্য একটি গুপ্ত দ্বার দিয়া তাঁহাকে বিদায় দেওয়া হইবে ইহা মহারাজের নিকট শুনিয়া-

ছিলাম। পূর্বেই আমি তাঁহার প্রত্যাগমন পথের পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইলাম। উদ্দেশ্য কিছু বাক্যালাপ করা কিন্তু সে সুযোগ মিলিল না। তাঁহাকে সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানাইলাম। তিনি স্মিতহাস্যে হাত বাড়াইতেই আচমকা কয়েক জন কলেজের ছাত্রী আসিয়া আমাদের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করিয়া দিল। কবি চলিয়া গেলেন। ইহাই বিশ্বকবিকে আমার প্রথম ও শেষ দর্শন। সন্ধ্যায় বাসায় ফিরিলাম। দমদম্ হইতে হিলি পর্যন্ত পাস ছিল। রাত্রে ভুরিভোজের পর গৃহস্বামীর নিকট বিদায় লইয়া দমদম্ স্টেশনে ট্রেনে চাপিলাম। পূর্বেই আমার আগমন-সংবাদ হিলি পৌঁছিয়াছিল। স্টেশনে নামিয়া দেখি বহু লোক ফলের মালা লইয়া আমার অভ্যর্থনার জন্য দাঁড়াইয়া আছে। আমার বৃদ্ধ পিতা আমার দিকে অশ্রুসজলনেত্রে তাকাইয়া আছেন। তাঁহার কদমবুছি করিলাম। তিনি বুকে জড়াইয়া গায়ে মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন। আত্মীয়স্বজন জনতার সঙ্গে মিশিয়া শোভাযাত্রা করিয়া বাড়ীতে লইয়া গেলেন। দীর্ঘদিন পরিবার পরিজনদের সহিত মিশিতে পারিয়া আল্লাহ্‌তলার শোকোর গোজারী করিলাম।

হিলিস্টিশন ডাকাতি

আমার জেল হইতে মুক্ত হইবার একমাস পরে অক্টোবর মাসে একটি গুরুতর ঘটনা ঘটে। একদিন বাড়ীর বৈঠকখানার বারান্দায় বসিয়া আছি, একটি অপরিচিত লোক 'কাপড়ে মোড়া' একটা বাক্স আমাকে দিয়া বলিল—আপনার কোন বন্ধু মাধব রায়ের নিকট ইহা পৌঁছাইয়া দিতে হইবে। বাক্সটি খুব সাবধানে রাখিবেন অন্য কাহাকেও দিবেন না—এ কথা বলিয়াই লোকটি তৎক্ষণাৎ চলিয়া গেল। কি পাঠাইল, কি জিনিস আছে কিছুই বুঝিলাম না, সন্দিগ্ধ মনে ছোট বাক্সটি বাড়ীর ভিতরে লইয়া গেলাম।

সন্দেহ নিরসনের জন্য বাক্সটি খুলিয়া যাহা দেখিলাম উহাতে আমার চক্ষু স্থির হইল, আতঙ্কে বুক কাঁপিয়া উঠিল। টোটা ও কয়েকটি রিভলভার উহার মধ্যে রহিয়াছে। এতদিন ধরিয়া কংগ্রেস করিতেছি কিন্তু এই মারাত্মক অস্ত্রের সহিত পরিচিত নহি। বিপ্লবীদের সহিত কোন সংস্রব আমাদের ছিল না। চিন্তার আর অবসর নাই। আমি বাক্সটি কাপড়ে জড়াইয়া মাধব রায়ের হাতে দিয়া আসিলাম। মাধব আমার প্রতিবেশী। বয়ঃকনিষ্ঠ আমাকে দাদা বলিয়া ডাকে। সে যে বিপ্লবী দলভুক্ত ঘুণাক্ষরেও ইহা জানিতে পারি নাই। হঠাৎ একদিন সকালে শুনিতে পাইলাম রেল-স্টেশনে ডাকাতি হইয়াছে। গভীর রাত্রে ডাকাতগণ রিভলভার দেখাইয়া কয়েক

হাজার টাকা লইয়া চম্পট দিয়াছে। স্টেশন মাস্টার টেলিফোন-যোগে কর্তৃপক্ষকে দুঃসংবাদ জানাইয়াছে। স্টেশনে গিয়া দেখি সিন্দুক আলমারী খোলা, কাগজপত্র চারিদিকে ছড়ান রহিয়াছে। হিলি তখন বগুড়া জেলার পাঁচবিবি থানার অধীন ছিল। থানা অফিসার তদন্তে আসিবার পূর্বেই বালুরঘাটের থানা অফিসার এস. ডি. ও. সহ সদলবলে আসিয়া পৌঁছিয়াছিলেন। পুলিশ তৎপর হইয়া কয়েক জন ডাকাতকে পরদিন রাস্তায় ধরিয়া ফেলিয়া ছিল। এই ঘটনার সঙ্গে আমার জেলের সঙ্গী ডাঃ আবদুল কাদের ধরা পড়েন। দিনাজপুর ট্রাইবিউনাল কোর্টের বিচারে ৪ জনের ফাঁসী ও ১১ জন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হন। ডাঃ আবদুল কাদের কিছুদিন আন্দামান দণ্ড ভোগ করিয়া অনশন ধর্মঘট করিয়া মুক্তি পান। এই অকৃতদার ডাঃ সাহেব নিজের আদর্শে দৃঢ় থাকিয়া কাজ করিয়া যাইতেছেন। একাধিক বার তাঁহাকে কারাবরণ করিতে হইয়াছে। পাঁচবিবির অন্যতম কর্মী নাসিরউদ্দীন মণ্ডল দেশ ও জাতির জন্য যথেষ্ট ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন। বগুড়া টাউনে একটা বিরাট সভায় বক্তৃতা করিতে গিয়া তিনি মৃত্যু বরণ করেন।

১৯৩৩ সাল: কলিকাতা মেডিকেল কলেজ

বেনিয়াপুকুর রোডের একটি বাড়ীতে নিখিল বঙ্গ কৃষকপ্রজা সমিতির এক অধিবেশন চলিতেছে, নেতৃস্থানীয় প্রায় সকলেই যোগদান করিয়াছেন। মৌলানা বাকী সাহেব ও আমি উপস্থিত আছি। আমার দেশের পরিচিত জনৈক ব্যক্তির আহ্বানে বাহিরে আসিয়া দেখিলাম কয়েক জন লোক এক রুগ্ণ ব্যক্তিকে লইয়া আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। তাহারা রুগীকে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করাইতে আমার সাহায্য চাহিতেছে। রুগীটি দূর সম্পর্কে আমার আত্মীয়, বেশ অবস্থাপন্ন লোক। তাহার নিতম্বে মারাত্মক একটি ক্ষতের সৃষ্টি হইয়াছে। বিপন্নের সাহায্য করা কর্তব্য মনে করিয়া তাহাকে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে লইয়া গেলাম। ডাঃ সাহেব রুগী দেখিয়া ভর্তি করিয়া লইতে অস্বীকার করিলেন। অনেক অনুরোধ করিলাম কিন্তু ফল হইল না। এক ভদ্রলোক পরামর্শ দিলেন টাকা খরচ করুন। ডাক্তারকে বাসায় 'কল' দিয়া ১৬ টাকা ভিজিট দেন। দেখিবেন ভর্তি হইয়া যাইবে। পরদিন ডাক্তার সাহেবের বাসায় গিয়া রুগী দেখিতে বলিলাম। তিনি বলিলেন—যদি রুগী ভর্তির উদ্দেশ্যে আমাকে কল দেন তাহা হইলে কোন ফল হইবে না। কেননা রুগী আমি ভর্তি করিতে পারিব না। আপনারা 'ক্যাম্বেল'

হাসপাতালে যান। নিরুপায় হইয়া সৈয়দ জালালউদ্দীন হাসেমীর নিকট গিয়া তাঁহার পরামর্শ চাহিলাম। হাসেমী সাহেব কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার ও ব্যবস্থাপকসভার ডেপুটি স্পিকার ছিলেন। তিনি সমস্ত শুনিয়া ক্যাম্বেল হাসপাতালের কর্তৃপক্ষের নিকট একখানা পত্র দিলেন। রুগী ও পত্রখানা লইয়া ক্যাম্বেলে গিয়া ডাক্তার (ইনচার্জ) সাহেবকে দিলাম। তিনি উহা পাঠ করিয়া রুগী দেখিলেন। আমাকে বললেন—হাসেমী সাহেব যখন পত্র দিয়াছেন তখন আমি আপনার রুগীকে ভর্তি করিয়া লইতে পারি কিন্তু এ রোগের চিকিৎসা এখানে হইবে না। মেডিকেল কলেজেই যাইতে হইবে। আমি পত্র দিতেছি আপনারা আবার সেখানে যান। কি আর করি যথেষ্ট বিরক্তি বোধ করিলেও তাঁহার পত্রখানা লইয়া আবার মেডিকেল কলেজে গেলাম। এবার ডাক্তার সাহেব রাগান্বিত হইয়া বার বার কেন তাঁহাকে বিরক্ত করিতেছি বলিয়া উঠিয়া চলিয়া গেলেন। আমারও বিরক্তি তখন চরমে উঠিল। জনাব এ. কে. ফজলুল হক সাহেব তখন প্রধানমন্ত্রী। আমি সোজা ঝাউতালা রোডে তাঁহার বাড়ীতে গিয়া উঠিলাম। তাঁহার সহিত দেখা হইল না। তাঁহার ভাগিনেয় নান্নামিঞা (সৈয়দ আজিজুল হক বি.এল.) সাহেবকে সব কথা বলিলাম। তিনি বলিলেন—স্বাস্থ্যমন্ত্রী তমিজউদ্দীন খাঁ আপনার সুপরিচিত। ক্যাম্বেলের সামনে গোমেশ লেনে তিনি থাকেন। তাঁহার সহিত দেখা করুন। তাঁহার কথামত তমিজউদ্দীন সাহেবের বাড়ীতে আসিয়া তাঁহার সেক্রেটারি সাহেবের সঙ্গে দেখা করিয়া সমস্ত কথা বলিলাম এবং মন্ত্রী সাহেবের সহিত সাক্ষাতের ইচ্ছা জানাইলাম। সেক্রেটারি সাহেব বলিলেন—তিনি বাতব্যাধিতে অচল, উপর তলা হইতে নীচে নামিতে পারেন না। সুতরাং দেখা হওয়া সম্ভব নহে। আমি বলিলাম - দেখা আমাকে করিতেই হইবে। আমি স্লিপ দিতেছি, আপনি উহা উপরে পাঠাইয়া দিন, এমন সময়ে টেলিফোন বজিয়া উঠিল। সেক্রেটারি সাহেব টেলিফোন ধরিয়া আমাকে বলিলেন—অপেক্ষা করুন দেখা হইতে পারে। গভর্ণর সাহেবের ডাক আসিয়াছে। আমি উদ্বিগ্ন হৃদয়ে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। একটু পরেই দেখি দুইজন মানুষের কাঁধে হাত রাখিয়া তিনি নামিয়া আসিতেছেন। আমি সিড়ির মুখে দাঁড়াইয়া 'আস্‌সালামু আলায়কুম' বলিলাম। তিনি সালামের জওয়াব দিয়া বলিলেন—কি ভাই হঠাৎ আপনি? আমি আমার দুর্গতির কথা বলিলাম। ২০০ শত মাইল দূর মফঃস্বল হইতে রুগী আসিয়া কলিকাতার সর্বোচ্চ চিকিৎসালয়ে যদি চিকিৎসার সুযোগ না পায় তাহা হইলে সেটা কত বড় দুঃখ ও

মনঃকষ্টের কারণ হইতে পারে চিন্তা করুন। আজ তিন দিন ধরিয়া আমাকে নাজেহাল হইতে হইয়াছে। তিনি অফিসে বসিয়া ফোন ধরিয়া স্বাস্থ্যবিভাগের সেক্রেটারিকে ডাকিলেন। সেক্রেটারি অনুপস্থিত থাকায় তাঁহাকে পাওয়া গেল না। 'মন্ত্রী সাহেব আমাকে অন্য সময় আসিতে বলিলেন। আমি বলিলাম—আপনি অসুস্থ মানুষ, বার বার বিরক্ত করা উচিত হইবে না। আমাকে একটু লিখিয়া দিলে বাসায় তাহার সহিত দেখা করিতাম। তিনি একটুকরা কাগজে লিখিলেন "আমার সহকর্মী মৌলভী আফতাবউদ্দীন চৌধুরী একটি রুগী লইয়া অসুবিধায় পড়িয়াছেন। রুগীটির ভর্তির ব্যবস্থা করিবেন। ঠিকানা লেখা ছিল রায়বাহাদুর হিরণলাল মুখার্জী, সেক্রেটারি হেলথ ডিপার্টমেণ্ট, তালতলা লেন। আমি সন্ধ্যার পূর্বেই তাঁহার বাড়ী গিয়া খোঁজ লইয়া জানিলাম তখনও তিনি অফিস হইতে ফেরেন নাই। সন্ধ্যার পর দেখা হইতে পারে। আমি নিকটে এক বন্ধুর বাসায় মগরেবের নামাজ পড়িয়া পুনরায় তাঁহার বাসায় আসিলাম। তিনি তখন একটি কামরায় বসিয়া জনৈক ভদ্রলোকের সহিত আলাপ করিতেছিলেন। আমি তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইতেই আমাকে দেখিয়া অতি কর্কশ ভাষায় বলিলেন—তুমি এখানে কেন? বেরও এখান থেকে? যাও শীগগির এখান থেকে চলে যাও। আমি তাঁহার ব্যবহারে অবাক হইয়া গেলাম। বলিলাম—শুনুন আমার কথা। তিনি আরও উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন, বলিলেন—কোন কথা শুনতে চাই না, এই মুহূর্তে বেরিয়ে যাও। তাঁহার দুর্ব্যবহারে আমার মন ও মেজাজ খারাপ হইয়া গেল। উত্তেজিত হইয়া বলিলাম—আমি তমিজউদ্দীন সাহেবের পত্র নিয়ে এসেছি, আপনি কিছু না শুনেই আমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছেন কেন? তিনি বলিলেন—তমিজউদ্দীন কে? বলিলাম—আপনার মনিব, বিভাগীয় মন্ত্রী। তখন তিনি যেন আকাশ হইতে পড়িলেন। তাঁহার রায় বাহাদুরী মেজাজের পরিবর্তন হইল। হাত বাড়াইয়া স্লিপ লইলেন। একনজরে দেখিয়া লজ্জিত হইয়া বলিলেন—আমি ভুল করেছি। বুড়ো বয়সে সারাদিন আফিসে খেটে ক্লান্ত শরীরে বাসায় আসি। চাকুরিপ্রার্থী উমেদারির দল এসে বিরক্ত করে। আমিও ভেবেছিলুম আপনিও বুঝি ঐ দলের কেউ হবেন। দয়া করে বসুন মনে কিছু করবেন না। আমি অত্যন্ত লজ্জিত। তৎক্ষণাৎ চা ও নাস্তার ব্যবস্থা হইল। তিনি সরকারী চিঠির কাগজে লিখিলেন: ডাক্তার মোহাম্মদ আমিন—মাননীয় মন্ত্রী তমিজউদ্দীন সাহেবের স্লিপ দেখে এই রুগীকে অবিলম্বে ভর্তি করে নিও। স্লিপ ও চিঠিখানি সরকারী খামে ভরিয়া

আমার হাতে দিয়া বলিলেন—যান আর কোন অসুবিধা হবে না। পর দিন সকালে রুগী লইয়া আবার মেডিকেল কলেজে গেলাম। ডাক্তার সাহেব বিষ নজরে আমাকে দেখিয়া কিছু বলিবার পূর্বেই চিঠিখানা তাঁহার হাতে দিলাম। তিনি সরকারী খাম দেখিয়া তাড়াতাড়ি খুলিয়া চিঠিখানি পড়িয়া উঠিয়া গেলেন। আমি তাঁহার প্রত্যাগমনের আশায় বসিয়া রহিলাম। প্রায় ১৫ মিনিট পর তিনি ফিরিয়া আসিয়া আমাকে বলিলেন—বসে আছেন কেন? আপনার রুগী ভর্তি করা হয়েছে। একথা বলিয়াই তিনি আবার চলিয়া গেলেন। বুঝিলাম আমার সম্মুখে কোন কথা বলিতে লজ্জা হইতেছে। বাহিরে আসিয়া দেখি সত্যই রুগীকে ভর্তি করিয়া লওয়া হইয়াছে। দেশের সর্বপ্রধান চিকিৎসালয়ে সাধারণ লোকের চিকিৎসার সুযোগ গ্রহণ করা কত কঠিন এই ঘটনাটি তাহার প্রমাণ। এখন এই অবস্থার কতটা পরিবর্তন হইয়াছে ভুক্তভুগীরা তাহা অবগত আছেন। ১৯৩৩ সালের ডিসেম্বর মাসে জাতীয় সমিতির অধিবেশন কলিকাতায় বসিয়াছিল। চট্টগ্রামের বিখ্যাত ব্যারিস্টার কংগ্রেস-নেতা দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের ইংরেজ পত্নী নেলী গুপ্তা সেদিন অধিবেশনে সভায় নেতৃত্ব করিয়াছিলেন। তখন দেশে অত্যন্ত অশান্তি চলিতেছিল। বিপ্লবী তৎপরতা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। সহস্র সহস্র কর্মী ও নেতাগণ জেলে আবদ্ধ ছিলেন।

(৪৩)

১৯৩৪ সাল ভারতীয় ব্যবস্থাপকসভার নির্বাচন

রাজসাহী বিভাগ হইতে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপকসভায় একজন সভ্য নির্বাচিত হইবেন। মালদহের ব্যারিস্টার কবিরউদ্দীন আহম্মদ (কে. আহম্মদ) পর পর তিন বার বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হইয়া আসিতেছিলেন। ইলেকশনের পূর্বে তিনি মেম্বর হইয়া কি কি সৎকার্য করিয়াছেন তাঁহার এক দীর্ঘ ফিরিস্তি দিয়া এক মহাভারত রচনা করিতেন। টাইটেল পেজে বিলাতী পোশাক-পরা তাঁহার বিরাট ফটো মুদ্রিত থাকিত। ব্যারিস্টারি কোন দিন তিনি করিয়াছেন বলিয়া শুনি নাই। তিনি দীর্ঘ দিন মেম্বারী করিলেও ভোটদাতাগণের অনেকে কখনও তাঁহাকে দেখেন নাই। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপকসভায় একজন উপযুক্ত দেশপ্রেমিক কর্মঠ ব্যক্তি পাঠান দরকার। ইহা যেন সকলে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। দিনাজপুরের কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তি একত্র হইয়া স্থির করিলেন, এবার সরকারের ধামাধরা কে. আহম্মদের পরিবর্তে অন্য কোন ভাল লোককে মেম্বরের পদপ্রার্থী রূপে

দাঁড় করান হক। এক সভায় সকলেই মৌলানা আবদুল্লাহিল বাকী সাহেবকে মনোনীত করিলেন। মৌলানা সাহেব তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি ইলেকশনের ঝামেলায় যাইবেন না বলিয়া দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করিলেন। আমরাও কিন্তু নাছোড়-বান্দা। দেশের বর্তমান অবস্থায় জাতীয় স্বার্থরক্ষার জন্য তাঁহার ন্যায় উপযুক্ত ব্যক্তির প্রয়োজন। সুতরাং তাঁহাকে ইলেকশনে দাঁড়াইতেই হইবে।

ভোট-সংগ্রহ, চারিদিকে দৌড়াদৌড়ি সমস্ত কার্য আমরা করিব বলিয়া তাঁহাকে প্রতিশ্রুতি দিলাম। সকলের সমবেত অনুরোধে অগত্যা তিনি রাজি হইলেন। যথা সময়ে নির্বাচনপ্রার্থী রূপে তাঁহাকে দাঁড করান হইল। রাজসাহী বিভাগের ৮টি জেলায় ভোট সংগ্রহ করিতে হইবে। ব্যাপার সহজ নয়। দিনাজপুরের নেতৃ-স্থানীয় ব্যক্তিগণ সকলেই উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। ইলেকশন কমিটি গঠিত হইল। প্রতিদ্বন্দ্বী কবিরউদ্দীন আহম্মদ এবার মাঠে নামিলেন। দলবল লইয়া সর্বত্র প্রচার চালাইতে লাগিলেন। আমরাও বিপুল উদ্যমে কার্যারাম্ভ করিলাম। মৌলানা সাহেব সহ কলিকাতায় গিয়া মৌলানা আকরম খাঁ, মৌলানা ইসলামাবাদী, মৌলবী মজিবর রহমান প্রমুখ সাংবাদিক ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের সঙ্গে দেখা করিয়া তাঁহাদের সমর্থনের প্রতিশ্রুতি লওয়া হইল। ইলেকশন-কার্য পরিচালনার জন্য প্রতি জেলায় একটি করিয়া কমিটি গঠন করা হইল। পাবনা ও বগুড়া জেলায় প্রচারের ভার আমি ও আমার কয়েকজন সহকর্মীর উপর দেওয়া হইল। বগুড়ায় কৃষকপ্রজা সমিতির নেতা মৌলভী রজিবউদ্দীন তরফদার, ডাঃ মফিজউদ্দীন আহমেদ, ডাঃ হবিবর রহমান ও কবিরাজ আবদুল আজিজ প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সঙ্গে আলোচনা করিলাম। তাঁহাদের নেতৃত্বে একটি ইলেকশন কমিটি গঠিত হইল। পাবনার উকিল জনাব আবদুল গফর সাহেবের বাড়ীতে গিয়া আস্তানা গাড়িলাম। স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিগণের সহিত দেখা করিয়া একটি ইলেকশন কমিটি গঠন করা হইল।

সিরাজগঞ্জের কবি সিরাজী সাহেবের সুযোগ্য পুত্র আসাউদ্দৌলা সিরাজী, সৈয়দ আকবর আলী এবং স্থানীয় আরও কতিপয় ব্যক্তিকে লইয়া এখানেও একটি কমিটি গঠন করা হইল। এইরূপ বিভিন্ন জেলায় কমিটি গঠন করিয়া প্রচারকার্য চলিতে লাগিল। দিনাজপুরের দক্ষিণ অঞ্চলে বালুরঘাটের উকিল মৌলভী সামসুদ্দীন আহম্মদ, মজিরউদ্দীন চৌধুরী ও আমি মৌলানা সাহেবকে সঙ্গে লইয়া প্রচারে বাহির হইয়াছিলাম। যেখানেই গিয়াছি বিপুল সাড়া পাইয়াছি। সকলেই

উৎসাহের সহিত মৌলানা সাহেবকে ভোট দিতে সম্মত হইয়াছেন। ট্যাক্সি আমাদের ছুটিয়া চলিয়াছে। দূরে একটি প্রকাণ্ড টিনের বাড়ী দেখিয়া বন্ধুদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম--উহা কাহার বাড়ী? তাঁহারা বলিলেন—বাড়ী নহে বাজার। চলুন ঐখানে যাইতেছি। সবই দেখিতে পাইবেন। কৌতূহলী মন লইয়া তথায় পোঁছলাম। প্রায় ৫ বিঘা জমি লইয়া মাটির দেওয়ালের উপরে চতুর্দিক বেষ্টিত প্রকাণ্ড টিনের ঘর। দক্ষিণ দিকে প্রবেশদ্বার। গাড়ী বাহিরে রাখিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলাম। ঘরগুলির সম্মুখ দিকে খোলা। দরজার পার্শ্বে একটা চৌকির উপরে মাদুর বিছাইয়া এক ভদ্রলোক ফর্সি হুঁকায় ধূমপান করিতেছেন। বয়স ৫০ অতিক্রম করিয়াছে। জনৈক খেদমতগার নীচে বসিয়া তাঁহার পান তামাক যোগাইতেছে। অত্যন্ত নোংরা পরিবেশের মধ্যে তিনি বসিয়া আছেন। গায়ে একটা গেঞ্জির উপরে আধ-ময়লা জীর্ণ কোট। পাকা দাড়ী বোধহয় অজ্ঞাতসারে পানের পিক লাগিয়া স্থানে স্থানে রঞ্জিত হইয়াছে। আমরা আস্‌ছালাম আলায়কুম বলিয়া সামনে দাঁড়াইলাম। তিনি ছালামের জবাব দিয়া তাঁহার পার্শ্বে বসিতে ইঙ্গিত করিলেন। উকিল সাহেব মৌলানা সাহেবের পরিচয় দিয়া ভোটের কথা বলিলেন। তিনি বলিলেন—আমাকে বলিয়া লাভ কি? আমি সব ছাড়িয়া দিয়াছি। বাড়ীতে যান, ছোট ভাই ও ছেলেরা আছে। তাঁহারাই এখন সংসারের কর্তা। তিনি একজন প্রভাবশালী জমিদার। যৌবনে কলিকাতায় যাতায়াত করিতেন। হগ সাহেবের বাজার দেখিয়া তাঁহার বড় ভাল লাগিল। তিনি কল্পনা করিলেন এইরূপ একটি সুন্দর বাজার বাড়ীতে বসাইলে চারি দিকের গ্রামের লোক আকৃষ্ট হইয়া দলে দলে যোগদান করিবে। অল্প দিনেই বাজার সরগরম হইয়া উঠিবে! ইহাতে যথেষ্ট লাভও হইবে বলিয়া তাঁহার ধারণা হইল। বাড়ীতে ফিরিয়া তিনি কাজে নামিলেন। কয়েক সহস্র টাকা ব্যয় করিয়া এই বিরাট গৃহটি নির্মিত হইল। ব্যবসায়িগণকে দোকান খুলিবার জন্য তিনি আহ্বান জানাইলেন। অবশেষে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া তিনি বাজার বসাইলেন। চারিদিকে হৈ চৈ পড়িয়া গেল। দলে দলে লোক শখের বাজার দেখিতে আসিল। কিন্তু খরিদ্দার কোথায়? মফঃস্বলের জনসাধারণ এইসব দোকানের বিলাসদ্রব্য কেউ খরিদ করিতে রাজী হইল না। দোকানের অবস্থাও শোচনীয় হইয়া উঠিল। অবশেষে ক্রমশঃ সকলেই সরিয়া পড়িলেন। নূতন বাজার জনশূন্য হইল। একদিন এক তৈল-ব্যবসায়ী কলু তাঁহার বাড়ীতে আসিলে তৈল বেচিয়া কত লাভ হয় তিনি

জানিতে চাহিলেন। তিনি হিসাব করিয়া দেখিলেন ঘানিতে তৈল বাহির করিয়া যথেষ্ট লাভ করা যায়। তিনি ঘানি প্রস্তুতে লাগিয়া গেলেন। নিমগাছের কাঠে উৎকৃষ্ট ঘানি হয়। বিভিন্ন স্থান হইতে বড় বড় নিম গাছ কাটিয়া আনিয়া ঘানি প্রস্তুত করিলেন। কতকগুলি বলদ গরু খরিদ করা হইল। কয়েক শত মণ সরিষা খরিদ করিয়া বিরাট আড়ম্বরে কার্যারম্ভ হইল। তৈল বিক্রয়ের জন্য লোক নিযুক্ত হইল। কিছুদিন পর দেখা গেল খরচ পোষাইতেছে না। তৈল ঘাটতি, সরিষা ঘাটতি, টাকা পয়সা চুরি ইত্যাদিতে বড় রকমের লোকসান হইতেছে। গরুগুলি অযত্নে কংকালসার হইয়াছে। কয়েকটা মরিয়াও গেল। তৈলের কারবার অচল হইয়া পড়িল। আমরা দেখিলাম ভাঙ্গাচুরা অবস্থায় ঘানিগুলি পড়িয়া রহিয়াছে। গরু-ছাগলের বিষ্ঠা ও আবর্জনা শখের নিউমার্কেটকে গোশালায় পরিণত করিয়াছে। চৌধুরী সাহেব অতীতের স্মৃতি স্মরণ করিয়া বোধহয় সারাদিন এখানে আত্ম-চিন্তায় নিমগ্ন থাকেন। 'নিউমার্কেট' যে বিপুল পরিমাণ ঋণের বোঝা তাঁহার ঘাড়ে চাপাইয়াছে উহা বহন করিবার শক্তি এখন আর তাঁহার নাই। মৌলবী সামাদ-উদ্দীন সাহেব ঘটনাটি আমাদিগকে বলিলেন। খামখেয়ালী ও অপরিনামদর্শিতার ফলে যে কত মুসলমান জমিদার সর্বস্বান্ত হইয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। আমরা 'নিউ মার্কেট' হইতে অনতিদূরে তাঁহার বাড়ীতে গেলাম। পাকাবাড়ী ও জমিদারী সানসওকাত কিছুটা বিদ্যমান থাকিলেও উহাতে যেন ভাটা পড়িয়াছে। চৌধুরী সাহেবের ভ্রাতা ও তাঁহার পুত্রগণ সাদরে আমাদিগকে গ্রহণ করিলেন। তখনই চা-নাস্তার ব্যবস্থা হইল। তাঁহাদের অমায়িক মধুর ব্যবহারে আমরা মুগ্ধ হইলাম। নির্বাচনে সর্বপ্রকার সাহায্য করিবেন বলিয়া তাঁহারা প্রতিশ্রুতি দিলেন। তথা হইতে আমরা দক্ষিণ দিনাজপুরের প্রসিদ্ধ মুসলমান জমিদার পোরসার চৌধুরী সাহেব-দের বাড়ীতে পৌঁছিলাম। ইঁহারা বহু শরিকে বিভক্ত, প্রায়ই সকলেই অবস্থাপন্ন। সহযাত্রী বন্ধুদের সহিত কয়েক জনের আত্মীয়তার সম্বন্ধ ছিল। আদর-আপ্যায়নের ক্রুটি হইল না। বহু ভাগ্যে মৌলানা সাহেব তাঁহাদের বাড়ীতে পদার্পণ করিয়াছেন সুতরাং তাঁহারা আতিথ্য সৎকার না করিয়া ছাড়িবেন না। তাঁহাদের একান্ত অনুরোধে সেইখানে রাত্রিবাসের ব্যবস্থা হইল। আমরা সকলের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করিয়া পরদিন তথা হইতে বিদায় লইলাম। ঐ অঞ্চলের প্রধান ব্যক্তিগণের সঙ্গে দেখা করিয়াছি। সকলেই আগ্রহসহকারে মৌলানা সাহেবকে সমর্থন করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। অন্যান্য জেলাতেও আমাদের জোর প্রচারকার্য চলিয়াছে।

মৌলানা সাহেব কংগ্রেস প্রার্থী ছিলেন না। তবুও কংগ্রেস মুসলীম লীগ প্রজা-সমিতি প্রভৃতি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি তাঁহাকে সমর্থন দিয়াছিল। যথা সময় ভোট গণনায় দেখা গেল মৌলানা সাহেব ২১০০ শত ভোটে জয়লাভ করিয়াছেন। বি. কে. আহম্মদ হারিয়া গিয়াছেন।

(৪৪)

পাটনা অধিবেশন

১৯৩৪ সালের ৮ই মে। পাটনা শহরে জাতীয় মহাসমিতির কার্যকারী সভার অধিবেশন বসিবে। আমন্ত্রণপত্র পাইয়া কলিকাতায় পৌছিলাম। মৌলভী আব্দুর রহমান সৈয়দী সাহেব আমার সহযাত্রী ছিলেন। কলিকাতার সহকর্মী বন্ধুদের সঙ্গে একত্রে পাটনায় পৌছিলাম। বিহারের ভয়াবহ ভূমিকম্পের পর পাটনার যে দৃশ্য দেখিলাম উহা বর্ণনাতীত। স্টেশনের নিকটবর্তী মসজিদটির দেওয়াল ফাটিয়া দ্বিধা-বিভক্ত হইয়াছে। বহু ইমারত ধূলিসাৎ হইয়া গিয়াছে। ধ্বংসস্তূপের উপরে নূতন ঘরবাড়ী নির্মিত হইতেছে। প্রাগ-ঐতিহাসিক যুগের সম্রাট অশোকের রাজধানী পাটলীপুত্র বর্তমান পাটনা নামে খ্যাত হইয়াছে। বাঁকীপুর পাটনারই একটি অংশ। ইহা বিহার প্রদেশের রাজধানী। পাটনার বিখ্যাত বাঙ্গালী ব্যারিস্টার অশ্বিনীকুমার সেন মহাশয়ের বাড়ীতে আমাদিগকে স্থান দেওয়া হইল। কুমিল্লার বসন্তকুমার মজুমদার ও তাঁহার সহধর্মিণী হেমপ্রভা মজুমদার আমাদের সঙ্গেই ছিলেন। বসন্ত বাবু সারাদিন তপজপ লইয়া থাকিতেন। বৌদিদি হেমপ্রভার যৌবন-সীমা অতিক্রম প্রায়। সর্বদা হাসিমুখে স্নেহে আমাদের সঙ্গে কথা বলিতেন। মিসেস সরোজিনী নাইডুর সহিত তাঁহার হৃদ্যতা ছিল। শ্রীমতী নাইডু আমাদের নিকটে অন্য ঘরে স্থান লইলেন। শ্রদ্ধেয় বন্ধু প্রফেসর আব্দুল বারী সাহেব সর্বদা আমাদের তত্ত্বাবধান করিতেন। পরদিন সকালে সভার অধিবেশন বসিল। ভারতের নামজাদা নেতাগণ যাঁহারা জেলের বাহিরে ছিলেন প্রায় সকলেই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। দুই দিন ধরিয়া সভার অধিবেশন হইয়াছিল। ইংরেজ সরকারের প্রস্তাবিত শাসন-সংস্কারের বিভিন্ন দিক লইয়া গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়। হিন্দু-মুসলমানের স্বার্থ ও প্রশ্ন লইয়া তুমুল বিতর্ক চলিতে থাকে। শেষ মীমাংসা কিছুই হয় নাই। অসমাপ্ত অবস্থায় অধিবেশন শেষ হয়। মহান সম্রাট অশোকের আমলে কয়েকটি স্তূপ আমরা দেখিলাম। শিলালিপি ও প্রাচীন বুদ্ধমূর্তি অনেকগুলি স্থানীয় মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে।

পাটনার বিখ্যাত খোদা বক্স্ লাইব্রেরি দেখিতে গেলাম। কি আর দেখিব? লাইব্রেরিটির ত্রিতল অট্টালিকা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়াছে। মরহুম খান বাহাদুর খোদা বক্স সি.আই.ই. সাহেবের আজীবন সাধনার ধন দেশবিদেশ হইতে সংগৃহীত কত মূল্যবান পুস্তক, প্রাচীন দুষ্প্রাপ্য পাণ্ডুলিপি স্তূপের মধ্যে চাপা পড়িয়া রহিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। অসাধারণ অধ্যবসায় ও অপরিমিত অর্থব্যয়ে সংগৃহীত এই জ্ঞানভাণ্ডার সর্বনাশা ভূমিকম্পের করাল গ্রাসে লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। স্তূপের মধ্য হইতে বই পুস্তকগুলি উদ্ধার করিয়া কয়েকটি টিনের শেডে রাখা হইতেছে। নূতন গৃহ নির্মাণ করিয়া লাইব্রেরিটির পূর্বাবস্থা ফিরাইয়া আনিতে বহু সময় ও অর্থব্যয়ের প্রয়োজন হইবে। পাটনার বিখ্যাত ব্যারিস্টার মোজাহারুল হক, ব্যারিস্টার আলী ইমাম ও হাসান ইমাম ভ্রাতৃদ্বয় দেশ ও জাতীর গৌরব স্বরূপ ছিলেন। পাটনা হইতে বিদায়ের দিনে ব্যারিস্টার সেন সাহেব বিরাট ভোজে আমাদিগকে আপ্যায়িত করেন। ডাইনিং হলে লম্বা টেবিলের উভয় পার্শ্বে সারি সারি চেয়ার পাতিয়া দেওয়া হইয়াছিল। মিসেস সরোজিনী নাইডু, পণ্ডিত জহরলালের ভগিনী বিজয়লক্ষ্মী ও হেমপ্রভা মজুমদার আমাদের সম্মুখে বসিয়াছিলেন। পোলাও কোরমা দধি মিষ্টান্ন লইয়া মুসলমান বাবুর্চীরা সাহেবী কায়দায় টেবিল সাজাইতে ছিল। টেবিলে প্লেটের সংগে কাঁটা চামচ দেখিয়া প্রমাদ গুনিলাম। জালালউদ্দীন হাশেমী ও সৈয়দী সাহেব আমরা পাশাপাশি বসিয়াছিলাম। অন্যান্য হিন্দু ও মুসলমান নেতা-গণ আমাদের সঙ্গে একত্রে বসিয়াছিলেন। গৃহকর্তা সেন সাহেবের শাশুড়ী এক বর্ষিয়সী মহিলা আমাদের আহারের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত ছিলেন। সম্মুখে রক্ষিত সুখাদ্যগুলির মিষ্ট মধুর গন্ধ আমাদের ধৈর্যের সীমা অতিক্রম করিতেছিল। কিন্তু কাঁটা চামচের সাহায্যে কি করিয়া লোভনীয় জিনিষগুলি উদরস্থ করিব দিশা পাইতে ছিলাম না। আমার মত অনেকেই এই সমস্যায় পড়িয়াছেন। অবশেষে বর্ষিয়সী মহিলাটিকে সম্বোধন করিয়া বলিলাম—মা, কাঁটা চামচে খাওয়ার অভ্যাস নাই। আমার জন্য অন্য ব্যবস্থা করুন। সকলেই ঠিক ঠিক বলিয়া আমার কথা সমর্থন করিলেন। মিসেস্ নাইডু বলিলেন—দেশী খানা বিদেশী ব্যবস্থায় খাওয়া তৃপ্তিকর হইবে না। তৎক্ষণাৎ প্লেট ও কাঁটাচামচ সরাইয়া শ্বেত পাথরের থালা, বাটী ও গ্লাস দেওয়া হইল। মহিলাটি বলিলেন—হাঁ বাবা, ঠিক বলিয়াছ। আমিও ওগুলি পছন্দ করি না। বিদেশী দ্রব্য বর্জন করিব অথচ তাঁহাদের আচার-ব্যবহার গ্রহণ করিব এ কেমন কথা? আহার চলিতেছে। ভদ্রমহিলা প্রত্যেকের

কাছে গিয়া এটা খান ওটা খান বলিয়া অনুরোধ করিতেছেন। গলদা চিংড়ীর কালিয়া আসিল। আমি চিংড়ী মাছ খাই না বলিয়া লইলাম না। তিনি আমার নিকট আসিয়া বলিলেন---না বাবা চিংড়ী মাছ, লইতেই হইবে। এতো বড় চিংড়ী এখানে পাওয়া যায় না। আমি তোমাদের জন্য ইহা কলিকাতা হইতে আনাইয়াছি, অগত্যা লইতে হইল। কিন্তু খাইতে রুচি হইল না। আমার বন্ধু সৈয়দী সাহেব আমার সঙ্গে পাল্লা দিয়া কিছু অধিক ভোজন করিয়াছিলেন। পাটনা হইতে ফিরিবার কালে তাঁহার পরিপাক-যন্ত্র অত্যধিক চাপে বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। কলিকাতা পৌঁছিয়া তাঁহাকে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হইতে হয়। এই মাতৃস্বরূপিণী মহিলার স্নেহমাখা ব্যবহারের কথা আজও স্মরণ আছে।

বেনারস

হিন্দুর সর্বপ্রধান তীর্থ কাশী বা বেনারসের উপর দিয়া কয়েক বার যাতায়াত করিয়াছি। প্রথম বার শুধু ভ্রমণ উপলক্ষে বেনারস গিয়াছিলাম। কছরউদ্দীন চৌধুরী ও জহরউল্লা সরকার আমার দুই আত্মীয় একত্রে পশ্চিম ভারত ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলাম। কাটিহার জংশন হইয়া ছাপরা, বালিয়া, গাজীপুর দিয়া প্রত্যুষে বেনারস পৌঁছিলাম। ট্রেনে 'বাবা বিশ্বনাথ জীকি জয়' বলিয়া মুহুর্মুহু জয়ধ্বনি হইতেছে। ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। বুঝিলাম বেনারস পৌঁছিয়াছি। ট্রেন তখন গঙ্গার ব্রিজের উপর দিয়া ধীর মন্থর গতিতে অগ্রসর হইতেছে। গঙ্গাতীরে অর্ধচন্দ্রাকারে বেনারসের সৌধমালা ও বিদ্যুৎ আলোক নদীবক্ষে প্রতিফলিত হইয়া অপূর্ব দৃশ্যের সৃষ্টি করিয়াছে। দুইটি অত্যুচ্চ মিনার চূড়া শহর ছাড়াইয়া ঊর্ধ্বাকাশে সগৌরবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে দেখিলাম। মনে করিলাম উহা মন্দিরের মিনার হইবে। পার্শ্বে উপবিষ্ট এক হিন্দু ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করিলাম—মিনার-দুইটি কি মন্দিরের? উত্তর হইল—ন্যাহি ভাই ওহ তো ধারারার মস্‌জিদ কা মিনার হ্যায়। আনন্দে বুক ভরিয়া উঠিল। হিন্দুর সর্বশ্রেষ্ঠ তীর্থস্থান বেনারসের আকাশচুম্বী মিনার-দুইটি তৌহিদের জয় ঘোষণা করিতেছে। অদম্য বাসনা লইয়া কাশী স্টেশনে অবতরণ করিলাম। অপরিচিত স্থান বাজারে কাঠের তৈয়ারী দোতালায় দৈনিক ৪ আনা ভাড়ায় একটি 'রুম' লইলাম। সেদিন ছিল শুক্রবার। সম্রাট আওরঙ্গজেবের ঐতিহাসিক জুমা মসজিদে নামাজ আদায় করিবার উদ্দেশ্যে তথায় গেলাম। বেনারসে বহু মস্‌জিদ আছে,

তন্মধ্যে এইটি সর্ববৃহৎ। এখানকার প্রধান বিশ্বনাথ ও অন্নপূর্ণার মন্দির মস্‌জিদের পার্শ্বেই অবস্থিত। মস্‌জিদের ভিত উঁচু, মন্দিরের ভিত অনেকখানি নিচু; মন্দির ও মস্‌জিদের প্রবেশদ্বার একটাই। নামাজের তখনও কিছু দেরি আছে। কয়েকজন বাঙ্গালী ছাত্রের সঙ্গে দেখা হইল। ইহারা এখানে মাদ্রাসায় অধ্যয়ন করেন। বিদেশে নিজের দেশের লোক পাইলে আনন্দ হয়। প্রীতির সম্বন্ধ গড়িয়া উঠিতে বিলম্ব হয় না। ইহাদের পরিচয় লইয়া জানিলাম কয়েকজন আমার নিজের জেলা দিনাজপুরের অধিবাসী। তাঁহারা আমাদিগকে পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। মন্দিরের ঢাক, ঢোল ও ঘণ্টার বিকট শব্দে কান পাতা দায়। কি করিয়া এখানে নামাজ পড়া যাইবে চিন্তা করিতেছি। এমন সময় মোয়াজ্জেমের গুরুগম্ভীরকণ্ঠে আজান ধ্বনিত হইল—'আল্লাহু আকবর'। সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরের বাদ্যবাজনা সব থামিয়া গেল। বিরাট জামাতে নামাজ আদায় করিলাম। নামাজ শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরের শঙ্খঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। ভারতের দুইটি প্রধান ধর্মসম্প্রদায় পরস্পরের ধর্মানুষ্ঠানের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া নিরাপদে ধর্মকার্য সমাপন করিয়া আসিতেছেন দেখিয়া সত্যই আনন্দ হইল। প্রবাসী বন্ধুগণ হোটেলে আর আমাদের থাকিতে দিলেন না। নিজেরা তথায় গিয়া আমাদের আসবাবপত্র ঘাড়ে করিয়া তাঁহাদের আস্তানায় লইয়া আসিলেন।

বেনারসের প্রসিদ্ধ আলেম মৌলানা আবুল কাসেম বেনারসী সাহেবের প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসায় ইহারা অধ্যয়ন করেন। আমাদের নিষেধ সত্ত্বেও আহারাদির ব্যবস্থা তাঁহারাই করিলেন। কিছুক্ষণ বিশ্রাম লইয়া মন্দির দেখিতে রওয়ানা হইলাম। প্রবাসী বন্ধু সঙ্গে চলিলেন। মস্‌জিদ ও মন্দিরের সদরদরজা অতিক্রম করিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিলাম। মন্দিরাভ্যন্তরে ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য জাতির প্রবেশ নিষেধ। বাহিরের দরজায় দাঁড়াইয়া বিশ্বনাথ ও অন্নপূর্ণার যুগল মূর্তি দেখিলাম। হিন্দু ধনী-সম্প্রদায় অজস্র অর্থ এখানে ঢালিয়াছেন। মন্দিরের তিনটি চূড়া স্বর্ণমণ্ডিত। সূর্যকিরণ প্রতিফলিত হইয়া অগ্নিশিখার ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে। বিগ্রহ-দুইটির অঙ্গশয্যায় লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয়িত হইয়াছে। স্বর্ণালঙ্কার ও মণিমুক্তার ছড়াছড়ি। দিবা-রাত্র পুণ্যার্থীদের মহামেলা অপ্রশস্ত রাস্তায় ভীড় ঠেলিয়া অগ্রসর হওয়া কঠিন। যান-বাহন এ পথে চলিতে পারে না। ভক্ত হিন্দু জীবনসায়াহ্নে পুণ্যতীর্থ জাহ্নবীতীরে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া মুক্তিলাভের আশায় আবাসগৃহ নির্মাণ করিয়াছেন। অট্টালিকাগুলি ঘনসন্নিবিষ্ট হওয়ার ইহাই কারণ। অনেক বাড়ীতে সূর্যালোক

প্রবেশ করিতে পারে না। আমরা মন্দিরসীমা হইতে বাহিরে আসিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। জয়পুরের মহারাজা জয়সিংহ এখানে একটি মানমন্দির নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন। পূর্বে একথা বলিয়াছি স্থানীয় লোক ইহার নাম দিয়াছে যন্ত্রমন্ত্র। সূর্যের ছায়ায় ইহাদ্বারা সঠিক সময় নিরুপণ করা যায়। এইবার আমরা ছত্রিশ আসনের ঘর দেখিতে গেলাম। কারুকার্যবিহীন প্রস্তরনির্মিত একটি সাধারণ গৃহ। আমাদিগকে ভিতরে প্রবেশ করিতে বলিয়া বন্ধুগণ হাসিতে লাগলেন। আমরা হাসির কারণ বুঝিলাম না। ভিতরে প্রবেশ করিয়া যাহা দেখিলাম উহার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া সম্ভবপর নহে। নারীপুরুষের যৌন মিলনের ছত্রিশ প্রকার নগ্ন চিত্র। পাথর খুদিয়া দেওয়ালের গায়ে উহা অঙ্কিত করা হইয়াছে। এই অশ্লীল চিত্রগুলি দেখিয়া আমার সহযাত্রী জহুরুল্লা সরকার সাহেব তওবা তওবা করিয়া বাহির হইয়া গেলেন। চিত্রগুলি গুনিয়া দেখিলাম যৌন মিলনের বিভিন্ন ভঙ্গীতে ছত্রিশটি চিত্র অংকিত রহিয়াছে। অশ্লীল হইলেও যে শিল্পী এই চিত্রগুলি প্রস্তরগাত্রে খোদাই করিয়া স্বাভাবিক দৃশ্য ফুটাইয়া তুলিয়াছেন তাঁহার বাহাদুরির কথা স্বীকার করিতেই হইবে। ভারতের প্রায় সমুদয় হিন্দুমন্দিরে এইরূপ বহু অশ্লীল চিত্র দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া শুনিয়াছি। আমি ও আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মোসলেমউদ্দীন চৌধুরী ও ভগ্নিপতি হজরত আলী খাঁ সাহেবের সহিত স্বাস্থ্যলাভের আশায় উড়িষ্যার বর্তমান রাজধানী ভুবনেশ্বরে গিয়া কিছুদিন ছিলাম। এত অসংখ্য মন্দির আর কোথাও দেখি নাই। মাঠে ঘাটে সর্বত্র প্রস্তরনির্মিত ক্ষুদ্রবৃহৎ বহু মন্দির অযত্নে ছড়াইয়া রহিয়াছে। এখানকার প্রধান কয়েকটি মন্দিরে অশ্লীল ছবি দেখিয়াছি। কোনারকের 'সূর্যমন্দির' ও পুরীর জগন্নাথ দেবের মন্দিরেও অশ্লীল ছবি রহিয়াছে। পুণ্যার্থী হিন্দু নরনারী তীর্থক্ষেত্রে পুণ্যসঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে আসিয়া কুরুচিপূর্ণ চিত্রগুলি দেখিয়া কোন্ পুণ্য সঞ্চয় করেন তাহা আমাদের জ্ঞানের অগম্য। সাহিত্যরথী বাবু প্রবোধকুমার সান্যাল তাঁহার ভ্রমণকাহিনীতে এই চিত্রগুলির দার্শনিক ব্যাখ্যা দিয়াছেন। আমরা দার্শনিক নহি। সাধারণ মানুষের চক্ষে উহা অশ্লীল ও বিকৃত রুচির পরিচায়ক। বেনারসের অলিতে গলিতে অসংখ্য মন্দির। মসজিদও অনেকগুলি দেখিলাম। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য প্রতিষ্ঠিত হিন্দু কলেজ বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হইয়াছে। অতীতের বৌদ্ধ কৃষ্টির বিখ্যাত কেন্দ্র সারনাথ বেনারসের অনতিদূরে। কোন উচ্চ স্থান হইতে লক্ষ্য করিলে 'ধামক স্তূপ' পরিষ্কার দেখা যায়। মহাপুরুষ গৌতম বুদ্ধের অহিংসামন্ত্র এক সময় সমগ্র ভারত ও আফগান স্থানকে প্লাবিত

করিয়াছিল। তক্ষশীলা ও নালন্দা বৌদ্ধযুগের অতীত গৌরবের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

অতঃপর আমরা ধারার মস্‌জিদ দেখিতে গেলাম। ট্রেনে বসিয়া এই মস্‌জিদটির গগনচুম্বী মিনার-দুইটি আমরা দেখিয়াছিলাম। ইহা কলিকাতার 'অকটারলনি মনুমেন্ট' হইতে উচ্চ। গঙ্গাতীরে অবস্থিত মস্‌জিদটির দক্ষিণদিকের মিনারের পাদ-দেশ ধৌত করিয়া সুরধুনি গঙ্গা প্রবাহিতা। কিছুদিন আগে সংবাদপত্রে দেখিলাম দক্ষিণদিকের এই মিনারটি গঙ্গাগর্ভে পতিত হইয়াছে। ধারার মস্‌জিদটিও সম্রাট আওরঙ্গজেবের জমানায় নির্মিত হইয়াছে। ভারতের শ্রেষ্ঠ হিন্দু মন্দিরের পার্শ্বে কি করিয়া বিরাট শাহী মস্‌জিদ নির্মিত হইল বলিতেছি।

সম্রাট আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে কতকগুলি ক্ষমতাশালী জমিদার তাঁহাকে ক্ষমতাচ্যুত করার উদ্দেশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। দেবতার আশীর্বাদে যুদ্ধে জয়লাভের আশায় মন্দিরকে কেন্দ্র করিয়া এই যুদ্ধ পরিচালিত হয়। মুসলমান ধর্মশাস্ত্রে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের ধর্মে আঘাত দেওয়া অথবা ধর্মস্থান ক্ষতিগ্রস্ত করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। সম্রাট ছিলেন স্বধর্মনিষ্ঠ খাঁটী মুসলমান। তিনি বিদ্রোহ দমন করিতে আসিয়া দেখিলেন গোলাগুলি চলিলে মন্দির ধ্বংস অনিবার্য। তিনি বিদ্রোহী নেতাগণকে মন্দির বাদ দিয়া শক্তি পরীক্ষার আহ্বান জানাইলেন। কিন্তু বিদ্রোহীগণ এ আহ্বানে সাড়া দিলেন না। সম্রাট নিরুপায় হইয়া যুদ্ধ পরিচালনার আদেশ দিলেন। বিদ্রোহীগণ পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল। গোলা বর্ষণের ফলে শহরের বিপুল ক্ষতি সাধিত হইল। বিশ্বনাথের ও বিন্দুমাধবের মন্দির ধ্বংস হইয়া গেল। কর্মিতকর্মা মুসলমানগণ মন্দিরের মালমসলা দিয়া ঐখানেই মস্‌জিদ নির্মাণ করিয়া ফেলিলেন। যুদ্ধের পর শান্তি স্থাপিত হইলে মন্দিরের স্থানে মস্‌জিদ নির্মিত হইয়াছে বলিয়া হিন্দু প্রধানগণ অভিযোগ করিলেন। সম্রাট সমস্ত বিষয় অবগত হইয়া দুঃখ প্রকাশ করিলেন এবং মস্‌জিদের পার্শ্বেই মন্দির নির্মাণের অনুমতি দিলেন এবং রাজকোষ হইতে ব্যয় বহন করা হইবে বলিয়া ঘোষণা করিলেন। মহান সম্রাট শুধু রাজকোষ হইতে অর্থ দিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না। ভবিষ্যতে ব্যয় নির্বাহের জন্য লক্ষাধিক টাকা আয়ের ভূসম্পত্তিও দান করিয়া দিলেন। যুদ্ধজয়ের গৌরবচিহ্নের নিদর্শনস্বরূপ বোধহয় ধারার মস্‌জিদের এই অত্যুচ্চ মিনার-দুইটি নির্মিত হইয়াছিল।

প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক আল্লামা শিবলী নমানী পুরাতন সরকারী কাগজপত্র ঘাটিয়া সম্রাটের এই দানপত্রখানা বাহির করিয়াছিলেন। মরহুম মৌলানা মনিরুজ্জামান

ইস্‌লামাবাদী সাহেব আল ইস্‌লাম পত্রিকায় ইহার বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ করিয়াছিলেন। অথচ হিন্দু লেখকগণ এই সম্রাটের অযথা কলঙ্ক রটনা করিতে কুন্ঠিত হয় নাই। আমরা তিন দিন তথায় অবস্থান করিয়া প্রবাসী বন্ধুদের নিকট বিদায় লইয়া এলাহাবাদ যাত্রা করিলাম।

(৪৫)

১৯৩৫ সাল: মোসলেম লীগের সভা

ফেব্রুয়ারি মাসে কলিকাতা ওয়েলেস্‌লি স্কোয়ারে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অবসরপ্রাপ্ত স্কুল ইন্‌সপেক্টর মৌলবী আবদুল করিম সাহেবের বাড়ীতে প্রাদেশিক মোসলেম লীগের কার্যকরী সমিতির এক সভা আহ্বান করা হয়। নূতন শাসনসংস্কারের সুবিধা ও অসুবিধা লইয়া আলোচনা করা এই সভার উদ্দেশ্য ছিল। জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী সাহেব অসুস্থ থাকায় আমরা একদল তাঁহার বাড়ীতে গিয়া দেখা করিলাম। মৌলবী তমিজউদ্দীন খাঁ, সৈয়দ নওসের আলী, জালালউদ্দীন হাসেমী, মওলানা আব্দুল্লাহিল বাকী প্রমুখ কয়েক জন বিশিষ্ট ব্যক্তি এই দলে ছিলেন। অসুস্থতার জন্য সোহরাওয়ার্দী সাহেব সভায় উপস্থিত হইতে না পারায় এই সাক্ষাৎ করি। সভার আলোচনার বিস্তৃত বিবরণ সেন্ট্রাল মোসলেম লীগের আসন্ন অধিবেসনে উপস্থিত করার জন্য প্রেরণ করা হয়।

মওলানা হোসেন আহম্মদ মদানী

উক্ত সাহের মার্চ মাসে রংপুর জেলার ডোমারের নিকট সোনারায় গ্রামের বিশিষ্ট আলেম মওলানা এহ্‌সানুল হক আফেন্দী সাহেবের মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে এক বিরাট সভায় উত্তরবঙ্গের নেতৃস্থানীয় আলেমগণ যোগদান করিয়াছিলেন। জমিয়তে ওলামায়ের হিন্দের সভাপতি স্বাধীনতা-সংগ্রামের অক্লান্ত সৈনিক সর্বজনশ্রদ্ধেয় হজরত মওলানা হোসেন আহম্মদ মদানী এই সভায় তস্‌রিফ আনিয়াছিলেন। সভায় বিপুল লোক সমাগম হইয়াছিল। দুই দিন ধরিয়া সভার অধিবেশন হয়, শ্রদ্ধেয় মওলানা আব্দুল্লাহিল বাকী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। অন্যতম সেনানায়ক মওলানা মনিরুদ্দীন আনোয়ারী সাহেবের উদ্বোধনী বক্তৃতার পর সভার কার্য আরম্ভ হয়। মওলানা মদানী ধর্ম, শিক্ষা, সমাজ ও রাজনীতি লইয়া সরল উর্দু ভাষায় দীর্ঘ বক্তৃতা

করেন। তাহার বক্তৃতাশক্তি ছিল অসাধারণ, যাহা এদঞ্চলে কর্মচাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছিল। মওলানা এহসানুল হক আফেন্দী বয়েদো ছিলেন। যুবক যৌবনের উৎসাহ উদ্যম লইয়া তিনি দেশ ও জাতির সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। পরিপূর্ণ আশা ও অদম্য উৎসাহ তাঁহার ছিল। কিন্তু দেশের দুর্ভাগ্য, অকালে তিনি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া পরলোক করেন।

বাকী সাহেবের মোকদ্দমা। মওলানা আব্দুল্লাহিল বাকী সাহেব ভারতীয় ব্যবস্থাপকসভায় বিরোধী দলে যোগদান করেন। পরাজিত প্রার্থী কে আহম্মদ এই পরাজয় মানিয়া লইলেন না। ইলেকশন অবৈধ হইয়াছে বলিয়া আলিপুর জর্জ কোর্টে মামলা দায়ের করিলেন। আমাদের পক্ষ সমর্থন জন্য কলিকাতা হাইকোর্টের বিখ্যাত ব্যারিস্টার এন. আর. দাসগুপ্তকে নিযুক্ত করা হইল। মামলা চলিতে লাগিল। এই মামলা পরিচালন-সম্বন্ধে আলোচনার জন্য ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় মহাশয়ের বাড়ীতে এক পরামর্শ সভা বসিল। মওলানা আবুল কালাম আজাদ, মওলানা আকরাম খাঁ, মৌলবী মুজিবর রহমান, সৈয়দ জালালউদ্দীন হাসেমী, ক্যাপ্টেন নরেন্দ্রনাথ দত্ত (বেঙ্গল ইমিউনিটি নামক বিখ্যাত ঔষধ প্রস্তুত কারখানার পরিচালক), মওলানা বাকী সাহেব সহ আমি উপস্থিত ছিলাম। নির্বাচনে কোনই ত্রুটি ছিল না। কিন্তু হিসাব দাখিলের সময় ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের নিকট হইতে মওলানা সাহেব ব্যক্তিগত হাওলাত ৫০০ শত টাকা লইয়াছিলেন উহা হিসাবে জমা করা হয় নাই। ডাক্তার রায়ের নির্দেশমত ক্যাপ্টেন দত্ত টেলিগ্রাফ মানি অর্ডার যোগে এই টাকা মওলানা সাহেবকে পাঠাইয়া ছিলেন। ক্যাপ্টেন দত্তকে ঐ টাকার সত্যতা প্রমাণের জন্য অপর পক্ষ সাক্ষী মানিয়াছেন। অনেক বিষয় লইয়া আলোচনা হইল। এই মামলাসংক্রান্ত কার্যে সর্বদাই আমাদিগকে কলিকাতা যাতায়াত করিতে হইত। হাসেমী সাহেবের কড়ায়া রোডের বাসায় আমরা থাকতাম। এই মামলার তদবিরের জন্য তিনি আমাদের সহিত যথেষ্ট দৌড়াদৌড়ি করিতেন। একদিন তাঁহার বাসায় আমরা বসিয়া আছি এমন সময় একটি লোক হাসেমী সাহেবকে বাহিরে ডাকিয়া কি যেন বলিলেন। লোকটির পরনে ময়লা পায়জামা ও আধ-ময়লা জামা ছিল। আমি ঐ দিকে লক্ষ্য করিতেই হাসেমী সাহেব হাতের ইশারায় আমাকে ডাকিলেন। বাহিরে আসিলে তিনি বলিলেন—পকেটে কিছু আছে? আমি বলিলাম—কয়েক আনা পয়সা থাকিতে পারে। তিনি বলিলেন—ইহাকে দাও। আমি পকেট খুঁজিয়া কয়েক আনা পয়সা তাহাকে দিলাম। লোকটা অম্লানবদনে উহা লইয়া চলিয়া গেল।

হাসেমী সাহেব আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—ইঁহাকে চেন? আমি বলিলাম—না ভাই, চিনি না। তিনি বলিলেন—শিক্ষিত ও প্রতিভাবান লোকের কত দূর অধঃপতন হইতে পারে স্বচক্ষে দেখ। ইনি কবি সাহাদত হোসেন, একজন খ্যাত-নামা লেখক ও কবি। দারিদ্র্যের চরম সীমায় পৌঁছিয়াছেন। পান দোষে ইহার সর্বনাশ হইয়াছে। শুনিয়া বড় দুঃখ হইল। একদিন আলীপুর কোর্টে জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দী সাহেবের সহিত দেখা হইল। মামলার অনেক কথা লইয়া তিনি আলোচনা করিলেন। আমাদের ব্যারিস্টার দত্ত সাহেবও উপস্থিত ছিলেন। সোহরাওয়ার্দী সাহেব বললেন—মওলানা সাহেব সরকার বিরোধী দলে যোগদান করিয়াছেন। আপনাকে সরাইয়া দেওয়াই সরকারের কাম্য। যে-কোন একটুকু ত্রুটির জন্য ইলেকশন অসিদ্ধ ঘোষিত হইতে পারে। ক্যাপ্টেন দত্তের সাক্ষীর উপরে এই মামলার ফলাফল নির্ভর করিতেছে। এইদিন আমাদের পক্ষে মওলানা আকরম খাঁ, মৌলবী মুজিবর রহমন ও সৈয়দ জালালউদ্দীন হাসেমী সাক্ষী দিলেন। মামলার আবার দিনান্তর ধার্য হইল। পরের তারিখে ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় ও ক্যাপ্টেন দত্তের সাক্ষী হইল। ডাক্তার রায় আমাদের অনুকূলে সাক্ষ্য দিয়াছেন। কিন্তু ক্যাপ্টেন দত্তের সাক্ষী আমাদের প্রতিকূলে গেল। শেষ দিনে উভয় পক্ষের ব্যারিস্টারের সওয়াল জবাব হইল। একমাত্র ডাঃ রায়ের প্রেরিত টাকা জমা করা হয় নাই বলিয়া প্রশ্ন দেখা দিল। কিন্তু টাকা তাঁহার ব্যক্তিগত হাওলাতি টাকা ছিল। জজ সাহেব শুনিলেন না। নির্বাচন বাতিল করিয়া দিলেন। মওলানা সাহেব মাত্র দুইটি অধিবেশনে যোগদান করিয়া ছিলেন। তিনি কংগ্রেসপ্রার্থী ছিলেন না। কিন্তু কংগ্রেস ও খেলাফৎ আন্দোলনে প্রথম শ্রেণীর নেতা ছিলেন। তাঁহার বিদ্যা, বুদ্ধি ও পাণ্ডিত্য তাঁহাকে এই সম্মানের অধিকারী করিয়াছিল। তাঁহার বিরুদ্ধবাদীরাও এজন্যও তাঁহাকে সম্মান করিতেন। তাঁহার ইলেকশন বাতিল হওয়ার সংবাদে দেশের বিশিষ্ট চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ দুঃখ প্রকাশ করিয়া বহু পত্র টেলিগ্রাম পাঠাইয়াছিলেন। মিঃ কে. আহম্মদ মামলায় জয়লাভ করিয়া ভবিষ্যতের রঙীন স্বপ্নে বিভোর হইয়াছিলেন কিন্তু এই স্বপ্ন সফল হয় নাই। হঠাৎ পরপারের ডাকে তাঁহাকে চলিয়া যাইতে হইয়াছিল। স্বপ্ন স্বপ্নই রহিয়া গেল।

কবি শেখ ফজলুল করিম সাহিত্য-বিশারদ

অর্ধশতাব্দী পূর্বে বাংলার মুসলমান সমাজে চরম অধঃপতনের দিনে কাব্য ও সাহিত্যের মধ্যে দিয়া যাঁহারা সমাজের নব জাগরণের সৃষ্টি করিয়াছিলেন রংপুর কাকিনার প্রথিতযশা কবি শেখ ফজলুল করিম তাঁহাদের অন্যতম। কবি সাহাবের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় না থাকিলেও চিঠিপত্রের মারফত সৌহার্দের সৃষ্টি হইয়াছিল। সাহিত্য সাধনার জন্য তাঁহার প্রীতিপূর্ণ পত্রগুলি আমাকে উৎসাহিত করিত। আমি একটি ক্ষুদ্র উপন্যাস লিখিয়া সংশোধনের জন্য তাঁহার নিকট পাঠাইয়াছিলাম। তিনি উহা দেখিয়া কয়েকটি স্থানে সংশোধন করিয়া আমার নিকট পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহার উৎসাহে আমার পশ্চিম ভারত ভ্রমণকাহিনী 'সওগাত' পত্রিকায় কয়েক সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল। সওগাত-সম্পাদক জনাব নাসিরউদ্দীন সাহেব নূতন লেখকদিগকে উৎসাহিত করার জন্য তাঁহাদের লেখা সওগাতে প্রকাশ করিতেন। উৎসাহ ও উদারতায় বহু নূতন লেখক সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। কয়েক মাস নিয়মিতভাবে আমার ভ্রমণকাহিনী সওগাতে প্রকাশিত হইল। কিন্তু হঠাৎ জীবনের গতি পরিবর্তন হইয়া গেল। দেশের মুক্তি আন্দোলনে জড়াইয়া পড়িলাম। লেখক অথবা সাহিত্যিক হওয়া আমার ভাগ্যে ঘটিল না। কবি সাহেবের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হইল। একদিন আলীপুর জজ কোর্টে অপরিচিত এক প্রৌঢ় ভদ্রলোকের সঙ্গে কতিপয় ব্যক্তির আলাপ করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসায় জানিলাম, উনি কবি শেখ ফজলুল করিম। মকর্দমা-সংক্রান্ত কোন কার্যে এখানে আসিয়াছেন। তাঁহাকে দেখিয়া অত্যন্ত খুশি হইলাম। চিঠিপত্রে বহু দিনের পরিচিত হইলেও তাঁহার সহিত এই প্রথম সাক্ষাৎ। তিনিও যে আমার পরিচয় পাইয়া আনন্দিত হইবেন তাহাতে কোন সন্দেহ ছিল না। কতকগুলি কাগজপত্র লইয়া এক উকিলের সহিত কথা বলিতেছিলাম। আমি তাঁহার সহিত আলাপ করার সুযোগের অপেক্ষা করিতেছিলাম। এমন সময় মৌলানা বাকী সাহেবের আহ্বানে বার লাইব্রেরির দিকে চলিয়া গেলাম। ফিরিয়া আসিয়া দেখি কবি সাহেব চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সহিত সাক্ষাতের সুযোগ আর হইল না। জীবনে সেই প্রথম ও শেষ সাক্ষাৎকার। পর বৎসর ১৯৩৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ৫৪ বৎসর বয়সে সন্ন্যাস রোগে তিনি ইন্তেকাল করেন।

দিনাজপুর প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনী

১৯৩৫ সালের শাসনসংস্কারের বিভিন্ন দিক আলোচনার জন্য এপ্রিল মাসে এক কনফারেন্স আহ্বান করা হয়। স্বনামধন্য মনীষী আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় সভাপতি মনোনীত হন। তিনি শারীরিক অসুস্থতার জন্য সভাপতির পদ গ্রহণ করিতে অসমর্থতা জ্ঞাপন করিলে অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষ হইতে আমি কলকাতায় গিয়া তাঁহাকে পাকড়াও করিয়া লইয়া আসি। তিনি দিনাজপুরে পৌঁছিলে রাজকীয় আড়ম্বরে তাঁহাকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করা হয়। বাংলাদেশের প্রতিটি জেলা হইতে নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ সভায় যোগদান করেন। কলিকাতা হইতে সৈয়দ জালালউদ্দীন হাসেমী, নজীর আহম্মেদ চৌধুরী, সুভাষচন্দ্র বসু, নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ফরিদপুরের লাল মিয়া প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ সভায় যোগদান করেন। দিনাজপুরের জননায়ক যোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী, নিশীথনাথ কুণ্ডু, মৌলানা আবদুল্লাহিল বাকী, মৌলভী হাসান আলী, মৌলানা মনিরউদ্দীন আনোয়ারী, মৌলভী আবদুর রহমান সৈয়দী প্রভৃতি ব্যক্তিগণকে লইয়া অভ্যর্থনাসমিতি গঠিত হইয়াছিল। মৌলানা বাকী সাহেব সমিতির চেয়ারম্যান ছিল। ১৯শে এপ্রিল সভার অধিবেশন বসিল। প্রতিনিধি ও দর্শকগণ মিলিয়া বিরাট জনসমাগম হয়। সভার কার্য্য চলিতেছে এমন সময় সংবাদ আসিল দিনাজপুরের মহারাজা জগদীশনাথ রায় সভায় আসিতেছেন। মহারাজা আসিলে আমরা সকলে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলাম। সভাপতি মহাশয়ও দাঁড়াইয়া ছিলেন। মহারাজা আচার্যদেবের সম্মুখীন হইয়া করজোড়ে নিবেদন করিলেন—আপনার সহিত আমার গুরুশিষ্য সম্বন্ধ। শিষ্যকে দেখিয়া সম্মানের জন্য গুরু দাঁড়াইলে শিষ্যের অধোগতি হয়। আমি প্রেসিডেন্সী কলেজে আপনার ছাত্র ছিলাম। এই বলিয়া তিনি তাঁহার পদধূলি লইলেন।

সভাপতি তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া বলেন—"তুমি আমার ছাত্র? দিনাজপুরের মহারাজা আমার ছাত্র এজন্য আমি গৌরব অনুভব করিতেছি। অতঃপর সকলেই উপবেসন করিলে সভার কাজ চলিতে লাগিল। কমিউনাল 'অ্যাওয়ার্ড' লইয়া তুমুল বিতর্কের সৃষ্টি হয়। অধিকাংশ হিন্দু মেম্বর 'অ্যাওয়ার্ডের' বিরুদ্ধে ভোট দেন। মৌলানা আব্দুল্লাহিল বাকী হিন্দু মানসিকতার তীব্র নিন্দা করিয়া সভা ত্যাগের জন্য আমাদিগকে নির্দেশ দেন। মৌলানা সাহেবের নির্দেশমত আমরা মুসলমান মেম্বরগণ সভাস্থল ত্যাগ করিয়া বাহির হইয়া আসি. সভায় একটা বিশৃংখলা উপস্থিত হয়।

মহারাজা একটি ক্ষুদ্র বক্তৃতা দিয়া পরস্পরের স্বার্থের প্রতি অবহিত হওয়ার জন্য আবেদন জানান। সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে আমরা পুনরায় সভায় যোগদান করি। আমাদের দৃঢ় মনোভাবের জন্য ঐ প্রস্তাব পরিত্যাক্ত হয়। লাল মিঞা সাহেব হাসেমী সাহেব প্রভৃতি কয়েক জন বন্ধু মিলিয়া বালুবাড়ীতে একটা বাসায় আমরা থাকিতাম। উদার বন্ধুবৎসল লাল মিঞা সাহেবকে আমরা সকলেই ভাল বাসিতাম। তিন দিন ধরিয়া সভার অধিবেশন চলিয়াছিল।

(৪৬)

দুই পীরের ঝগড়া

দিনাজপুর জেলার হানাফী ও মহাম্মদী জামাতের দুই পীরের মুরিদানদের মধ্যে প্রায়ই ঝগড়া বিবাদ লাগিয়া থাকিত। ঘটনাটি ঘটিয়া ছিল দুই দলের মধ্যে একটা জমির দখল লইয়া। দাঙ্গা হাঙ্গামার ফলে উভয় পক্ষের কয়েকজন লোক আহত হয়। স্থানটি ছিল রংপুর জিলার অধীন। রংপুর ফৌজদারী আদালতে মামলা দায়ের হইলে মহাম্মাদী জামাতের পীর সাহেব ছয় মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। স্থানীয় কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি পীর সাহেবের পক্ষে আপিলের মামলা পরিচালনার জন্য শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক সাহেবকে নিয়োগ করার জন্য কলিকাতা যাইতে আমাকে অনুরোধ করেন। আমি তাঁহার অনুরোধ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া কলিকাতায় গিয়া জনাব হক সাহেবের সঙ্গে দেখা করিলাম। তাঁহাকে সমস্ত ঘটনা বলিয়া পক্ষ সমর্থনের জন্য অনুরোধ জানাইলাম। হক্ সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন—আসামী কি তোমার আত্মীয়? উত্তরে বলিলাম—জী না। আমার কেহ নহে।—তবে তুমি কেন আসিয়াছ? আমার বর্তমান অবস্থায় রংপুরে গিয়া আসামী পক্ষ সমর্থন করা সম্ভব নয়। সুতরাং তুমি পত্রপাঠ বিদায় হও। আমি সবিনয়ে বলিলাম—আসামী আমার কেহ নয় সত্য কিন্তু একজন পীর মানুষ বিপদে পড়িয়াছেন। ঐ অঞ্চলে তাঁহার প্রভাব প্রতিপত্তি যথেষ্ট রহিয়াছে। তাঁহার আত্মীয়স্বজনের অনুরোধে আমি আপনাকে লইতে আসিয়াছি। আপনাকে না লইয়া গেলে আমার যাওয়া চলিবে না। তিনি উঠিয়া ভিতরে চলিয়া গেলেন। এই সময় তাঁহার ভাগিনেয় নান্না মিঞা (সৈয়দ আজিজুল হক বি. এল.) তথায় আসিলেন। আমি তাঁহাকে সমস্ত ঘটনা বলিয়া হক সাহেব যাহাতে রংপুর যান তাহার ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করিলাম। হক সাহেব বাহিরে আসিয়াই আমাকে বলিলেন—তুমি চলিয়া যাও আমার যাওয়া

সম্ভব হইবে না। আমি দৃঢ়ভাবে বলিলাম—আপনাকে না লইয়া আমি কিছুতেই যাইব না। নান্না মিঞা বলিলেন—উনি যখন নাছোড়বান্দা তখন না গিয়া আর উপায় কি? ঐ তারিখে যেসব 'কেস্' আছে আমি উহার তদ্বির করিব। তিনি বলিলেন—পীর সাহেবের মোকদ্দমা টাকা পয়সা যাহা দিবে তাহা তো বুঝিতেই পারিতেছি। আমার দিকে তাকাইয়া বলিলেন—রেল ভাড়াটা কি আমাকেই দিতে হইবে, না তুমি দিবে? আমি বলিলাম—জী না, আপনার রেল ভাড়া যাবতীয় খরচ আমি বহন করিব। নির্দিষ্ট দিনে তিনি রংপুরে আসিয়া ডাক বাংলোয় উঠিলেন। মামলার কাগজপত্র দেখিয়া হতাশার স্বরে তিনি বলিলেন—বৃথায় আমাকে আনিয়াছ। এ মামলা আপিলেও কিছু হইবে না। পূর্বে কাগজপত্র দেখিলে আমি কখনই আসিতাম না। আইনের দিক দিয়া কোনই সুবিধা নাই। পীর সাহেবকে খোলাস করা যাইবে না। হইলও তাহাই। জজ সাহেব হক সাহেবের বাল্যবন্ধু ছিলেন। তিনি হাসিয়া বলিলেন—তুমি কলিকাতা হাইকোর্টের নামজাদা অ্যাডভোকেট, মামলার কাগজপত্র দেখিয়াছ; আমাকে বল আমি কি করিতে পারি? রায় প্রকাশ হইলে দেখা গেল পীর সাহেবের কারাদণ্ড ছয় মাসের স্থলে তিন মাস হইয়াছে। বলা বাহুল্য হক সাহেবকে যাতায়াত ব্যয় ব্যতীত বিশেষ আর কিছুই দেওয়া হয় নাই। এই স্বনামধন্য পুরুষ দেশ ও জাতির জন্য যাহা করিয়াছেন তাহার তুলনা নাই। কত লোককে তিনি কত ভাবে সাহায্য করিয়াছেন তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। অতিরিক্ত দানশীলতার জন্য তাঁহার অর্থসঙ্কট লাগিয়াই থাকিত। একদিন একটি দরিদ্র প্রার্থী তাঁহার নিকট কিছু প্রার্থনা করিল, তখন তাঁহার পকেটে কিছুই ছিল না। তিনি এক কাবুলির নিকট হইতে দশটি টাকা ধার লইয়া প্রার্থীকে বিদায় করিলেন। স্বচক্ষে এরূপ বহু ঘটনা দেখিয়াছি।

ডেপুটেশন

বাংলার কৃষক প্রায় দুই শত কোটী টাকা ঋণ জালে জড়িত হইয়া ধ্বংসের পথে চলিয়াছে। ইহাদিগকে রক্ষা করিতে না পারিলে দেশও ধ্বংস হইয়া যাইবে। কৃষকগণকে ঋণভার হইতে মুক্ত করার জন্য কৃষক প্রজা সমিতির মধ্য দিয়া দেশে তুমুল আন্দোলন চলিতেছিল। মৌলবী এ. কে. ফজলুল হক প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর কৃষকদিগকে ঋণ মুক্ত করিতে তৎপর হইলেন। ঋণ সালিসী বোর্ড গঠিত হইল। কিন্তু কো-অপারেটিভ সোসাইটির দেনা এই বোর্ডের আয়ত্ত হইতে বাদ দেওয়া হইল।

কো-অপারেটিভের দেনা বোর্ডের একতিয়ার ভুক্ত না হইলে এক শ্রেণীর কৃষক সর্বস্বান্ত হইবে বিবেচনায় কলিকাতায় কৃষক প্রজা সমিতির এক জরুরী মিটিং আহ্বান করা হইল। সভায় স্থির হইল কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তি এক ডেপুটেশনে মিলিত হইয়া ভারপ্রপ্ত মন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। কে-অপারেটিভের দেনা যাহাতে বোর্ডের অন্তর্ভুক্ত হয় তাহার জন্য চেষ্টা করিবেন। প্রস্তাব অনুযায়ী মৌলানা আকরাম খাঁ, মৌলভী তমিজউদ্দীন খাঁ, মৌলনা ইস্‌লামাবাদী, মৌলানা আব্দুল্লাহিল বাকী, মৌলভী রজিবুদ্দীন তরফদার, আরেফ রহমান শুধারামি, জালালউদ্দীন হাসেমী ও আমি কয়েকজনকে লইয়া এক ডেপুটেশন গঠিত হইল। পহেলা ডিসেম্বর অপরাহ্ণে বালীগঞ্জ সার্কুলার রোডে খাজা সাহেবের বাড়ীতে আমরা পৌঁছিলাম। খাজা সাহেব তখন আসরের নামাজ পড়িতেছিলেন। একটু পরেই তিনি আমাদের সঙ্গে দেখা করিলেন। চা-নাস্তার ব্যবস্থা হইল, তিনি আমাদের যুক্তি মানিয়া লইয়া, কো-অপারেটিভের দেনা বোর্ডের আওতাভুক্ত করিবেন বলিয়া কথা দিলেন। পরে কো-অপারেটিভের জন্য পৃথক ঋণ সালিসী বোর্ড গঠন হইয়াছিল। ঋণ সালিসী বোর্ডের কল্যাণে কোটী টাকার ঋণ হইতে কৃষক মুক্তি পাইয়াছিল। এইজন্য হক সাহেব, খাজা সাহেব, যাঁহারা এই বোর্ড গঠনে সাহায্য করিয়াছিলেন তাঁহারা অশেষ ধন্যবাদের পাত্র।

১৯৩৬ সাল ঃ প্রজা আন্দোলন

২৮ শে ফেব্রুয়ারি উত্তরবঙ্গ প্রজা সম্মেলন হিলিতে আহ্বান করা হইল। প্রসিদ্ধ অর্থনীতিবিদ নলিনীরঞ্জন সরকার সভাপতি নির্বাচিত হইলেন। মোহম্মদী পত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদক মৌলভী নজির আহম্মদ চৌধুরী সভার উদ্বোধন করেন। প্রায় বিশ সহস্র লোক সভায় যোগদান করেন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হিসাবে আমাকে একটি লিখিত ভাষণ দিতে হইয়াছিল। সভায় 'জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ করা হউক' বলিয়া প্রস্তাব পাস হয়। এই বৎসর নব যুগ সম্পাদক মৌলনা আহমদ আলী, মৌলভী সামসুদ্দীন আহমদ, সৈয়দ নওশের আলী, মৌলভী তমিজউদ্দীন খাঁ, সুভাষচন্দ্র বসু, ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ নেতাগণ হিলি আসিয়াছিলেন।

প্রজা সমিতির বাৎসরিক অধিবেশন

১৯৩৬ সালের ২৮শে কলিকাতা মোহাম্মদী অফিসে নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতির বাৎসরিক অধিবেশন বসিয়াছিল। অবসরপ্রাপ্ত বিভাগীয় কমিশনার খান বাহাদুর আবদুল মোমেন সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। বিশিষ্ট প্রজা কর্মীদের মধ্যে মৌলানা আবদুল হামিদ খাঁন, ভাসানী, বিখ্যাত সাহিত্যিক আবুল মনসুর আহমদ, জনাব আবু হোসেন সরকার, মৌলবী রজিবউদ্দীন তরফদার, শামসুউদ্দীন আহমদ, মৌলনা আবদুল্লাহিল বাকী, কবি কাজী নজরুল ইস্‌লাম, মৌলনা আহম্মদ আলী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। আগামী বৎসর সমিতির সভাপতি পদের জন্য মৌলানা আকরাম খাঁ ও জনাব এ. কে. ফজলুল হক সাহেবের নাম প্রস্তাবিত হয়। তুমুল বাদানুবাদের মধ্যে ভোট লইয়া দেখা গেল, মাত্র এক ভোটে হক সাহেব জিতিয়াছেন। কুষ্টিয়ার মৌলবী শামসুউদ্দীন আলমদ সাহেব সেক্রেটারি নিযুক্ত হইলেন। এই সভায় প্রজা সমিতির নাম পরিবর্তন করিয়া নিখিল বঙ্গ কৃষক প্রজা সমিতি রাখা হইল। সভায় জালালউদ্দীন হাসেমী সাহেবের সহিত সভাপতি মোমেন সাহেব ও আকরাম খাঁ সাহেবের সহিত কোন বিষয় লইয়া বাদানুবাদ হয়। সভা শেষে হাসেমী সাহেব মোমেন সাহেবের নিকট গিয়া সবিনয়ে বলেন—কিছু মনে করিবেন না, খাঁ বাহাদুর অনেক ঝগড়া করিয়াছি। মোমেন সাহেব হাসিয়া বলিলেন —মনে করিবার কিছুই নাই, হাসেমী সাহেব। আপনার এক পায়ের ঠেলাতেই অস্থির, দুই পা থাকিলে আমাদিগকে দেশ ছাড়িতে হইত। উভয়েই হাসিতে লাগিলেন। সভার কার্য শেষ হওয়ায় অনেকে চলিয়া যাইতেছিলেন। হাসেমী সাহেব কিছুদূর চলিয়া গিয়াছেন। আকরাম খাঁ সাহেব তাঁহার গমন পথের দিকে তাকাইয়া বিরক্তির সহিত বলিলেন—এই লোকটার এক পা নাই, আর-একটা পা কেহ ভাঙ্গিয়া দিতে পারে না? মৌলানা ভাসানী সাহেব বলিলেন—ঐ লোকটি এক পা লইয়া সমাজ ও জাতির বহু কল্যাণজনক বহু কার্য করিয়া আসিতেছে। ঐরূপ তেজস্বী ও স্পষ্টবাদী লোকের প্রয়োজন আছে। নূতন সভাপতি ও সেক্রেটারি পূর্ণ উদ্যমে কার্য চালাইতে লাগিলেন। দেশে প্রজা আন্দোলন জোরদার হইয়া উঠিল। কায়েমী স্বার্থবাদীরা শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। দেশব্যাপী নির্বাচনে জয় লাভ করিতে হইবে। প্রজা সমিতির প্রার্থী না হইলে ইলেকশনে জয় লাভ করা সম্ভব হইবে না বলিয়া অনেকের ধারণা হইল। ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়, নবাব কে. জি. এম. ফারুকী প্রমুখ ব্যক্তিগণ প্রজা সমিতিতে যোগ দিয়া মেম্বার প্রার্থী হইয়া ছিলেন।

বগুড়া কৃষক সমিতির সভা

২রা অক্টোবর বগুড়া টাউনের এক বিরাট প্রজা সভা আহ্বান করা হয়। ডাক্তার মফিজউদ্দীন আহমদ, হেকিম আকবর হোসেন, কবিরাজ আবদুল আজিজ প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এই সভার আয়োজন করিয়াছিলেন। বাংলার মুকুটহীন রাজা এ. কে. ফজলুল হক এই সভার সভাপতি নির্বাচিত হন। তিনি বগুড়ায় আসিলে এক বিরাট জনসমুদ্র স্টেশন হইতে অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাকে ডাক বাংলোয় লইয়া যান। বগুড়ার জমিদার খান বাহাদুর হাফিজার রহমান চৌধুরী হক সাহেবের পুরাতন বন্ধু। তিনি ডাক বাংলোয় আসিয়া হক সাহেবের সহিত দেখা করিলেন। তাহার বাড়ীতে না গিয়া কেন ডাক বাংলোয় উঠিলেন প্রশ্ন হইল। হক সাহেব বলিলেন—তুমি আমার বন্ধু হইলেও জমিদার, আমরা জমিদারী স্বার্থ উচ্ছেদ করিতে কৃতসঙ্কল্প। এই উদ্দেশে সভা আহুত হইয়াছে। আমি সভাপতি হইয়া আসিয়াছি। এ অবস্থায় তোমার আতিথ্য গ্রহণ করা সঙ্গত মনে করি নাই। খান বাহাদুর সাহেব বলিলেন—তোমার এই যুক্তি আমি মানি না। রাজনৈতিক মতামতের সঙ্গে বন্ধুত্বের কোন সম্বন্ধ নাই। আমি তোমাকে লইতে আসিয়াছি। যাহা হউক, শেষে স্থির হইল হক সাহেব ডাক বাংলোতেই থাকিবেন কিন্তু আহারের ব্যবস্থা খান বাহাদুরের বাড়ীতেই হইবে। সভায় বিপুল জনসমাগম হয়। জমিদারী উচ্ছেদপ্রস্তাব সভায় গৃহীত হয়। কৃষক প্রজা আন্দোলনের অন্যতম নেতা জনাব রজিবউদ্দীন তরফদার এই সভায় যোগদান করেন নাই। কৃষক প্রজা সমিতি গঠিত হইলেও তিনি তাঁহার পুরাতন নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি ভাঙ্গিয়া দেন নাই, সভাপতি হক সাহেব প্রকাশ্য সভায় উভয় দলকে মিলিয়া মিশিয়া কাজ করার জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। বিশেষ জরুরী কার্যে তিনি থাকিতে পারিবেন না বলিয়া জনাব আবদুল্লাহিল বাকী সাহেবের উপরে উভয় দলের মীমাংসার ভার দিয়া যান। রাত্রিতে খান বাহাদুর সাহেবের বাড়ীতে হক সাহেব, মৌলানা সাহেব, ও আমরা ২৫।৩০ জন দাওয়াত আদায় করিলাম। বৃদ্ধ খাঁন বাহাদুর সাহেব স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া ভুরি ভোজে আমাদিগকে আপ্যায়িত করিলেন। পরদিন সকালে মৌলানা বাকী সাহেবের সভাপতিত্বে উভয় দলের কর্মীদিগের এক বৈঠক বসিল। মৌলানা সাহেব আসন্ন ইলেকশনে

সকলকে দলাদলি ত্যাগ করিয়া একত্রে কাজ করার জন্য অনুরোধ করিলেন। তাঁহার অনুরোধে তরফদার সাহেব পুরাতন প্রজা পার্টি ভাঙ্গিয়া দিয়া তাঁহার দলবল সহ নূতন কৃষক প্রজা সমিতিতে যোগদান করিতে স্বীকৃত হইলেন।

প্রাদেশিক কাউন্সিলের মেম্বর—ইলেকশনের তোড়জোড় আরম্ভ হইল। ডিসেম্বরের মাঝামাঝি প্রার্থিগণ নমিনেশন পেপার ফাইল করিলেন, আমিও দাঁড়াইলাম। প্রতিদ্বন্দ্বী দাঁড়াইলেন দুই জন। আমার বাল্য বন্ধু দিনাজপুরের সরকারী উকিল খান সাহেব তজম্মল আলী, ও জনাব আব্দুল জব্বার বি.এল.। ভোটযুদ্ধ পুরাদমেই চলিতে ছিল। কিন্তু হঠাৎ মধ্যপথে খান সাহেব সরিয়া পড়িলেন। তিনি শুধু সরিয়াই পড়িলেন না, আমার প্রতিপক্ষ জব্বার সাহেবকে সমস্ত শক্তি দিয়া সাহায্য করিতে লাগিলেন। বিত্তশালী উভয়ের সমস্ত শক্তির নিকট আমাকে পরাজয় বরণ করিতে হইল।

অল্প ভোটে হারিয়া গেলাম। বিভিন্ন জেলায় অধিকাংশ প্রজাকর্মী জয় লাভ করিয়াছিলেন। বগুড়ার প্রতাপশালী জমিদার নবাবজাদা আলতাফ আলী, প্রজা-কর্মী রজিবউদ্দীন তরফদারের নিকট বহু ভোটে হারিয়া যান।

১৯৩৭ সাল

নির্বাচনের পর হিন্দুপ্রধান প্রদেশগুলিতে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। মুসলমানপ্রধান চারটি প্রদেশেও মোসলেম লীগ প্রার্থিগণ সংখ্যা-গরিষ্ঠতা লাভ করিতে পারে নাই। বাংলায় কৃষক প্রজা পার্টির সংখ্যাধিক্য ছিল। কংগ্রেসীরা মন্ত্রী হইয়া রাজবন্দীদিগকে ছাড়িয়া দেন। বাংলার বন্দীদের মুক্তি লইয়া হক মন্ত্রিসভার উপরে কংগ্রেসীরা অত্যাধিক চাপ দিতে লাগিলেন। হক সাহেব ফাঁপরে পড়িলেন। কংগ্রেস, কৃষক প্রজা পার্টি, মোসলেম লীগ জমিদার ও ইউরোপীয়ান দলগুলি নিজ নিজ স্বার্থ লইয়া কোন্দল উপস্থিত করিল। হক মন্ত্রিসভা প্রধানতঃ ইউরোপীয়ানগণের সমর্থনের উপরে নির্ভর করিত। উহারা বন্দীমুক্তির বিরোধী। ভারতশাসন আইন ১৯৩৭ সালের এপ্রিল হইতে চালু হইবে বলিয়া কথা ছিল। কংগ্রেসীরা মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিয়া মুসলমানদের স্বার্থের প্রতি অত্যন্ত ঔদাসিন্য দেখাইতে লাগিলেন। মৌলানা আহম্মদ আলী, হাকিম আজমল খাঁ, ডাক্তার আনসারী প্রমুখ বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতৃবর্গ প্রায় অনেকে তখন পরলোকে। লক্ষ লক্ষ মুসলমান স্বাধীনতা-সংগ্রামে যোগ দিয়া অশেষ নির্যাতন সহ্য করিয়াছিলেন। কংগ্রেসী হিন্দুরা মন্ত্রিত্ব পাইয়া মুসলমানদের

কথা ভুলিয়া গেলেন। মিঃ জিন্না ও মোসলেম নেতৃবর্গ সকলের স্বার্থের প্রতি সুবিচার করিয়া শাসনকার্য চালাইতে কংগ্রেসীদের অনুরোধ জানাইলেন। কিন্তু সে অনুরোধে তাঁহারা কর্ণপাত না করায় মুসলমানগণ কংগ্রেসের প্রতি বিরক্ত হইয়া উঠিল। কংগ্রেসী শাসনের পরিণাম চিন্তা করিয়া তাঁহারা শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। এ কথা সত্য কংগ্রেস ও বর্ণহিন্দু যদি মুসলমানদের ন্যায্য দাবি-দাওয়ার প্রতি সুবিচার করিতেন তবে ভারত বিভাগের প্রশ্ন আসিত না। হিন্দু-মুসলমানের মিলিত দুর্জয় শক্তি কংগ্রেসের মধ্য দিয়া ইংরেজ তাড়াইয়াছে। আবার হিন্দুদের স্বার্থপরতা ও অনুদারতা পাকিস্তান সৃষ্টির কারণ হইয়াছে। কানপুরের মৌলানা হসরত মোহানী ছিলেন একনিষ্ঠ ও কংগ্রেসকর্মী। উর্দু সাহিত্যের খ্যাতনামা লেখক ও কবি। মুক্তিসংগ্রামে বহুবার তাঁহাকে কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইয়াছিল। তিনি স্বেচ্ছায় কখনও জেলে প্রবেশ করেন নাই। পুলিশ পাঁজাকোলা করিয়া তাঁহাকে ট্যাক্সিতে উঠাইত আবার ঐ ভাবেই নামাইয়া লইয়া জেলের মধ্যে রাখিয়া আসিত। ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার কথা কংগ্রেসের যখন চিন্তার অতীত ছিল মৌলানা হসরত মোহানী তখন কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রস্তাবে কংগ্রেস নেতৃগণ শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। স্বয়ং মহাত্মা গান্ধীও ইহা সমর্থন করেন নাই। পরবর্তী কালের মহাত্মাজীর 'কুইট ইণ্ডিয়া' প্রস্তাব দূরদর্শী মৌলানা হসরত মোহানীর পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাবের নূতন রূপ তাহাতে কোন সন্দেহ আছে কি? মোসলেম লীগ কংগ্রেসের বিরুদ্ধে মোসলেম নির্যাতনের গুরুতর অভিযোগ উপস্থিত করেন এবং অভিযোগগুলির সত্যতা প্রমাণের জন্য পীরপুরের নাগা সাহেবকে সভাপতি করিয়া একটি তদন্ত কমিটি গঠিত হয়। কমিটি ঘটনাগুলি তদন্ত করিয়া যে যে রিপোর্ট দেন উহাই 'পীরপুর রিপোর্ট' নামে খ্যাত। রিপোর্টে অভিযোগগুলির সত্যতা স্বীকৃত হয়। এই রিপোর্ট মুসলমান সমাজে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। একদল মুসলমান কংগ্রেস শাসনের হাত হইতে কিরূপে মুক্তি পাওয়া যায় তাহার চিন্তা করিতে থাকেন, কংগ্রেসের ভক্ত সেবক মৌলানা হসরত মোহানী হিন্দুদের অনুদারতায় ব্যথিত হইয়া সর্বপ্রথম মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র আবাসভূমির কথা চিন্তা করেন। ইহাই পরিণামে পাকিস্তানের রূপ ধারণ করিয়া আত্মপ্রকাশ করে।

দিনাজপুরে হক সাহেব

স্থানীয় জমিদার রায় বাহাদুর পূর্ণেন্দুনারায়ণ রায় দিনাজপুর সদর হাসপাতালে রোগীদের অবস্থানের জন্য একটি পাকা গৃহ নির্মাণ করিয়া দেন। উক্ত গৃহের দ্বারোদ্ঘাটন উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী হক সাহেব দিনাজপুর আসিয়াছিলেন। মৌলানা বাকী ও দিনাজপুরের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ সার্কিট হাউসে তাঁহার সহিত সাক্ষাত করিয়া বহু বিষয়ে আলোচনা করেন। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ কৃপালনী রায় বাহাদুর স্বয়ং ও স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে সঙ্গে লইয়া হক সাহেব নবনির্মিত গৃহের দ্বারোদ্ঘাটন করেন। স্থানীয় ডাক্তার আশু বাবু জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কৃপালনী সাহেবকে বলিলেন—সার্, শুনিয়া বড় দুঃখিত হইলাম আপনি নাকি এখান হইতে চলিয়া যাইতেছেন। আপনার ন্যায় উদারহৃদয় দয়ালু শাসনকর্তা দিনাজপুরে আর কেহ আসেন নাই। কৃপালনী সাহেব হাসিয়া বলিলেন—আপনি তো প্রত্যেক ম্যাজিস্ট্রেটের বদলির সময় এইরূপ কথা বলিয়া থাকেন। তোষামোদ করা ছাড়া আমি তো আপনার কোন লাভ দেখি না। ভদ্রলোক অপ্রস্তত হইয়া তথা হইতে সরিয়া পড়িলেন। গৃহপ্রবেশ উৎসব শেষ হইল। অপরাহ্ণে এক বিরাট জনসভায় হক সাহেব বক্তৃতা করিলেন। রাত্রে দিনাজপুর মোসলেম লীগের নেতা মৌলবী কাদের বক্স্ বি.এল. কৃষক প্রজা পার্টির নেতা মৌলবী ফজলে হক, মৌলভী আব্দুর রহমান সৈয়দী, মৌলভী মনিরুদ্দীন আনয়ারী, মাওলানা আব্দুল্লাহিল বাকী প্রভৃতি মুসলিম নেতাগণ হক সাহেবের সহিত মৌলভী কাদের বক্স সাহেবের কাউন্সিল ইলেক্শনে পরাজয়ের বিষয় লইয়া আলোচনা করেন। তাঁহাকে আপার চেম্বারে দাঁড় করানো যায় কি না ইহা লইয়া আলোচনা হইল। হক সাহেবের মত লইয়া কাদের বক্স্ সাহেবকে আপার চেম্বারে দাঁড করানো স্থির হইল। যথা সময় আমরা সদলবলে কলিকাতায় গিয়া বহু চেষ্টায় তাঁহাকে ভোট-যুদ্ধে জয়ী করিয়া দিলাম। বিপুল উত্তেজনায় ও হট্টগোলের মধ্যে রাত্রি তিন ঘটিকার সময় এসেম্বলী হাউসে ভোট গণনা শেষ হইল। জনাব মওলানা আকরম খাঁ সাহেব জয়লাভ করেন। কাদের বক্স্ সাহেব ছিলেন দিনাজপুরের একজন খ্যাতনামা উকিল। দেশ ও জাতির উন্নতিকল্পে সারা জীবন তিনি খাটিয়া যান। বাবু যোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী, বাবু নিশীথনাথ কুণ্ডু, অবিনাশচন্দ্র সেন, গুরুদাস তালুকদার প্রমুখ হিন্দু নেতাগণ খাঁটি দেশপ্রেমিক ছিলেন। দিনাজপুরের বিশেষত্ব এই যে, এখানে কখনো হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয় নাই। সারা বাংলাদেশে এই-রূপ আর-একটি জেলাও বোধ হয় পাওয়া যাইবে না।

১৯৩৮ সাল

আমি দীর্ঘ দিন যাবৎ দিনাজপুর লোকাল বোর্ডের মেম্বার ছিলাম। এবার জানুয়ারি মাসে ইলেকশনে পুনরায় মেম্বার হইলাম। তখন নিয়ম ছিল লোকাল বোর্ডের মেম্বারদের মধ্য হইতে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের মেম্বার নির্বাচিত হইবেন। মৌলানা বাকী সাহেব সহ আমরা একদিন প্রার্থী দাঁড়াইলাম। নমিনেশনের মেম্বর ও সরকার-সমর্থক দলটি আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হইল। ভোটাভুটিতে দেখা গেল উভয় দলের ভোটসংখ্যা সমান হইয়াছে। লটারির ব্যবস্থা হইল: আমরা দল শুদ্ধ হারিয়া গেলাম। লটারির কৌশল ধরিতে পারিলাম না।

একদিন বাড়ীতে বসিয়াছি একটি প্রৌঢ় ব্যক্তি দীর্ঘ পথ পদব্রজে অতিক্রম করিয়া আমার সহিত দেখা করিল। তাহাকে আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল—মুশকিল হইতেছে বাবাজী, তিন টাকা দিয়া একটা বকরী কিনিয়াছিলাম। বকরীটা দুই দিন হইল আর পাই না। তোমাকে যখন ভোট দিয়াছি তখন খবরটা দেওয়া দরকার। আমি তো অবাক। আমাকে ভোট দিয়াছ বলিয়া তোমাকে হারানো বকরীটি আমাকে খুঁজিয়া দিতে হইবে এ কথা তোমাকে কে বলিল? তাহাকে বুঝাইয়া বলিলাম—বকরী যদি চুরি হইয়া থাকে থানায় খবর দাও। নিজে খোঁজ করিয়া দেখ। তোমার বকরী খোজের জন্য আমি মেম্বার হই নাই। জন সাধারণের অজ্ঞতা তখন কত বেশী ছিল।

আগস্ট মাসে কলিকাতায় হিন্দু-মুসলমানে ভীষণ দাঙ্গা আরম্ভ হইল। বহু খুনাখুনি হওয়ায় কলিকাতার আবহাওয়া উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। হিন্দুপ্রধান অঞ্চলে মুসলমানের ও মুসলমানপ্রধান অঞ্চলে হিন্দুর অবস্থান বিপজ্জনক হইয়া উঠিল; মসজিদের সম্মুখে বাদ্য বাজানো, গো-কোরবানী প্রভৃতি বিষয় লইয়া ঝগড়ার সৃষ্টি হইত। আবার রাজনৈতিক মতভেদ লইয়া দলাদলি, গুণ্ডাদের তৎপরতায় গুরুতর দাঙ্গা-হাঙ্গামার সৃষ্টি হইত। বন্দীমুক্তি লইয়া কংগ্রেস হক সাহেবের কোয়ালিশন মন্ত্রিসভার উপরে চাপ দিতে লাগিলেন। হক সাহেবের একান্ত ইচ্ছা থাকিলেও গদী রক্ষায় সরকারী ও ইউরোপীয়ান দলের জন্য তিনি পারিয়া উঠিতে ছিলেন না। এই গণ্ডগোলের মধ্যে হক সাহেবের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনিত হইল। প্রস্তাব পাস হইল না বটে কিন্তু বিক্ষুব্ধ হিন্দুজনতার হাত হইতে রক্ষা পাওয়া কঠিন হইয়া উঠিল। বাহিরের গুণ্ডাদের আনাগোনা ও দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া এসেম্বলী

হলে প্রবেশ করিলাম। হক সাহেবকে ও তাহার দলের লোকদিগকে সমস্ত অবস্থা জানাইলাম। হক সাহেব তৎক্ষণাৎ লাল বাজার পুলিশ কমিশনারের নিকট ফোন করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে 'লরী' বোঝাই হইয়া লাঠি ও বন্দুকধারী পুলিশ আসিয়া পৌঁছিল। গুণ্ডারা পলাইয়া গেল। বিক্ষুব্ধ জনসাধারণ ছত্রভঙ্গ হইল। পুলিশের তৎপরতায় অঘটন কিছু ঘটিতে পারিল না। অপমানের ভয়ে বহু কাউন্সিলার রাত্রে বাড়ী ফিরিতে সাহস করিলেন না। অ্যাসেম্বলী হলেই তাঁহারা রাত্রি যাপনের ব্যবস্থা করিয়া লইলেন।

৩রা আগস্ট সুভাষচন্দ্র বসুর 'এলগিন' রোডের বাড়ীতে বর্তমান হিন্দু-মুসলমান পরিস্থিতি সম্বন্ধে আলোচনা ও কর্তব্য নির্ধারণের জন্য এক বৈঠক বসিল। কয়েক জন মন্ত্রী, কাউন্সিলের মেম্বর ও হিন্দু-মুসলমান নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। বিদেশী শাসককে তাড়াইয়া দেশকে মুক্ত করিতে হইলে কংগ্রেস পতাকাতলে সমবেত হইয়া সংগ্রাম চালাইতেই হইবে। কংগ্রেস ও বিপ্লবী দল ব্যতীত ভারতের কোন প্রতিষ্ঠান ইংরেজের সহিত প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অবতীর্ণ হয় নাই। সুতরাং যাহা কিছুই হউক আমাদিগকে একতাবদ্ধ হইয়া সংগ্রাম চালাইয়া যাইতে হইবে বলিয়া স্থির হইল। সভায় শরৎচন্দ্র বসু, সুভাষচন্দ্র বসু, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ও মৌলানা আবদুল্লাহিল বাকী বক্তৃতা করলেন। সভা শেষে পোলাও কোর্মা, দধি, মিষ্টান্নের ব্যবস্থা ছিল প্রচুর। মুসলমান বাবুর্চিগণ পরিবেশন করিতেছিল। শতাধিক নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের মধ্যে আমরা প্রায় ২৫।৩০ জন মুসলমান ছিলাম। কোর্মার গোস্ত হালাল কিনা ইহা লইয়া সন্দেহ উপস্থিত হইল। আমরা ইতস্ততঃ করিতেছি দেখিয়া সুভাষ বাবু স্বয়ং আসিয়া আমাদের সন্দেহ ভঞ্জন করিলেন। তিনি বলিলেন—এই মুসলমান বাবুর্চিগণই আমাদের দৈনন্দিন আহার্য প্রস্তুত করিয়া থাকেন। মুসলমান কসাই মাংস সরবরাহ করে। সুতরাং জাতি যাওয়ার ভয় নাই। বিলাতফেরতা হিন্দু বাড়ীতে আকসার মুসলমান বাবুর্চিগণ রান্না করিয়া থাকে। এই বৈঠকে কতিপয় প্রধান হিন্দুনেতা অনুপস্থিত থাকার পর দিন সুভাষ বাবুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ব্যারিস্টার শরৎচন্দ্র বসুর এক নম্বর উডবর্ন পার্কের বাড়ীতে দ্বিতীয় বৈঠক আহুত হয়। প্রথম বৈঠকের অনুরূপ প্রস্তাব এখানেও গৃহীত হয়।

দার্জিলিং

অক্টোবর মাসের শেষ ভাগে অর্থমন্ত্রী নলিনীরঞ্জন সরকার মহাশয়ের আহ্বানে দার্জিলিং রওয়ানা হইলাম। শিলিগুড়ি হইতে দার্জিলিং যাওয়ার মোটর ও রেলপথ আছে। এই ৫০ মাইল পার্বত্য পথ প্রস্তুত করিতে অদ্ভুত ইঞ্জিনিয়ারীং কৌশল প্রদর্শিত হইয়াছে। রেল ও মোটর পথ পাশাপাশি চলিয়াছে। দক্ষিণ ভারতের সাউথ মারহাট্টা রেলের পার্বত্য পথে আমি ভ্রমণ করিয়াছি। কিন্তু এপথের সহিত তুলনা হয় না। স্থানে স্থানে রেল লাইন পশ্চাৎ দিকে সরাইয়া আনিয়া ক্রমশঃ উর্ধ্বগামী করা হইয়াছে। গভীর খাদের পার্শ্ব দিয়া ট্রেন ও মোটর চলিবার কালে যাত্রিগণের আতঙ্ক বাড়িয়া যায়। আমরা মোটরে চলিয়াছি। আঁকাবাঁকা পথে বার বার মোড় ঘুরিয়া গাড়ী চলিয়াছে। আমার সহযাত্রী বমি করিতে লাগিলেন। আরও কয়েকজন যাত্রীর একই অবস্থা দেখিলাম। আমরা পার্বত্য পথের মনোরম দৃশ্য দেখিতে দেখিতে চলিয়াছি। পাহাড়ের গায়ে চা ও কমলালেবুর বাগান। 'টী গার্ল'গণ ক্ষিপ্রহস্তে পাতা ছিঁড়িয়া পৃষ্ঠে রক্ষিত ঝুড়িতে ফেলিতেছে। দুই হাত সমানে চলিতেছে। উর্ধ্বমুখী কমলালেবুগুলি তখন সুপক্ক হয় নাই। পৌষ মাসে আসাম অঞ্চলে কমলালেবুর বাগানে যে অতুলনীয় শোভা দেখিয়াছি এখন অসময়ে এখানে তাহা নাই। পর্বত সানুদেশে 'তরাই' অঞ্চলে বিরাট শালবন ও জঙ্গলে বিভিন্ন শ্রেণীর হিংস্র পশু বাস করে। বৃক্ষশাখায় পাখীর কূজন ভাবুক চিত্তে দোলা দেয়। পর্বতগাত্রে পাইন ও দেবদারু বৃক্ষের সারি রজতশুভ্র ঝর্ণা আর বনজ কুসুমের সৌরভ প্রকৃতির স্বাভাবিক সৌন্দর্য মানুষকে মুগ্ধ করিয়া থাকে। কার্শিয়াং দার্জিলিং-এর একটি মহকুমা। এখানে রেল কোম্পানীর কারখানা আছে। আমরা শীতে কাঁপিতেছি। ৮ হাজার ফিট উচ্চ 'ঘুম' স্টেশন অতিক্রম করিয়া দার্জিলিং পৌঁছিলাম। অক্টোবর মাস, কার্শিয়াং হইতেই শীতের প্রকোপ অনুভব করিতেছিলাম। কম্বল মুড়ি দিয়া রেল স্টেশন হইতে স্থানীয় একমাত্র প্রতিষ্ঠান 'আঞ্জুমানে ইসলামিয়ার' মুসাফির খানায় আশ্রয় লইলাম। মসজিদ ও মুসাফিরখানার পরিচালকগণ বাঙালী নহেন। কর্তৃপক্ষের ব্যবহার প্রসংশনীয়। বিনা খরচে সাধারণতঃ তিন দিন এইখানে থাকা যায়। কার্তিক মাসেই প্রচণ্ড শীত।

দার্জিলিং শহর সমতল নহে পাহাড়ের গায়ে উঁচু নিচু বাড়ী ঘর। পাহাড় কাটিয়া সমতল ভুমিতে বাজার বসান হইয়াছে। রাস্তাগুলি সুন্দর পীচ ঢালা, চড়াই

উত্তরাই ব্যতীত যাতায়াত করা চলে না। ছোট ছোট টিলার উপরে বড় লোকদের সুন্দর সুন্দর বাড়ী। রাজা জমিদারদের গ্রীষ্মাবাস। অব্জার্ভেটারী হিলে মাল রোডের পার্শ্বে গভর্নরের গ্রীষ্মাবাস। বড় সুন্দর সজ্জিত দোকানপাট, সিনেমা হল, খেলাধূলার মাঠ আর পুষ্পোদ্যান স্থানটিকে মনোরম করিয়া তুলিয়াছে। বিকালে বিচিত্র বেশধারী নরনারী সমাগমে মুখর হইয়া উঠে। পরদিন আমরা সূর্যোদয়ের সময় কাঞ্চনজঙ্ঘার অনুপম দৃশ্য দর্শন করিলাম। শুভ্র তুষারাবৃত পর্বতগাত্রে নবারুণ স্বর্ণ-কিরণে উদ্ভাসিত হইয়া অতুলনীয় সৌন্দর্যের সৃষ্টি করিয়াছে। উহা ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভবপর নহে। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার মহাশয়ের বাড়ীতে চায়ের টেবিলে বসিয়া উন্মুক্ত গবাক্ষপথে কাঞ্চনজঙ্ঘার এই অতুলনীয় দৃশ্য আমরা উপভোগ করিলাম। সর্ব উচ্চ শৃঙ্গ এভারেস্ট এখান হইতে দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রায় আড়াই মাইল উচ্চ এই অজেয় শৃঙ্গ তেনজিং ও হিলারীর নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া কৌলিন্য হারাইয়া ফেলিয়াছে। সরকার মহাশয়ের সঙ্গে কতকগুলি বিষয় হইয়া আলোচনা হইল। তিন দিন অবস্থানের পর প্রকৃতির রম্য কানন বিলাসনগরী দার্জিলিং ত্যাগ করিয়া রেলপথে বাড়ী ফিরিলাম।

কলিকাতায় প্রজাসভা

অক্টোবর মাসের শেষ ভাগে প্রাদেশিক কৃষক প্রজাসমিতির কার্যকরী সভা কলিকাতা বেনিয়াপুকুরের একটি বাড়ীতে আহ্বান করা হয়। আমি ও মৌলানা বাকী সাহেব সভায় যোগদানের উদ্দেশ্যে কলিকাতায় গিয়া কৃষিমন্ত্রী জনাব শামস্-উদ্দীন আহম্মদ সাহেবের আতিথ্য গ্রহণ করি। সৈয়দ নওশের আলী, সৈয়দ মজিদ বখ্স্, সৈয়দ জালালউদ্দীন হাসেমী, আবুল মনসুর আহম্মদ, কবি হুমায়ুন কবির, মৌলানা আকরাম খাঁ, মৌলানা ইস্লামাবাদী প্রমুখ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। মৌলানা আবদুল্লাহিল বাকী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। দুই দিন ধরিয়া সভার কার্য চলিয়াছিল। আসামের মন্ত্রী জনাব আবদুল মতিন চৌধুরী সাহেবের সঙ্গে এইখানেই আমার প্রথম আলাপ হয়। শ্রীহট্টের এক অভিজাত পরি-বারে তাঁহার জন্ম হয়, কর্মজীবনে তাঁহার সহিত প্রগাঢ় প্রীতির সম্পর্ক স্থাপিত হইয়া-ছিল। দুঃখের বিষয় দেশ ও জাতির এই একনিষ্ঠ সেবক অকালে পরলোকে চলিয়া গিয়াছেন। বিখ্যাত সাহিত্যিক জনাব আবুল মনসুর আহম্মদ তখন কলিকাতা হইতে দৈনিক কৃষক পত্রিকা প্রকাশ করিতেছিলেন। কৃষক পত্রিকার অফিসে বসিয়া

আমাদের দীর্ঘ আলোচনা চলিত, কোন কোন দিন কবি নজরুল ইসলাম আমাদের সঙ্গে আলোচনায় যোগ দিতেন। নজরুল বয়সের দিক দিয়া আমর চাইতে নয় বৎসরের ছোট। এই যুগপ্রবর্তক কবিকে আমরা অন্তরের সহিত ভালবাসিতাম। নজরুলের হাসি আর নজরুলের গান আমাদিগকে মাতাইয়া তুলিত। আত্মপর ভেদাভেদ তাঁহার ছিল না। সুন্দর গোলগাল প্রতিভাদীপ্ত চেহারা, এক মাথা ঝাঁকড়া চুল, গায়ে আলখিল্লা, কথায় কথায় উচ্চ হাসি আর উজ্জ্বল দুইটি চক্ষু মানুষকে সম্মোহিত করিত। হায় দুর্ভাগ্য, তিনি আজ আমাদের মধ্যে থাকিয়াও নাই!

(৪৯)

১৯৩৯ সাল : ঋণ সালিসী বোর্ড

দেশব্যাপী প্রজা আন্দোলনের ফলে প্রায় দুই শত কোটি টাকা ঋণজালে জর্জরিত কৃষককুলকে মুক্তি দানের উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী হক সাহেবের চেষ্টায় বাংলা দেশে বাট হাজার ঋণ সালিসী বোর্ড গঠন করা হয়। সাধারণতঃ পাঁচ জন মেম্বর লইয়া বোর্ড গঠিত করা হইয়াছিল। হিলি তখন উত্তরবঙ্গের প্রসিদ্ধ ব্যবসাকেন্দ্র। ষোলটি রাইস মিলের জন্য লক্ষ লক্ষ মণ ধান চাউল এইখানে আমদানি হইত ও রপ্তানি হইয়া যাইত। মিলের মালিকগণ ছিলেন সুশিক্ষিত ও প্রভাবশালী হিন্দু। ইঁহারা থাকিতে আমার ন্যায় একজন সাধারণ মধ্যবিত্ত মুসলমানকে চেয়ারম্যান করিয়া, ঋণ সালিসী বোর্ড গঠিত করায় অনেকেই ক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন। বোর্ডের মেয়াদ ছিল পাঁচ বৎসর। এই সময়ের মধ্যে গঠিত এলাকায় কৃষকদের ঋণের মীমাংসা করিয়া দিতে হইবে। কিন্তু সকল বোর্ডের পক্ষে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কার্য সমাধা করা সম্ভব হয় নাই। পাঁচ বৎসর পর সরকার অধিকাংশ বোর্ড উঠাইয়া দিয়া অমীমাংসিত মামলাগুলির নিষ্পত্তির জন্য কয়েকটি থানা লইয়া একটি করিয়া বোর্ড রাখিয়া দিলেন। নিকটবর্তী তিনটি থানার মামলাগুলির নিষ্পত্তির ভার হিলি বোর্ডের উপরে পড়িল। সুতরাং ১৯৩৯ সাল হইতে ১৯৪৫ পর্যন্ত আমাকে প্রায় সাত বৎসর চেয়ারম্যানের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। দীর্ঘ দিন এই অবৈতনিক কার্যে সন্তুষ্ট হইয়া সরকার আমাকে এঙ্গলো সুইস কোম্পানীর একটি মূল্যবান ঘড়ি উপহার দিয়াছিলেন। বঙ্গ-শার্দুল ফজলুল হকের এই অবিস্মরণীয় কীর্তি দেশের সর্বহারা কৃষককুলকে রক্ষা করিয়াছে।

জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ

সুদখোর মহাজনেরা কতকটা সায়েস্তা হইল বটে কিন্তু জমিদারী প্রথার কি হইবে? বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় তুমুল বাগবিতণ্ডার পর জমিদারী প্রথা সম্বন্ধে কর্তব্য নির্ধারণের জন্য একটি কমিটি গঠিত হইল। কমিটির মেম্বর মনোনীত হইলেন জমিদার পক্ষে বর্ধমানের মহারাজা বিজয়চাঁদ মহাতাব ও গৌরীপুরের জমিদার বীরেন্দ্র-কিশোর রায়চৌধুরী, প্রজা পক্ষে খান বাহাদুর আবদুল মোমেন, খান বাহাদুর হাসেম আলী ও সৈয়দ মোয়াজ্জমউদ্দীন হোসেন। সার্ ফ্রান্সিস ফ্লাউড এই কমিটির চেয়ারম্যান মনোনীত হইলেন। কমিটি দীর্ঘ দিন আলোচনা করিয়া রিপোর্ট দিলেন, সরকার ও প্রজার মধ্যে সমস্ত মধ্যস্বত্ব লুপ্ত করা হউক। জমিদারী জোতদারী প্রভৃতি উচ্ছেদ করিয়া প্রজা শুধু সরকারকেই খাজনা দিবেন। জমিদারী ও মধ্যস্বত্ব ভোগিগণ একটা নির্দিষ্ট ক্ষতিপূরণ পাইবেন। স্বাধীনতা-আন্দোলনের ধাক্কায় দিশাহারা ইংরেজ সরকার এই রিপোর্ট অনুযায়ী কোন কার্য করিতে সাহায্য করে নাই। দেশ বিভাগের পর ১৯৫৩ সালে জনাব আবু হোসেন সরকারের মন্ত্রিত্বের আমলে এই আইন কার্যকারী করা হয়। আমরা মধ্যবিত্ত শ্রেণী স্বখাত সলিলে ডুবিলাম জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের জন্য আমরা সারা দেশ ব্যাপিয়া তুমুল আন্দোলন চালাইয়াছি। জমিদারী প্রথা ভাল কি মন্দ ছিল সে কথা আলোচনা করার কোন সার্থকতা এখন আর নাই। দেশে যেমন অত্যাচারী জমিদার ছিল তেমনি হাজী মোহাম্মদ মহ্‌সিন, মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, নবাব আবদুল গনির মত বদান্য জমিদারেরও অভাব ছিল না। জমিদারেরা ইংরেজ সরকারকে প্রায় তিন কোটি টাকা খাজনা দিয়া ত্রিশ কোটি টাকা প্রজার নিকট হইতে আদায় করিতেন। জমিদারী প্রথা লুপ্ত হইলে সরকারকে তিন কোটি টাকার স্থলে পনর কোটি টাকা দিলেও প্রজার খাজনা অর্ধেক হইয়া যাইবে। বিশেষতঃ যাঁহারা এতকাল ধরিয়া আমাদের উপরে প্রভুত্ব করিয়াছেন, তাঁহারা আমাদের সমশ্রেণী ভুক্ত হইবে—এই রূপ ধারণা আমাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়াছিল। এই ধারণা লইয়াই জমিদারের বিরুদ্ধে আমরা উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিলাম। আমাদের দাবী ছিল শুধু জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ করা, কিন্তু ফ্লাউড কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী সরকার সমস্ত মধ্যস্বত্ব উচ্ছেদ করিলেন। এমনকি চুক্তি, ধানের জমিগুলি (চাহুয়া আধি) কাড়িয়া লইয়া আঁধিয়ারদের নিকট পত্তন করিয়া দিলেন। ইহাতে দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণী (middle

class) ধ্বংস হইয়া গেল। এইসব জমির প্রকৃত আয়ের উপরে ক্ষতিপূরণ ধার্য হইল না। যেখানে এক বিঘা জমিতে জোতদার তিন মণ ধান পাইতেন, উহার মূল্য প্রায় ষাট টাকা, সেখানে আধিয়ারদের নিকট বিঘা প্রতি এক টাকা নিরিখে পত্তন করিয়া দিয়া বিঘা প্রতি আয় এক টাকা ধরিয়া তাহার উপর ক্ষতিপূরণ ধার্য করা হইল। ইহাতে মাত্র আট, দশ টাকা বিঘা প্রতি জমির মালিকের প্রাপ্য হইল। যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী দেশের সর্ব প্রকার কল্যাণজনক কার্যের প্রাণস্বরূপ ছিলেন তাঁহারা একেবারেই ধ্বংস হইয়া গেল। বর্তমানে ইহাদের দুর্দশা দেখিলে অশ্রু সম্বরণ করা কঠিন হইয়া উঠে। দেশের শাসকগণ ইহাদের দিকে ফিরিয়াও তাকাইলেন না। জমিদারী প্রথা উঠিয়া গেল বটে কিন্তু প্রজা আন্দোলনের উদ্দেশ্য সফল হইল না। খাজনার হার কমার পরিবর্তে খাজনা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। অন্যান্য সুবিধা কি হইয়াছে ভুক্তভোগিগণ উত্তমরূপে তাহা অবগত আছেন।

হৃদরোগে আক্রান্ত

১৯৩৯ সালের এপ্রিল মাসের প্রথম ভাগে রংপুর জেলার কাদিরাবাদ গ্রামে একটি হাই স্কুল প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে বিরাট সভায় যোগদান করি। সাইকেল যোগে চব্বিশ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া ক্লান্ত শরীরে ৪ ঘণ্টা বক্তৃতা করি। রাত্রি প্রায় ১২টার সময় সভা ভঙ্গ হয়। আহারাদির পর শয়ন করিতে রাত্রি দুইটা বাজিয়া যায়। পরদিন অবসন্ন শরীর লইয়া হিলি রওনা হই, আমি তখন ঋণ সালিসী বোর্ডের চেয়ারম্যান, অপরাহ্নে হিলি পৌঁছিতে না পারিলে বোর্ডের কার্যে ব্যাঘাত হইতে পারে বলিয়া তাড়াতাড়ি চলিয়াছি কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য অর্ধেক পথ অতিক্রম না করিতেই কাল বৈশাখী শুরু হইল। ঝড়ের প্রতিকূল বেগের সহিত সংগ্রাম করিয়া সাইকেল চালান সম্ভব হইল না। সাইকেল ঠেলিয়া পদব্রজে চলিতে কাহিল হইয়া পড়িলাম। আমার ঘাড়ে নির্বুদ্ধিতার ভূত চাপিয়াছিল, তাই অনেকের নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া বহু কষ্টে ক্লান্ত শরীরে রাত্রি ৯টার সময় হিলি পৌঁছিলাম। পরদিন দুপুরে গোছল করিয়া আহারে বসিব এমন সময় বুক কাঁপিয়া উঠিল। জোরে প্যাল্‌পিটিশন আরম্ভ হইল। আহার করা আর হইল না। খবর পাইয়া স্থানীয় ডাক্তারগণ উপস্থিত হইলেন। ঔষধ ইন্‌জেকশন কিছুই কার্যকরী হইল না। একাধিক ক্রমে ছয় ঘণ্টা বুকের উপরে হাতুড়ি পিটিয়া কম্পন থামিয়া গেল। বুকে ভয়ানক

বেদনা, সমস্ত শরীর অবসন্ন হইয়া শয্যাশায়ী হইলাম। বুঝিলাম জীবনের শেষ দিন ঘনাইয়া আসিয়াছে। ডাক্তার মহেন্দ্রনাথ সরকার, তারকেশ্বর মজুমদার, সতীশচন্দ্র সরকার, ডাঃ জলীলার রহমান প্রমুখ বিশিষ্ট চিকিৎসকগণ বিনা ফিতে সর্বদা আমাকে দেখাশুনা করিতেন। আমি ইঁহাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞ। কর্মজীবনের সঙ্গী পরম শ্রদ্ধেয় মৌলনা আব্দুল্লাহিল বাকী আমার গুরুতর অসুস্থতার সংবাদ পাইয়া আমাকে লিখিলেন আপনি ঘাবড়াইবেন না। আপনার জীবনের বহু কাজ এখনও বাকী রহিয়াছে। খোদা নিশ্চয় আপনাকে দীর্ঘজীবী করিবেন। তাঁহার পত্রখানি আমার হতাশ প্রাণে নব আশার সঞ্চার করিল। কৈশোরে স্নেহময়ী গর্ভধারিণীকে হারাইয়াছিলাম, স্নেহময় পিতা সর্বদা আমার রোগমুক্তির জন্য খোদার দরগায় মোনাজাত করিতেন। তিন মাস শয্যাশায়ী থাকিয়া অবশেষে কলিকাতা যাওয়া স্থির করিলাম। আমার ভগিনী ও ভগ্নীপতি হজরত আলী খাঁ ও পুত্র মহীউদ্দীনকে সঙ্গে লইয়া কলিকাতা তালতলায় এক বাড়ীতে আশ্রয় লইলাম। হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ভারতবিখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় আমার সহকর্মী ও সুপরিচিত ব্যক্তি ছিলেন।

বন্ধু জালালউদ্দীন হাসেমী ফোন করিয়া আমার অসুস্থতার কথা জানাইলে ডাঃ রায় বৈকালে ৪টার সময় আমাকে লইয়া তাঁহার সহিত দেখা করিতে বলিলেন। নির্দিষ্ট সময়ে হাসেমী সাহেব নিজের গাড়ীতে করিয়া আমাকে লইয়া গেলেন। ডাঃ রায় কিছুক্ষণ ধরিয়া আমাকে পরীক্ষার পর বলিলেন—আপনার বিশেষ কিছু হয় নাই। বাড়ী চলিয়া যান আপনার হার্ট ফেল করিবে না। অনেক দিন বাঁচিয়া থাকিবেন। তিনি হাসিয়া আমার পিঠে থাবা দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—স্ত্রী আছেন? যদি না থাকে তবে একটা বিয়ে করুন। আমি অবাক হইয়া বলিলাম—পরিহাস করিতেছেন। হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া তিনি বলিলেন—বিধান রায় রোগীর সহিত পরিহাস করে না। সর্বদা মনকে প্রফুল্ল রাখা আপনার প্রধান চিকিৎসা। স্ত্রী ব্যতীত অনেকের পক্ষে সেটা সম্ভব নয়। শারীরিক ও মানসিক কোন পরিশ্রম করা চলিবে না। বক্তৃতা ও সাইকেল চালান একেবারেই বন্ধ করিতে হইবে। অতিরিক্ত পরিশ্রম ও বক্তৃতার ফলে আপনার এই অবস্থা হইয়াছে। সুতরাং দীর্ঘ বিশ্রাম একান্ত প্রয়োজন। নৃত্য-গীত, নির্দোষ আমোদ-প্রমোদ আপনার দীর্ঘ জীবন যাপনের সহায় হইবে। তিনি দুই প্রকার ঔষধ ব্যবহার করার জন্য লিখিয়া দিলেন।

তাঁহার ফী ৩২ টাকা তাঁহাকে দিতে গেলে তিনি উহা লইলেন না। বলিলেন—স্বাধীনতা যুদ্ধের সৈনিক আপনারা, আমি সাধ্যমত আপনাদিগকে সাহায্য করিতে

পারিলে সুখী হই। দরকার মনে করিলে পুনরায় আমার সহিত দেখা করিবেন। আমি কৃতজ্ঞ হৃদয়ে তাঁহাকে অভিবাদন জানাইয়া বিদায় লইলাম। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় আজ আর ইহ জগতে নাই। ২৭ বৎসর পূর্বে তিনি আমাকে এই উপদেশ দিয়াছিলেন। খোদার দরগায় হাজার শোকর। তিনি আজ আমাকে এই অতীত কাহিনী লিখতে সুযোগ দিয়াছেন।

(৫০)

হলওয়েল মনুমেণ্ট

নেতাজী সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস হাই কমাণ্ডের সহিত মতভেদ হওয়ায় কংগ্রেস ত্যাগ করিলেন। তাঁহার ইচ্ছা যুদ্ধে বিব্রত ইংরেজের উপরে চাপ দিয়া ভারতের মুক্তি আনয়ন করা। ইতিমধ্যে কলিকাতার হলওয়েল মনুমেণ্ট অপসারণের জন্য তীব্র আন্দোলন চলিতেছিল। এই মনুমেণ্টের একটু সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতেছি। পলাশী যুদ্ধের পূর্বে নবাব সিরাজউদ্দৌলা কলিকাতা আক্রমণ করিয়া ১৪৬ জন ইংরেজ সৈন্য বন্দী করেন। ১৮ ফুট দৈর্ঘ্য প্রস্থের একটি ক্ষুদ্র গৃহে তাহাদিগকে বন্দী করিয়া রাখেন। পরদিন দেখা গেল শ্বাস রুদ্ধ হইয়া ১২৩ জন বন্দীর মৃত্যু হইয়াছে। জীবিত ২৩ জনের মধ্যে হলওয়েল নামক এক ব্যক্তি ইংলণ্ডে গিয়া এই সংবাদ প্রকাশ করে। এই কল্পিত কাহিনী ইংলণ্ড হইতে এদেশে প্রচারিত হয়। নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে নিষ্ঠুর হৃদয়হীন বর্বর প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে ইহা প্রচারিত হইয়াছিল। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক অক্ষয়-কুমার মৈত্র ও অন্যান্য লেখক ইহা সম্পূর্ণ মিথ্যা কাহিনী বলিয়া প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন। কলিকাতা লাল দীঘির (ডালহৌসী স্কোয়ার) উত্তর-পশ্চিম কোণে মিথ্যাবাদী হলওয়েল-কল্পিত গৃহটির স্থান নির্দেশ করা হয়। ১৯০৩ সালে তদানীন্তন বড় লাট লর্ড কার্জন বাংলার শেষ স্বাধীন নবাবের মিথ্যা কলঙ্ক চির জাগরুক রাখার উদ্দেশ্যে এই মনুমেণ্ট প্রস্তুত করিয়া দেন। জাতীয় কলঙ্ক এই মনুমেণ্ট ধ্বংস করার জন্য তখন তুমুল আন্দোলন চলিতেছিল। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু এই আন্দোলনের পুরোভাগে আসিয়া দাঁড়াইলেন। একদল হিন্দু-মুসলমান যুবককে লইয়া তিনি সত্যাগ্রহ শুরু করিয়া দিলেন। প্রত্যহ ৫।৬ জন করিয়া সত্যাগ্রহী মনুমেণ্ট ভাঙ্গিতে গিয়া গ্রেপ্তার হইতে লাগিল। ২রা জুলাই সুভাষ বাবুকে তাঁহার এলগিন রোডের বাড়ী হইতে গ্রেপ্তার করিয়া প্রেসিডেন্সী জেলে

আবদ্ধ করা হইল। সুভাষ বাবুর গ্রেপ্তারের ফলে আন্দোলনের তীব্রতা বাড়িয়া গেল। ইস্‌লামিয়া কলেজের ছাত্রগণ বিরাট শোভাযাত্রা বাহির করিল। দলে দলে হিন্দু-মুসলমান শোভাযাত্রায় যোগ দিয়া গুরুতর অবস্থার সৃষ্টি করিল। লাঠি চালনা, কাঁদুনে গ্যাস ইত্যাদি পুলিশী তৎপরতা ব্যর্থ হওয়ার পর সরকার হঠাৎ ঘোষণা করিলেন হলওয়েল মনুমেণ্ট অপসারণ করা হইবে। প্রায় আড়াই শত সত্যাগ্রহী গ্রেপ্তার হওয়ার পর সরকারের শুভবুদ্ধির উদয় হইল। সত্যাগ্রহীরা মুক্তি পাইল। কিন্তু সুভাষ বসুকে মুক্তি দেওয়া হইল না।

ইতিমধ্যে ফরওয়ার্ড ব্লকের জেনারেল সেক্রেটারি সুভাষ বাবুর অন্তরঙ্গ বন্ধু লালা শঙ্কর লাল অতি সঙ্গোপনে জাপান গিয়া বিপ্লবী রাসবিহারী ঘোষের সহিত মিলিত হইলেন। জাপানের সহিত আমেরিকার মন কষাকষি পূর্ব হইতেই ছিল। যথাসম্ভব ইহাদের সহিত আলোচনা করিয়া জাপান একটা প্রাচ্য রণাঙ্গন সৃষ্টির কল্পনা করিয়াছিল। প্রেসিডেন্সী জেলে আবদ্ধ সুভাষচন্দ্র, লালা শঙ্কর লালের কথা চিন্তা করিয়া অধৈর্য হইয়া পড়িয়াছেন। কারাগৃহ হইতে মুক্তি না পাইলে তাঁহার সঙ্কল্প সিদ্ধ হইবে না। তিনি হাঙ্গার ষ্ট্রাইক আরম্ভ করিলেন। কলিকাতায় হৈ চৈ পড়িয়া গেল। সুভাষ বাবুর মুক্তির জন্য সারা কলিকাতায় তুমুল আন্দোলন আরম্ভ হইল। সরকার অগত্যা ৫ই ডিসেম্বর সুভাষ বাবুকে জেল হইতে বাহির করিয়া তাঁহার বাড়ীতে নজরবন্দী অবস্থায় রাখিলেন। এবার তাঁহার অদ্ভুত পরিবর্তন দেখা গেল। তিনি দাড়ি রাখিলেন, লোকের সহিত দেখাসাক্ষাৎ ও কথাবার্তা বন্ধ করিয়া দিলেন। তাঁহার কামরায় কাহারও প্রবেশাধিকার ছিল না। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র অরবিন্দ বসু দরজার বাহির হইতে তাঁহাকে খাবার দিয়া আসিত। তিনি প্রায় ধ্যানমগ্ন অবস্থায় থাকিতেন। সকলেই জানিতে পারিল সুভাষচন্দ্র সন্ন্যাসী হইয়াছেন। সরকারী পাহারাদারগণ বাহিরে বসিয়া খৈনি টিপিতে টিপিতে বলিতেন—আরে ভাই, সব তো রামজীকি কিরপা হ্যায়। সুভাষ বাবুতো বিলকুল সাধু বন্ গিয়া। আব উনকো পাহারা দেনেকে ক্যেয়া জরুরৎ হ্যায়। কিন্তু সরকারী হুকুম পালন করিতেই হইবে। পাহারাদারগণ ঝিমাইয়া ঝিমাইয়া, কখন নাক ডাকাইয়া পাহারার কার্য চালাইতে লাগিল। দিনের পর দিন চলিয়া গেল, অরবিন্দ বাবু খাদ্যদ্রব্য নির্দিষ্ট স্থানে রাখিয়া দিতেন। পরে ঝি আসিয়া ভুক্তাবশিষ্ট ও থালা-বাসন লইয়া যাইত। বাড়ীতে এক অরবিন্দ ব্যতীত কাহারও সহিত কোন সংশ্রব ছিল না।

পাকিস্তান প্রস্তাব : ১৯৪০ সাল

১৯৩৭ সালের নির্বাচনে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিকাংশ মুসলিম আসন লাভ করে শেরে বাংলা ফজলুল হকের নেতৃত্বে কৃষক প্রজা পার্টি। কংগ্রেসের সহযোগিতায় কৃষক প্রজা পার্টি মন্ত্রিসভা গঠন করিতে না পারিয়া মুসলিম লীগের সঙ্গে কোয়ালিশন সরকার গঠন করে। তদানীন্তন সমাজজীবনে মুসলমানরা পশ্চাৎপদ থাকায় ও অধিকাংশ বর্ণহিন্দুর অনুদার আচরণে তাহাদের মধ্যে স্বাতন্ত্র্যের তাগিদ অনুভূত হইতে থাকে। ইকবাল এই সময়ে পাকিস্তানের দার্শনিক ভিত্তি রচনা করেন। মহম্মদ আলি জিন্না সাহেব পাকিস্তান আন্দোলনের পথপ্রদর্শকরূপে অবতীর্ণ হইলেন। শেরে বাংলা ফজলুল হক মুসলিম লীগে যোগদান করিলে পাকিস্তানের ভাবধারা বাংলার মুসলমানদের মধ্যে বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করে। ১৯৪০ সালের ২২শে মার্চ লাহোরে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে শেরে বাংলা পাকিস্তান প্রস্তাব উত্থাপন করেন। উক্ত প্রস্তাবে তদানীন্তন ভারতের পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চলের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠের অঞ্চল-দুইটি সার্বভৌম স্বায়ত্তশাসিত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করা হয়। এই প্রস্তাব অনুযায়ী আঞ্চলিক পুনর্বিন্যাস করিয়া পূর্বাঞ্চলে বাংলা ও আসামকে লইয়া একটি এবং পশ্চিমাঞ্চলে পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্তান ও সীমান্ত প্রদেশকে লইয়া আর-একটি মুসলমান-প্রধান রাষ্ট্র গঠন করিবার সিদ্ধান্ত হয়। উভয় অঞ্চলকে লইয়া পাকিস্তান নামক ফেডারেশন গঠনের সিদ্ধান্ত হয়। সেদিন বিহার, যুক্তপ্রদেশ, মাদ্রাজ, বোম্বে, উড়িষ্যা প্রভৃতি মুসলমান সংখ্যালঘু প্রদেশগুলির লীগনেতাগণ প্রস্তাব সমর্থন করিয়া জোর গলায় বক্তৃতা দিয়াছিলেন। পরবর্তী কালে ১৯৪৬ সালে দিল্লীতে মুসলিম লীগ লেজিসলেটার্সদের কন্‌ভেনশন লাহোর প্রস্তাব সংশোধিত করিয়া উভয় অঞ্চলকে আংশিক স্বায়ত্তশাসন দিয়া পাকিস্তান নামক একটি রাষ্ট্র গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও ভারত

১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ভার্সাই চুক্তির অপমানের গ্লানি হইতে জার্মানীকে মুক্ত করাই হইল হিটলারের বিরাট সংকল্প। শক্তি উদ্ধারের চেষ্টায় তিনি মাতিয়া উঠিলেন, রাইনদীতীরস্থ জার্মানীর যে অংশ আন্তর্জাতিক ভাবে নিরস্ত্রীকৃত করিয়া রাখা হইয়াছিল তাহা অধিকার করিয়া লইলেন। ইতালির একক অধিনায়ক মসোলিনির

সহিত মিত্রতাবদ্ধ হইয়া স্পেনের অন্তর্যুদ্ধে বিদ্রোহী সামরিক নেতা জেনারেল ফ্রাঙ্কোকে জয়লাভে সাহায্য করিলেন। অষ্ট্রিয়া হিটলার কর্তৃক অধিকৃত হইল। এইভাবে তাঁহার আগ্রাসী শক্তি বাড়িয়া চলিল। অবশেষে ১৯৩৯ সালে ১লা সেপ্টেম্বর তিনি পোল্যাণ্ড আক্রমণ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হইল। ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের সামরিক প্রস্তুতি যথেষ্ট না থাকায় জার্মানী সহজেই পোল্যাণ্ড দখল করিয়া লইল। কয়েক মাসের মধ্যেই নরওয়ে, ডেনমার্ক, বেলজিয়াম ও হল্যাণ্ড জার্মানীর পদানত হইল। ইতালী জার্মান পক্ষে যোগদান করিল।

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলেন হিটলারের ডেনমার্ক, নরওয়ে ইত্যাদি দখলে বাধা না দেওয়ায় এবং সামরিক প্রস্তুতিতে যথেষ্ট তৎপরতা প্রদর্শন না করায় তাঁহার বিরুদ্ধে ইংরাজ জাতির মধ্যে এক তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। তিনি প্রধানমন্ত্রীর পদ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইলেন উইনস্টন চার্চিল (১০ই মে)। এদিকে ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে জুন জার্মানীর কাছে ফ্রান্স আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য লইল। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে ক্যাম্পেইনে রেলগাড়ীর কামরায় আত্মসমর্পণের গ্লানির প্রতিশোধ লইল জার্মানী ঠিক একই স্থানে একই ভাবে। এখন হিটলারের প্রধান উদ্দেশ্য হইল ইংলণ্ড ও ইংলণ্ডের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যকে পদানত করা। জার্মান বিমান আক্রমণ মিত্রশক্তিকে সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিল।

যুদ্ধের শুরু হইতেই বৃটেনের প্রতি কংগ্রেসের সহানুভূতি ছিল কিন্তু সহযোগিতায় ছিল আপত্তি। ফ্যাসিবাদ ও গণতন্ত্রের লড়াই ভাবিয়া গান্ধীজী ও জওহরলাল নেহেরু ব্রিটিশ সরকারকে সমর্থনের পক্ষপাতী ছিলেন। 'হরিজন' পত্রিকায় গান্ধীজী লিখিলেন—"মানবিকতার দিক দিয়াই ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের প্রতি সহানুভূতি আসে।" সুভাষচন্দ্র বসু ছিলেন যে-কোন প্রকার সহযোগিতার বিরোধী কারণ তিনি বুঝিয়াছিলেন যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভাঙ্গনেই ভারতের স্বাধীনতা সম্ভব। রাজনৈতিক ও অন্যান্য দলের মধ্যে ন্যাশনাল লিবারেল ফেডারেশন ও হিন্দু মহাসভা ছিল একান্তভাবে সরকারকে সমর্থনের পক্ষপাতী। কিন্তু মধ্যপন্থা অবলম্বন করিল মুসলিম লীগ। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে ১৮ই সেপ্টেম্বর মুসলিম লীগ একটি প্রস্তাব গ্রহণ করিল। উহাতে বলা হইল যে, যদি ভারতের শাসনতান্ত্রিক অগ্রগতিতে মুসলিম লীগের অনুমোদন গ্রহণ করা হয় তাহা হইলে লীগ যুদ্ধে ব্রিটিশ সরকারকে সহযোগিতা দান করিবে এবং তাহাদের এই দাবি ন্যায্য কারণ ইহাই হইল একমাত্র সংস্থা যাহা

ভারতের মুসলমানদিগের দাবির কথা বলিয়া থাকে। যুদ্ধে বৃটেনের অবস্থা শোচনীয় বুঝিয়া কংগ্রেস দাবি করল ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা। এবং ইহার বিনিময়ে বৃটেনকে সহযোগিতার আশ্বাস দিল। কিন্তু চার্চিল দম্ভভরে বলিলেন যে, বৃটিশ সাম্রাজ্যকে রক্ষা করিতে তিনি আসিয়াছেন, বিলাইয়া দিতে আসেন নাই। অগত্যা কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ঘোষণা করিলেন যে, যুদ্ধে ভারতবাসী ব্রিটিশ সরকারকে সাহায্য করিবে না। কংগ্রেসের নির্দেশমত মন্ত্রিগণ পদত্যাগ করিলেন। তাঁহারা পদত্যাগ করিলে জিন্নাসাহেব মুসলমানদিগকে 'নাজাত দিবস' পালনের নির্দেশ দেন।

ক্রিপ্‌সের দৌত্য

১৯৪২ সালের মার্চ মাসে সার্ স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌স্ বৃটিশ মন্ত্রিসভার পক্ষ হইতে ভারতের সহিত আপস নিষ্পত্তির প্রস্তাব লইয়া দিল্লী আসেন। তিনি মহাত্মা গান্ধীর সহিত আলোচনা করিতে গেলে গান্ধীজী বলেন—মওলানা আবুল কালাম আজাদ বর্তমানে কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট। তাঁহার সহিত আলোচনা করিতে হইবে। অতপর ক্রিপ্‌স্ সাহেব মওলানা সাহেবে সহিত সাক্ষাৎ করেন। মওলানা সাহেব উর্দুভাষী। তিনি তাঁহার মাতৃভাষা ব্যতীত অন্য ভাষায় কথা বলিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন, যদিও তিনি ইংরেজী ভাষা উত্তমরূপে আয়ত্ত করিয়া ছিলেন। তুমি তোমার মাতৃভাষায় কথা বলিবে, আমি তোমার নিকট ধার করা ভাষায় উত্তর দিব তাহা হইবে না। অগত্যা মিঃ হুমায়ুন কবীরকে দোভাষী নিযুক্ত করা হইল। কিন্তু আলাপ-আলোচনায় কোন লাভ হইল না। কংগ্রেস ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা ব্যতীত কিছুতেই রাজি নয়। অতঃপর মুসলিম লীগের নেতাদের সহিত আলোচনা হইল। তাঁহারাও তাঁহার প্রস্তাব মানিয়া লইলেন না। বিফল মনোরথ হইয়া ক্রিপ্‌স্ সাহেব ফিরিয়া গেলেন। বিশ্ববিখ্যাত রাজনীতিবিদ বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল ভারতের হাফ-নেকেড ফকীর গান্ধীর ঔদ্ধত্য দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন।

'কুইট ইণ্ডিয়া' প্রস্তাব

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি যুদ্ধের সুযোগে ইংরেজের নিকট হইতে ভারতকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে এক ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করিলেন। ৮ই আগষ্ট ওয়ার্কিং কমিটিতে ইংরেজ 'ভারত ছাড়' (Quit India) প্রস্তাব গৃহীত হইল।

ইংরেজ সরকার বিচলিত হইয়া পড়িলেন। সমগ্র কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান বেআইনী ঘোষিত হইল। মহাত্মা গান্ধী, মওলানা আজাদ, জওহরলাল নেহেরু প্রমুখ কংগ্রেসের প্রায় সমস্ত নেতাগণ গ্রেফতার হইলেন! ইংরেজ সরকারের ঔদ্ধত্য দেখিয়া ভারতের জনসাধারণ ক্ষেপিয়া গেল। কলিকাতা ও অন্যান্য শহরে ভয়ানক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হইল। বাস, ট্রাক গাড়িগুলির টায়ার ফুটা করিয়া আগুন ধরাইল। ট্রামের দড়ি কাটিয়া দিল। ইউরোপীয়ান ও হ্যাটকোট-পরা ব্যক্তির লাঞ্ছনার সীমা রহিল না. স্কুল কলেজের ছাত্ররা শোভাযাত্রা করিয়া 'কুইট ইণ্ডিয়া' শ্লোগান দিতে দিতে সারা কলিকাতা মুখরিত করিয়া তুলিল। পুলিশ লাঠি চালনা, কাঁদুনে গ্যাস, গুলি চালনা সবকিছু করিল। হাজার হাজার লোককে গ্রেফতার করিয়া জেলে আবদ্ধ করিল। বোম্বে, মাদ্রাজ, মধ্য প্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা, সারা ভারতে একই অবস্থার সৃষ্টি হইল। মেদিনীপুর তমলুক মহকুমা স্বাধীনতা ঘোষণা করিল। তথাকার সরকারী ভবন দখল করার উদ্দেশ্যে প্রায় বিশ হাজার স্বেচ্ছাসেবক দুই দলে বিভক্ত হইয়া কংগ্রেস পতাকা হস্তে অগ্রসর হইতে থাকে। একদলের নেতা ছিলেন রামচন্দ্র বেরা ও অপর দলের বৃদ্ধা মাতঙ্গিনী হাজরা। রামচন্দ্র বেরাকে থানায় লইয়া গিয়া পুলিশ অকথ্য অত্যাচার করিয়া মারিয়া ফেলে। মাতঙ্গিনী হাজরা দক্ষিণ হস্তে পতাকাদণ্ড ধারণ করিয়া চলিতেছিলেন। জনৈক পুলিশের গুলিতে তাঁহার দক্ষিণ হস্ত ভাঙ্গিয়া গেল, তখন তিনি বাম হস্তে পতাকাদণ্ড ধারণ করিলেন। দ্বিতীয় গুলি তাঁহার বাম হস্ত ভেদ করিল। পতাকা হস্তচ্যুত হয় দেখিয়া এই মহীয়সী মহিলা আহত হস্তদ্বয় ও কনুয়ের সাহায্যে পতাকাদণ্ড বুকে চাপিয়া ধরিলেন। অকস্মাৎ তৃতীয় গুলি আসিয়া তাঁহার মস্তক চূর্ণ করিয়া ফেলিল। মাতৃভূমির মুক্তি কামনায় এই বীরাঙ্গনার আত্মত্যাগ স্বাধীনতার ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। মেদিনীপুরের আত্মত্যাগী বীর সন্তানগণ প্রায় ছয় মাস কাল তমলুককে ইংরেজ শাসন হইতে মুক্ত রাখিয়াছিলেন। সৈন্য ও পুলিশের অকথ্য নির্যাতনের ফলে সারা ভারত ব্যাপিয়া যে দাবানল জ্বলিয়া উঠিল, উহার ভয়াবহ পরিণাম চিন্তা করিয়া ইংরেজ সরকার শিহরিয়া উঠিল। 'ভারত ছাড়' আন্দোলন দমন করিতে গিয়া ইংরেজ সরকার কয়েক হাজার মানুষকে গুলি করিয়া হত্যা করিল। লক্ষ লক্ষ লোককে গ্রেফতার করিয়া জেলখানাগুলি পূর্ণ করিয়া ফেলিল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। দেশে অরাজকতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা সমান ভাবেই চলিতে লাগিল।

সুভাষচন্দ্রের নিরুদ্দেশ

১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে সুভাষচন্দ্র কারারুদ্ধ হইলেন। বিনা বিচারে তাঁহাকে আটক করা হইল। ইতিপূর্বে এগার বার তিনি কারাগারে বন্দীজীবন যাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু এবার বাহিরের ডাক তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিল। সরকারের সিদ্ধান্ত যুদ্ধ শেষের পূর্বে তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হইবে না। তিনি আইন-সঙ্গতভাবে মুক্তিলাভের উপায় খুঁজিলেন। মুক্তি না পাইলে আমরণ অনশনের সংকল্প করিলেন। সরকার কোনরূপ কর্ণপাত করিল না। তিনি অনশন শুরু করিলেন। অবশেষে ৭ দিনের অনশনের পর সরকার ভীত হইয়া একমাস পরে মুক্তি দেওয়ার কথা ঘোষণা করে কিন্তু স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটিলে পুনরায় কারারুদ্ধ করিবার সিদ্ধান্ত নেয়। মুক্তিলাভের পর ৪০ দিন তিনি নিজ গৃহ হইতে এক পাও বাহির হন নাই। কেবল চিন্তা করিলেন, কিভাবে বহির্জগতের ঘটনা মুক্তিযোদ্ধাদের নিকট উপস্থিত করা যায় এবং বৃটেনের বিরুদ্ধে যোগদান করিয়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অবসান ঘটাইবার প্রচেষ্টায় সহযোগিতা করা যায়। এই উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্য তিনি নিজে বাহির হওয়াকেই শ্রেষ্ঠ পথ বলিয়া মনে করিলেন।

১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই জানুয়ারি গভীর রাত্রিতে ২৩ নম্বর এলগিন রোডের বাড়ী হইতে এক পেশোয়ারী মৌলভী কালো একটি মোটর গাড়ীতে দ্রুত গতিতে ছুটিয়া চলিয়াছেন। গোমো স্টেশনের পাঞ্জাব মেলের এক ফার্স্ট ক্লাস কামরায় তাঁহাকে উঠিতে দেখা গেল। তিনি পেশোয়ারে পৌঁছাইয়া একজন পেশোয়ারী বন্ধুর সহিত খাইবার গিরিপথ অতিক্রম করিয়া পদব্রজে কাবুল পৌঁছাইলেন। এই মৌলভী আর কেহই নহেন, স্বয়ং সুভাষচন্দ্র বসু। নেতাজীর এই অন্তর্ধান তাঁহার নিজের ভাষায়, "দীর্ঘকালের মধ্যে ভারতবর্ষে এতবড় চাঞ্চল্যকর রাজনৈতিক ঘটনা আর ঘটে নি।" গোয়েন্দা পুলিসের কড়া পাহারা, সরকারের সতর্ক দৃষ্টি সবকিছু ব্যর্থ হইল। এই ঘটনার তুলনা মেলে সপ্তদশ শতাব্দীর ভারতের ইতিহাসে এক বিশেষ অধ্যায়ে—এইভাবেই প্রবল প্রতাপ মুঘল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের সমস্ত সতর্কতাকে ফাঁকি দিয়া আগ্রা দুর্গ হইতে অন্তর্ধান করিয়াছিলেন মারাঠা-নায়ক শিবাজী।

অতঃপর সুভাষচন্দ্র বসু একটি ইতালীয় ছাড়পত্র লইয়া রাশিয়া যান। তথা হইতে ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে মার্চ আকাশপথে বার্লিন যাত্রা করেন। জার্মানীতে হিটলারের দক্ষিণ হস্ত রিবেনট্রপ তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করেন। সেইখানে তিনি তিনটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। প্রথমতঃ, তিনি বার্লিন হইতে বৃটিশবিরোধী

প্রচার চালাইবেন ; দ্বিতীয়তঃ, জার্মানীতে ভারতীয় যুদ্ধবন্দীদের লইয়া স্বাধীন ভারত ইউনিট গঠন করিবেন। তৃতীয়তঃ, তিনটি অক্ষশক্তি সম্মিলিতভাবে ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণা করিবে। জার্মানী ও ইতালী তৃতীয়টি ছাড়া প্রথম দুইটি প্রস্তাব গ্রহণ করিল। নির্দিষ্ট পথে তাঁহার কার্য চলিতে লাগিল। রোম ও প্যারিসেও তিনি স্বাধীন ভারত কেন্দ্র গড়িয়া তুলিলেন। তাঁহার বাহিনীর সংখ্যা হইল তিন হাজার। ১৫ই ফেব্রুয়ারি ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে জাপানের হস্তে সিঙ্গাপুরের পতনে নেতাজী উৎসাহিত হইলেন। তিনি চিন্তা করিলেন জার্মানী অপেক্ষা সুদূর প্রাচ্য হইতে বৃটিশ শক্তির সহিত মোকাবিলা করা তাঁহার পক্ষে সুবিধাজনক হইবে। তাঁহার বিশ্বস্ত সহযোগী আবিদ হোসেন সহ দুঃসাহসিকভাবে সাবমেরিন যোগে তিনি টোকিও পৌঁছাইলেন (১৩ই জুন ১৯৪০)। জাপ প্রধানমন্ত্রী তোজো তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন।

(৫১)

নেতাজী ও আজাদ হিন্দ ফৌজ

এদিকে লালা শঙ্কর লাল ও স্বনামধন্য রাসবিহারী বসু বহুদিন হইতেই ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের জন্য জাপান সরকারের প্রস্তুতির আন্দোলন চালাইতেছিলেন। ২রা জুলাই বিপুল গণ-সম্বর্ধনার মধ্যে সুভাষ বসু সিঙ্গাপুরে পৌঁছাইলেন। সংগ্রামী রাসবিহারী বসু ৪ঠা জুলাই তাঁহার হস্তে পূর্ব এশিয়ার ভারত স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্বভার অর্পণ করিলেন। পূর্ব এশিয়ার ত্রিশ লক্ষ ভারতীয়ের প্রতিনিধি স্বরূপ পাঁচ হাজার ভারতীয়ের সম্মুখে ভারতীয় স্বাধীনতা লীগের সভাপতির পদে অধিষ্ঠিত হইলেন সুভাষচন্দ্র বসু--পাইলেন শ্রেষ্ঠ নেতার আখ্যা 'নেতাজী'। জার্মানীতেও তিনি এই আখ্যায় ভূষিত ছিলেন। সর্বজনসমক্ষে তিনি স্বাধীন ভারতের অস্থায়ী সরকার ও ভারতীয় জাতীয় বাহিনী প্রতিষ্ঠার স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন। পরদিন বিশ্বসমীপে ঘোষিত হইল আজাদ হিন্দ বাহিনীর সংগঠনের কথা—বজ্রকণ্ঠে নিনাদিত হইল 'দিল্লী চলো'।

জাপানের হস্তে বন্দী ভারতীয় সৈন্যবাহিনী লইয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল আজাদ হিন্দ বাহিনী। এ বিষয়ে একান্তভাবে বন্দী ক্যাপ্টেন মোহন সিং-এর সহিত তিনি বিশেষভাবে পরামর্শ করেন। একসময় জাপানের প্রধানমন্ত্রী তোজো নিজ সৈন্যদ্বারা

নেতাজীকে সাহায্য করিতে চাহিলে তাহা অপমানজনক বলিয়া তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। ইহার মধ্যে নেতাজীর তেজস্বীতার প্রমাণ পাওয়া যায়।

সমগ্র পূর্ব এশিয়ার প্রতিনিধিগণ সম্মিলিত হইয়াছেন সিঙ্গাপুরে আলোচনা হইল। অতঃপর ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে অক্টোবর ক্যাসে হলে বিরাট সাধারণ সভা, বিপুল হর্ষধ্বনি ও উল্লাসের মধ্যে সিঙ্গাপুরে স্বাধীন ভারতের অস্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠার হইল গৌরবময় ঘোষণা। সুভাষচন্দ্র বসু হইলেন সভাপতি আর মন্ত্রী হইলেন রাসবিহারী বসু, লালা শঙ্কর লাল, কর্নেল শাহ্‌নওয়াজ, কর্নেল আজিজ আহমেদ, কর্নেল ওসমান কাদির, কর্নেল গুলজার সিং, কর্নেল এ. সি. চ্যাটার্জি প্রভৃতি। সুভাষচন্দ্রের এডিকং কর্নেল হবিবর রহমান আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত হন। কয়েক দিনের মধ্যেই জাপান, জার্মানী, ইতালী, প্রাশিয়া, ব্রহ্মদেশ, থাইল্যাণ্ড, জাতীয়তাবাদী চীন, ফিলিপাইন, মাঞ্চুরিয়া—এই নয়টি দেশ স্বীকৃতি দান করিল আজাদ হিন্দ সরকারকে। ইতিপূর্বে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ জাপানের অধীনে আসে। ৬ই নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী তোজো ঐ দ্বীপ-দুইটি অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকারকে হস্তান্তরিত করার সিদ্ধান্ত লইলেন। এই গুলিই হইল নতুন সরকারের প্রথম লব্ধ স্থান। ৩১শে ডিসেম্বর নেতাজী এই স্বাধীন ভূমিতে পদার্পণ করিলেন। দ্বীপ দুইটির নামকরণ হয় 'শহীদ' ও 'স্বরাজ'। সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া হইতে একে একে ইউরোপীয় শক্তিগুলি বিতাড়িত হইল। রাষ্ট্রগুলি জাপ ও আজাদ হিন্দ সরকারের অধীনে আসিল। বিতাড়িত ইংরাজ সরকার এখন আসাম ও বাংলা সীমান্ত রক্ষার জন্য অতিমাত্রায় ব্যস্ত হইয়া উঠিল। জাপান ভিজাগাপট্টম ও কোকোনদে বোমা বর্ষণ করে। অতঃপর চট্টগ্রাম আক্রান্ত হয়। কলিকাতাতেও বোমা বর্ষিত হয়। ইংরাজ সরকারের সবচাইতে বড় বাহাদুরী যুদ্ধের গোপনতা রক্ষায় সাফল্য। আজাদ হিন্দ সরকারও নেতাজীর কোন প্রকার সংবাদ ভারতে প্রচার হইতে দেয় নাই। সংবাদ প্রচার হইলে আজ হয়তো ভারতের ইতিহাস অন্যরূপ হইত।

নেতাজীর জার্মানী ও জাপানের সমর্থন ও সাহায্য প্রার্থনায় কেহ কেহ হয়তো বা তাঁহার প্রতি সন্দিহান হন। তাঁহাদের ধারণা হইত এক সাম্রাজ্যবাদের নাগপাশ হইতে মুক্তির প্রচেষ্টায় তিনি হয়তো ন্যাৎসীবাদী অপর শক্তির কবলে পতিত হইবেন। কিন্তু এ ধারণা একেবারেই ভুল। এ সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণভাবে ওয়াকিবহাল ছিলেন। কেবলমাত্র দেশের স্বাধীনতার জন্যই ন্যাৎসীবাদী জার্মানী বা সাম্রাজ্যবাদী জাপানের

তিনি ছিলেন সহযোগিতা-প্রার্থী। আপন দেশকে কিন্তু কোন পরিস্থিতিতেই তিনি এই সমস্ত শক্তির কবলে নিক্ষেপ করিতে চাহেন নাই। এক সময় এক সামরিক কর্মচারী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, কেন তাহারা জাপানীদের পার্শ্বে দাঁড়াইবে। তাহাতে তিনি উত্তর দিয়াছেন—তিনি বৃটিশ বা জাপানী কাহাকেও বিশ্বাস করেন না, তবুও ভারত চায় এবং জাপানীরাও চায় বৃটিশকে বাধা দিতে, বিতাড়িত করিতে ; তাই এই স্বার্থে তাহারা মিলিত হইয়াছে।

নেতাজীর বিরাট ব্যক্তিত্বের প্রভাবে হিন্দু-মুসলমান-শিখ সমস্ত সম্প্রদায় তাঁহার আহ্বানে সাড়া দেয়। আজাদ হিন্দ বাহিনী একই পতাকা তলে সম্মিলিত হইয়া ভারতে প্রবেশ করে এবং কোহিমা ও ইম্ফলের নিকট মৈরাং ও বিষেণপুর অধিকার করিতে সক্ষম হয়।

১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে ৭ই মে জার্মানী বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ করিল। ইংলণ্ড তখন পূর্ণশক্তি লইয়া প্রাচ্য রণাঙ্গনে অগ্রসর হইতে লাগিল। পশ্চাৎ অপসরণ করা ছাড়া জাপানের গত্যন্তর রহিল না। ইতিমধ্যে মিত্রশক্তির বিপর্যয়ের মুখে শোচনীয় যুদ্ধ পরিস্থিতির মাঝে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধে যোগদান করিয়াছে। ৬ই আগস্ট আমেরিকা মানব ইতিহাসে এক পৈশাচিক ঘটনার সৃষ্টি করিল। জাপানের হিরোসিমা শহরের উপর সর্বপ্রথম আণবিক বোমা নিক্ষেপ করিয়া শহরটিকে ধ্বংস করিয়া ফেলিল। ৮ই আগস্ট নাগাসিকি শহরের উপর দ্বিতীয় বোমা বর্ষিত হইল। ইতিপূর্বে প্রলয়ঙ্করী মারণাস্ত্র আর কেহ ব্যবহার করে নাই। শহর-দুইটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইল। লক্ষ লক্ষ নিরপরাধ নরনারী জীবন্ত দগ্ধ হইয়া প্রাণ হারাইল। অভিশাপ দেখা দিল অগণিত মানুষের অদৃষ্টে—পঙ্গু বিকলাঙ্গ হইল বহু আসন্ন শিশু। সভ্যতার এ এক বিরাট কলঙ্ক। নিরুপায় জাপান অবশেষে আত্মসমর্পণ করায় মহাযুদ্ধের অবসান ঘটিল।

এদিকে রসদের অভাব ও অন্যান্য প্রতিকূল অবস্থার জন্য জাপানের পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে নেতাজীকে অস্ত্রত্যাগ করিতে হয়। পরে বিশ্বস্ত সহচর হবিবুর রহমান সহ টোকিওর পথে বিমান দুর্ঘটনায় ১৮ই আগস্ট নেতাজীর মৃত্যু হয় বলিয়া ঘোষণা করা হয়। আমরা জানি না সত্যিকারের ঘটনা কি। ইহা আজিও রহস্যজালে আবৃত। কিন্তু এই ঘটনা যদি সত্য না হয় তাহা হইলে বরেণ্য নেতার শতায়ু কামনা করি।

আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচার

আত্মসমর্পণের পর ইংরেজ সরকার কর্নেল শাহ্ নেওয়াজ, ক্যাপ্টেন ধীলন, ক্যাপ্টেন বোরহানউদ্দীন, ক্যাপ্টেন রশিদ আলী প্রমুখ আজাদ হিন্দ ফৌজের কয়েকজন নেতাকে যুদ্ধ-অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া সামরিক আইনে বিচারের জন্য উপস্থিত করিলেন। দিল্লীর ইতিহাসপ্রসিদ্ধ লাল কেল্লায় অক্টোবর মাসে এই বিচার আরম্ভ হইল। সুভাষ বসু ও আজাদ হিন্দ ফৌজের বিস্ময়কর কার্যাবলীর কথা ঘুণাক্ষরে এদেশে কেহ জানিতে পারে নাই। এখন সমস্ত প্রকাশ হইয়া পড়ায় দেশবাসীর আত্মগ্লানির আর সীমা রহিল না। বিচারের বিরুদ্ধে সারা ভারত আবার ক্ষেপিয়া গেল। চারিদিকে প্রতিবাদের ঝড় উঠিল। কিন্তু ইংরেজ টলিল না। বিচার আরম্ভ হইল। কংগ্রেস আজাদ হিন্দ ফৌজের সমর্থন লাভের জন্য দেশের প্রসিদ্ধ আইনজীবিগণকে নিযুক্ত করিলেন। বোম্বায়ের বিখ্যাত ব্যারিস্টার ভুলাভাই দেশাই প্রধান আইনজীবী ছিল। সার্ তেজবাহাদুর সাপ্রু, ডাক্তার কৈলাস নাথ কাটজু, পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু প্রমুখ খ্যাতনামা আইনজীবিগণ তাঁহার সাহায্য করিতে লাগিলেন। বিচারে অভিযোগ প্রমাণিত হইল না। বৃটিশ সরকার তবুও কয়েকজনের শাস্তির ব্যবস্থা করিল। দণ্ডপ্রাপ্ত রশিদ আলীকে লইয়া তুমুল বিক্ষোভের সৃষ্টি হইল। সারা ভারতে রশিদ আলী দিবস প্রতিপালিত হইল। কলিকাতা ও অন্যান্য স্থানে পুলিশের সহিত জনসাধারণের সংঘর্ষ চলিল। এই মামলায় আসামী পক্ষ সমর্থনের জন্য সমর্থন করিতে গিয়া ভুলাভাই দেশাই যে অসাধারণ জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহাতে সারা বিশ্বে তাঁহার খ্যাতি ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

পঞ্চাশের মন্বন্তর

জনাব এ. কে. ফজলুল হক তখন বাংলার প্রধানমন্ত্রী। ইংরেজ সরকার যুদ্ধের নাম করিয়া এদেশ হইতে বিপুল পরিমাণ খাদ্যশস্য বিদেশে পাঠাইতে লাগিলেন। হক সাহেব ইহার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিলে মন্ত্রিসভায় ইউরোপীয় ও সরকার-ঘেষাদলের সহিত তাঁহার ঘোরতর মতবিরোধ আরম্ভ হইল। প্রতিবাদে কোন ফল হইল না দেখিয়া হক সাহেব পদত্যাগ করিলেন। তাঁহার দ্বিতীয় কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা ভাঙ্গিয়া গেল। জনাব খাজা নাজিমউদ্দীন নূতন মন্ত্রিসভা গঠন করিলেন। ইতিপূর্বে বিপুল পরিমাণ খাদ্যশস্য বাহিরে চলিয়া যাওয়ায় দেশে হাহাকার পড়িয়া

গেল। খাদ্যাভাবে লোক মরিতে লাগিল। সেই ভয়াবহ মৃত্যুর কথা আর কি বলিব। হাটে-বাজারে, পথ-ঘাটে কঙ্কালসার নরনারীর মৃত দেহগুলি অনেক স্থানে সৎকারের অভাবে শিয়াল-শকুনের উদরস্থ হইল।

খাদ্যমন্ত্রী জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী বহু স্থানে সরকারি লঙ্গরখানা খুলিলেন। দেশের সহৃদয় ব্যক্তিগণ লঙ্গরখানা খুলিয়া বুভুক্ষ নরনারীর একবেলা আহারের ব্যবস্থা করিলেন। আমরা হিলিতেও একটি লঙ্গরখানা খুলিয়াছিলাম। দৈনিক প্রায় দেড় হাজার লোকের একবেলা আহারের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। হিন্দু-মুসলমান একত্রে বসিয়া আহার করিতে কাহাকেও দ্বিধাগ্রস্ত হইতে দেখি নাই। হিলির বদান্য জমিদার বাবু দ্বারকনাথ দাস তিন মাস ধরিয়া একাই লঙ্গরখানার যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিয়াছিলেন। পরে তিনি অসুস্থ হইয়া চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় গেলে স্থানীয় কতিপয় ব্যবসায়ী উক্ত লঙ্গরখানা পরিচালনা করেন। দেশের বহু স্থানে লঙ্গরখানা খোলা হইয়াছিল। কিন্তু এত করিয়াও লক্ষ লক্ষ নরনারী অনাহারে মৃত্যু বরণ করিল।

সরকারী হিসাবে পনর লক্ষ, বেসরকারী হিসাবে ত্রিশ লক্ষ লোক এই দুর্ভিক্ষের কবলে আত্মাহুতি দিয়াছে। বিদেশী শাসকগণ নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য দেশবাসীর মুখের অন্ন কাড়িয়া লইয়া তাঁহাদিগকে মৃত্যুর মুখে ঠেলিয়া দিয়াছিল। চারি বৎসর মহাযুদ্ধের মৃত্যুর সংখ্যা হইতে ইহা প্রায় ছয় গুণ অধিক। কি ভয়াবহ ব্যাপার!

বন্দীমুক্তি

'কুইট ইণ্ডিয়া' আন্দোলনে সারাদেশ ব্যাপিয়া অশান্তির তুমুল ঝড় বহিতেছিল। আজাদ হিন্দ ফৌজের মামলা রশিদ আলী দিবস প্রতিপালন উপলক্ষে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের যুক্ত প্রতিবাদ, তদুপরি দুর্ভিক্ষে লক্ষ লক্ষ লোকের অকাল মৃত্যু সারা দেশকে বারুদের স্তূপে পরিণত করিল। সরকার ঘাবড়াইয়া গিয়া বিনাশর্তে বন্দীদিগকে ছাড়িয়া দিলেন। মহাত্মা গান্ধী ও অন্যান্য বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ সহ হাজার হাজার বন্দী আকস্মিক মুক্তিতে দেশের আবহাওয়া অনেকখানি শান্ত হইয়া আসিল। দেশে প্রায় সমস্ত সংবাদপত্রগুলি লীগ কংগ্রেসের মিলনের প্রচারকার্য চালাইতে লাগিলেন। জনমতের আহ্বানে মহাত্মা গান্ধী কায়েদে আজম জিন্নাহ্‌র সহিত পত্র ব্যবহার চালাইতে লাগিলেন। অবশেষে গান্ধীজী স্বয়ং বোম্বাইয়ে মালাবার হিলে

কায়েদে আজমের বাসভবনে গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। উভয় নেতার মধ্যে হৃদ্যতাপূর্ণ আলোচনা চলিল। তাঁহাদের আলোচনা সুফল ফলিবে দৃঢ় আশা লইয়া অনেকে অপেক্ষা করিতে লাগিল। কয়েক দিন আলোচনার পর তাঁহাদের যুক্ত বিবৃতিতে জানা গেল তাঁহারা কোন মীমাংসায় পৌঁছিতে পারেন নাই। এই দুঃসংবাদে দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই দুঃখিত হইয়াছিলেন।

১৯৪৬ সাল : পাকিস্তান ইস্যুর উপরে সাধারণ নির্বাচন

মুসলিম লীগ মিঃ জিন্নাহ্‌র নেতৃত্বে মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র আবাসভূমি 'পাকিস্তান' দাবি করেন; অবশ্য ইহার কারণও ছিল। এদেশে জমিদার ও মহাজনগণ অধিকাংশই হিন্দু ছিলেন।

সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান প্রায় তাঁহাদের প্রজা ও খাতক ছিল। বহুযুগ ধরিয়া ইহাদের দ্বারা মুসলমানগণ শোষিত ও নিগৃহীত হইয়া আসিতেছিল। বর্ণ হিন্দুদের সহিত মুসলমানদের একাশনে বসিবার অধিকার ছিল না। এমনকি মুসলমানদের সংস্পর্শে তাঁহাদের আহার্যদ্রব্য অপবিত্র হইয়া যাইত। হিন্দু লেখক ও সাহিত্যিকগণ মুসলমানদের অযথা কলঙ্ককাহিনী রচনা করিয়া আঘাতের পর আঘাত হানিতেছিল। হিন্দু উকিল-মোক্তার মুসলমান মক্কেলকে শোষণ করিতেছিল। অবশ্য হিন্দু জমিদার ও মহাজনগণ, উকিল-মোক্তার সকলেই যে খারাপ ছিলেন তাহা নহে। অনেক উদার ও দয়ালু হৃদয় ব্যক্তিও তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন। কিন্তু তাঁহারা ছিলেন সংখ্যায় মুষ্টিমেয়। এইসব কারণে মুসলমানদের মনোভাব হিন্দুদের উপরে প্রসন্ন ছিল না। বর্ণ হিন্দু ও কংগ্রেস নেতাগণ এই সময় উদারতা প্রদর্শন করিলে হয়তো দেশ-ভাগাভাগির প্রয়োজন হইত না।

কংগ্রেসের সত্যাগ্রহ অসহযোগ আন্দোলন, বিপ্লবীবাদীদের সরকারী কর্মচারী নিধন, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন, আজাদ হিন্দ ফৌজের সশস্ত্র বিপ্লব, কুইট ইণ্ডিয়া প্রস্তাবে ভারতব্যাপী বিপ্লব ইত্যাদি ঘটনা ইংরেজ সরকারকে বিষম দুশ্চিন্তায় ফেলিল। গোলটেবিল বৈঠক, '১৯৩৫ সালের শাসনসংস্কার' ক্রিপ্‌স্ প্রস্তাব কোনটাই কার্যকরী হইল না। শত অত্যাচার, কারাদণ্ড এমনকি গুলি ও ফাঁসি-কাষ্ঠে ঝুলাইয়া যখন কালা আদমীগুলিকে ঠাণ্ডা করা গেল না, তখন 'কুইট ইণ্ডিয়া' প্রস্তাবকে মানিয়া লওয়া ছাড়া ইংরেজের আর গত্যন্তর রহিল না। সত্য কথা বলিতে কি, এদেশ হইতে ইংরেজ তাড়াইতে কংগ্রেস ও বিপ্লববাদীগণ ব্যতীত অন্য কোন দলই প্রত্যক্ষ

সংগ্রামে অবতীর্ণ হয় নাই। বিশ্ববিখ্যাত রাজনীতিবিদ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল বৃটিশ সাম্রাজ্য রক্ষা করিতেই রাষ্ট্রের কর্ণধার হইয়াছিলেন। একথা দর্পের সহিত তিনি ঘোষণাও করেন। ১৯৪৬ সালে ইংলণ্ডের সাধারণ নির্বাচনে চার্চিলের রক্ষণশীল দলকে পরাজিত করিয়া শ্রমিকদল বিজয়ী হইল। শ্রমিকদলের নেতা ক্লিমেন্ট এট্‌লি প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হইলেন। গান্ধী-জিন্নাহ্‌ আলোচনা ফাঁসিয়া যাওয়ার পর মুসলমানদের পাকিস্তান দাবির কথা বৃটিশ সরকার গভীরভাবে চিন্তা করিলেন। অবশেষে পাকিস্তান ইস্যুর উপরে সাধারণ নির্বাচন আরম্ভ হইল। যদিও মুসলমান-প্রধান চারিটি প্রদেশ ব্যতীত অন্য প্রদেশগুলি পাকিস্তানভুক্ত হইতে পারে না একথা পরিষ্কারভাবে জানা ছিল। তবুও হিন্দুপ্রধান দেশগুলির মুষ্টিমেয় মুসলমানেরা স্বাধীন মুস্‌লিম রাষ্ট্রে বাস করিয়া হিন্দুর কবল হইতে মুক্ত হইতে পারিবে। এই অলীক আশায় পাকিস্তানের পক্ষে ভোট দিয়াছিলেন। জমিয়ত উলামার নেতৃবৃন্দ ও কংগ্রেসী বিশিষ্ট নেতাগণ পুনঃ পুনঃ মুসলমানদিগকে বুঝাইলেন যে ভারতের দশ কোটি মুসলমানদের জন্য কখনই পাকিস্তান হইবে না। অন্তত পাঁচ কোটি মুসলমানকে হিন্দুস্থানে হিন্দুদের সহিত বাস করিতে হইবে। সুতরাং পাকিস্তান ইস্যুর উপরে ভোট দিয়া হিন্দুপ্রধান প্রদেশগুলিতে তাঁহাদের বিরাগভাজন হওয়া ব্যতীত কোন লাভ হইবে না। মুসলমানপ্রধান সীমান্ত প্রদেশ ও হিন্দুপ্রধান বিহারী মুসলমানগণ লীগের পক্ষে ভোট দেয় নাই। মুস্‌লিম বিশ্বের খ্যাতনামা মনীষী প্রগাঢ় রাজনীতি-বিদ দূরদর্শী মওলানা আবুল কালাম আজাদকে কায়েদে আজম জিন্নাহ্‌ কংগ্রেসের 'সোবয়' বলিয়া উপহাস করিয়াছিলেন। কিন্তু সারা দেশের শিক্ষিত অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই অবগত আছেন যে মওলানা আজাদ কংগ্রেসের সোবয় ছিলেন না। তিনি ছিলেন কংগ্রেসের শীর্ষস্থানীয় নেতাগণের অন্যতম। কোন জটিল বিষয়ে পরামর্শ সকলেই গ্রহণ করিতেন। মওলানা সাহেবের পাণ্ডিত্য ও প্রতিভা তাঁহার বিরুদ্ধমতাবলম্বিগণ অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করেন।

হুমায়ুন কবীর ও সৈয়দ বদরুদ্দোজা

ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম ভাগে দেশের অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র প্রসিদ্ধ বাগ্মী সৈয়দ বদরুদ্দোজা, বিখ্যাত কবি ও মনীষী হুমায়ুন কবীর, তদানীন্তন মন্ত্রী খান বাহাদুর হাসেম আলী হিলি আসিয়া আমার আতিথ্য গ্রহণ করেন। এই বিশিষ্ট অতিথিগণের অপ্রত্যাশিত আগমনে আমি ব্যস্ত

হইয়া পড়ি। তাঁহারা পৌঁছিয়াই বলিলেন—ভাই খাবার দাও। উপস্থিত যাহা আছে তাহাই আন। আমরা ক্ষুধার্ত। বাড়িতে খোঁজ লইয়া দেখি, সাদা ভাত, আলু ও টোমাটোর চাট্‌নী ও ডাইল ছাড়া আর কিছুই নাই। তাঁহাদিগকে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিতে অনুরোধ জানাইলাম, কিন্তু তাঁহারা ডাইল ভাতের কথা শুনিয়া মহানন্দে তাহাই আনিতে আদেশ করিলেন। গরীবের বাড়ীর 'খুদ-কুড়া' তৃপ্তির সহিত ভোজন করিয়া পরদিন সকালে তাঁহারা বালুরঘাট অঞ্চলে রওনা হইয়া গেলেন। বিলাতে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট কবি ও সাহিত্যিক হুমায়ুন কবীর কৃষক প্রজা আন্দোলনের অন্যতম নেতা ছিলেন। দেশ বিভাগের পর তিনি ভারতের মন্ত্রীও হইয়াছিলেন।

(৫২)

শয়তানী কাণ্ড

হজরত মওলানা হোসেন আহমেদ মাদানী ভারতের অন্যতম ইস্‌লামী শিক্ষাকেন্দ্র দেওবন্দ দারুল উলুমের অধ্যক্ষ ও সুবিখ্যাত মহাদ্দেস ছিলেন। স্বাধীনতা-সংগ্রামের শ্রেষ্ঠ সৈনিক ও সারাজীবন নির্যাতন তিনি ভোগ করিয়াছেন। মুস্‌লিম জগতের অন্যতম মনীষী মওলানা মাহ্‌মুদুল হক দেওবন্দের সহিত ইংরেজের কোপে পড়িয়া মালটায় নির্বাসিত হন। সৈয়দপুর দারুল-উলুমের মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা কর্মবীর মওলানা রিয়াজউদ্দীন আহমেদ সাহেবের সহিত তাঁহার যথেষ্ট সৌহার্দ ছিল। দারুল-উলুম মাদ্রাসায় শুভ পদার্পণের জন্য তিনি আমন্ত্রিত হন। মওলানা মাদানী এক সভায় বলিয়াছিলেন, আপনারা হয়তো স্বাধীন পাকিস্তানের অধিবাসী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করিবেন। কিন্তু আমাদের ভাগ্যে তাহা হইবে না। আমরা হিন্দু-প্রধান দেশের সংখ্যালঘু মুসলমান। দশকোটি মুসলমানের স্থান পাকিস্তানে হইবে না। সুতরাং হিন্দুদের সঙ্গে আমাদের বাধ্য হইয়াই থাকিতে হইবে।

এই কঠোর সত্য কথা বলার জন্য সৈয়দপুর স্টেশনে কতকগুলি গুণ্ডা শ্রেণীর লোক রেলের সেকেণ্ড ক্লাসের কামরায় তাঁহাকে আক্রমণ করে। এক শয়তান তাঁহার দাঁড়ি ধরিয়া টানিতে থাকে। উপস্থিত মুসলমানগণ দুর্বৃত্তদের এই কাণ্ড দেখিয়া তাহাদিগকে মারিয়া তাড়াইয়া দেন। অতঃপর পুলিশ পাহারায় তাঁহাকে গন্তব্য-স্থানে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। ইহার কয়েকদিন পর এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটে। যে

দুর্বৃত্ত লোকটা তাঁহার দাঁড়ি ধরিয়া টানিয়াছিল, সে পুকুরে গোসল করিতে গিয়া আর উঠিল না। লোকে খোঁজাখুঁজির পর দেখিল গভীর পানিতে কাদার মধ্যে তাহার মস্তক প্রথিত হইয়া রহিয়াছে। বহু লোক এ অভাবনীয় দৃশ্য স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছিল।

নির্বাচন শেষ হইলে দেখা গেল অধিকাংশ মুসলমান পাকিস্তানের দাবি সমর্থন করিয়াছেন। অন্যান্য প্রদেশ কংগ্রেস প্রার্থিগণ জয়লাভ করিয়াছেন।

সৈন্যদের বিদ্রোহ

ইতিপূর্বে সৈন্যদের মধ্যে বিদ্রোহ দেখা দিয়াছিল, পেশোয়ারে একদল গাড়োয়ালী সৈন্য নিরস্ত্র জনসাধারণের উপরে গুলি চালাইতে অস্বীকার করে। ইলেকশন শেষ না হইতে বোম্বে নৌসৈন্যদের একদল বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া এক ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি করে। বোম্বাই, করাচী, মাদ্রাজ প্রভৃতি স্থানে বিদ্রোহী দেশী সৈন্যেরা ইংরেজ সৈন্যের গুলিতে প্রাণ হারায়। চারিদিকের অবস্থা দেখিয়া ইংরেজ সরকার এদেশে থাকা সম্ভব নয় বুঝিয়া তাড়াতাড়ি ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। রক্ষণশীল লর্ড ওয়াভেলের স্থানে লর্ড মাউন্টবেণ্টন বড়লাট নিযুক্ত হইলেন।

প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা

প্রধানমন্ত্রী মিঃ এটলী ভারতের স্বাধীনতার দাবি স্বীকার করিয়া লইয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিন জন বৃটিশ মন্ত্রী ক্ষমতা হস্তান্তরের বিষয় ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনা করার জন্য আসিলেন। মন্ত্রিমিশন ঘোষণা করিলেন মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলিতে মুসলমানদের প্রভাব বিদ্যমান থাকিবে। দীর্ঘ দেড় মাস যাবৎ ভারতের বিভিন্ন দলের সহিত আলোচনা হয়। তাঁহারা কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছাইতে পারিলেন না। মিঃ জিন্নাহ্, লীগের দাবি পাকিস্তান ব্যতীত কিছুতেই রাজী হইলেন না। কংগ্রেস হিন্দু মহাসভা প্রভৃতি উহা মানিয়া লইলেন না। অবশেষে মুস্লিম লীগ প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস ঘোষণা করিলেন। হিন্দুরা মনে করিলেন এ সংগ্রাম তাহাদের বিরুদ্ধেই হইবে। তাই তাহারাও প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। বিভিন্ন স্থান হইতে গুণ্ডা আমদানী করা হইল। সরকারী উচ্চ-পদস্থ কর্মচারী, অধিকাংশ হিন্দু। পুলিশ বিভাগে মুসলমান কর্মচারী নগণ্য।

লাল বাজারের হেড কোয়ার্টারে পুলিশের বড় কর্তাগণ প্রায় হিন্দু। মুসলমান সংবাদপত্রগুলিতে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের জন্য মুসলমানদিগকে প্রস্তুত হইতে বলা হইল। হিন্দু সংবাদপত্রগুলি প্রত্যক্ষ সংগ্রামের উদ্দেশ্য কি এবং কাহার সহিত এই সংগ্রাম তাহা ব্যাখ্যার জন্য দাবি করা হইল। কিন্তু লীগ কর্তৃপক্ষ হইতে কোন সাড়া না পাইয়া হিন্দুদের বিশ্বাস দৃঢ় হইল যে সংগ্রাম তাহাদের বিরুদ্ধেই হইবে। জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দী তখন প্রধানমন্ত্রী। ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগস্ট স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে এক মর্মান্তিক ঘটনা ঘটিয়া গেল। সত্য সত্যই প্রত্যক্ষ সংগ্রাম আরম্ভ হইল। হিন্দু মুসলমান যাহারা যুগ যুগ ধরিয়া পাশাপাশি বাস করিয়া আসিয়াছে আজ তাহারা হিংস্র মূর্তিতে পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণ করায় সারা কলিকাতায় রক্তের স্রোত বহিতে লাগিল। হিন্দুপ্রধান এলাকায় মুসলমান বস্তিগুলি ধ্বংস হইয়া গেল। অসহায় অধিবাসিগণকে ধরিয়া স্ত্রী-পুরুষ-বালক-বৃদ্ধ-নির্বিশেষে অতি নৃশংসভাবে হত্যা করা হইল। মসজিদ মাদ্রাসাগুলি ধ্বংস হইল। মুসলমান প্রধান এলাকায় হিন্দু অধিবাসিগণের উপরে নির্মম অত্যাচার ও হত্যাকাণ্ড চলিল। শত শত বৎসর যাবৎ যাহারা একত্রে বাস করিয়া শান্তিতে জীবন যাপন করিয়াছে আজ তাহারা ন্যায়, নীতি ও মনুষ্যত্ব বিসর্জন দিয়া নৃশংস হত্যায় মাতিয়া উঠিয়াছে। আশ্চর্যের কথা যে ইংরেজের কূটনীতির জন্য দেশের এই ভয়াবহ অবস্থা তাহাদিগকে কেহ স্পর্শ পর্যন্ত করিল না। অবস্থা এমন ভয়াবহ হইয়া উঠিল যে, কলিকাতার সংখ্যালঘু মুসলমানগণ নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবার আশঙ্কা দেখা দিল। মুসলমান পুলিশ অপেক্ষা হিন্দু পুলিশ কর্মচারীর সংখ্যা ৭।৮ গুণ বেশী। বিপন্ন মুসলমানগণকে রক্ষা করিতে হিন্দু পুলিশ অগ্রসর হয় নাই। অবশ্য দু-এক স্থানে ব্যতিক্রম দেখা গিয়াছিল। অসহায় মুসলমানগণকে রক্ষা করিবার দৃঢ় সঙ্কল্প লইয়া জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দী সিংহ বিক্রমে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। তিনি একদল সশস্ত্র পুলিশ দিয়া সারা কলিকাতা উল্কার ন্যায় ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। দুই দিন দুই রাত্রি ট্যাক্সিতেই বিনিদ্র রজনী যাপন করিয়া তিনি অবস্থা কতকটা আয়ত্তের মধ্যে আনিলেন। অতপর স্থায়ী প্রতিকারের জন্য পাঞ্জাব হইতে প্রায় সহস্রাধিক মুসলমান আনিয়া পুলিশে ভর্তি করিয়া লইলেন। তিন-চার দিন ধরিয়া এই হত্যাকাণ্ড চলিয়াছিল। কলিকাতার চার-পাঁচ লক্ষ মুসলমানদিগকে রক্ষা করিতে গিয়া সোহরাওয়ার্দী সাহেব নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া যাহা করিয়া গিয়াছেন উহা স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। শুধু কলিকাতায় নহে সমগ্র ভারতে নিরপরাধ মানুষের রক্ত দিয়া যে হোলি খেলা

চলিল, দুনিয়ার ইতিহাসে উহার নজির আছে কিনা জানি না। বিহার যুক্তপ্রদেশ এবং অন্যান্য হিন্দুপ্রধান দেশগুলিতে মুসলিম হত্যার যে তাণ্ডব চলিয়াছিল উহার ভয়াবহ অবস্থার কথা স্মরণ করিলে আজিও শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। শত শত মসজিদ, মাদ্রাসা ও মুসলমান পরিবার নিশ্চিহ্ন হইয়াছে। অনুরূপভাবে হিন্দু পরিবারও নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। এই পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড দেখিয়া স্বাধীনতাকামী নেতৃবৃন্দ মর্মাহত হইলেন। বিমূঢ় ইংরেজ সরকার হিন্দু-মুসলমানের একত্রবাস সম্ভব নহে মনে করিয়া দেশ বিভক্ত করার চিন্তা করিতে লাগিলেন।

ক্ষমতা-হস্তান্তর

১৯৪৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ইংরেজ সরকার ঘোষণা করিলেন যে ভারতীয়গণের হস্তে শাসনক্ষমতা অর্পণ করা হইবে। তাঁহারা যদি একমত হইতে না পারেন তবে প্রধান দলগুলির হস্তে শাসনক্ষমতা অর্পণ করিয়া আমরা চলিয়া যাইব। লর্ড মাউন্টব্যাটেন ভারতে আসিয়াই কংগ্রেস ও লীগ নেতৃবৃন্দের সহিত ক্ষমতা হস্তান্তরের বিষয় আলোচনা চালাইতে লাগিলেন। প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ভয়াবহ পরিণাম অগণিত হিন্দু-মুসলমানের অবৈধ রক্তপাত দেখিয়া গান্ধীজী অতিমাত্রায় বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি ব্যথিত হৃদয়ে দেশ বিভাগের সম্মতি দিলেন। মুসলিম লীগ মুসলমানপ্রধান চারটি প্রদেশ বেলুচিস্তান ও আসাম পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্তি দাবি করিলেন। ভারতে মধ্য দিয়া একটি কড়িডোরের দাবিও ছিল।

হিন্দুগণ যখন দেখিলেন জনসংখ্যার অনুপাতে ভাগ-বাটোয়ারা হইতেছে তখন তাহারা পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার হিন্দু-মুসলমান জনসংখ্যার অনুপাতে পূর্ব বাংলা পাকিস্তান ও পশ্চিম বাংলাকে হিন্দুস্তানের অন্তর্ভুক্তির জন্য প্রবল আন্দোলন আরম্ভ করিল। পাঞ্জাবের অবস্থাও অনুরূপ হইল। পূর্ব ও পশ্চিম পাঞ্জাব দ্বিধা বিভক্তির দাবি উত্থাপিত হইল। মাদ্রাজের জননায়ক রাজা গোপলাচারী, বাংলার শরৎচন্দ্র বসু প্রমুখ কিছু সংখ্যক উদার হিন্দু নেতা ব্যতীত সমস্ত হিন্দুসমাজ এইরূপ তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করিল যাহার ফলে বাংলা ও পাঞ্জাব ভারতের দুইটি শ্রেষ্ঠ প্রদেশ দ্বিধাবিভক্ত করার সিদ্ধান্ত ইংরেজ সরকার গ্রহণ করিতে বাধ্য হইল। আশ্চর্যের বিষয় লীগের কর্তারা মালাবার যুক্তপ্রদেশ, বিহার, এমনকি কলিকাতার খিদিরপুর, পার্ক সার্কাস, নারিকেল ডাঙ্গা প্রভৃতি মুসলমানপ্রধান অঞ্চলগুলি পাকিস্তান ভুক্তির কোন দাবি উপস্থিত করিলেন না। পাঞ্জাব ও বাংলা ভাগের সম্মতি লীগের পক্ষ

হইতে কে দিয়াছিলেন জানা যায় নাই, এই দুইটি প্রদেশ ভাগের বিরুদ্ধে লীগের কোন জোর প্রতিবাদ ছিল না।

১৯৪৭ সালের ৪ঠা জুলাই কমন্স সভায় ভারতের স্বাধীনতা প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। ১৮ই জুলাই ভারত সম্রাট ষষ্ঠ জর্জ উহাতে স্বাক্ষর করেন। সম্রাটের প্রতিনিধি হিসাবে লর্ড মাউন্টব্যাটেন করাচীতে গিয়া ১৪ই আগস্ট মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্ট কায়েদে আজম জিন্নাহ্‌র নিকট পাকিস্তানের শাসনক্ষমতা হস্তান্তর করেন। ১৫ই আগস্ট কংগ্রেস প্রেসিডেন্টের নিকট ভারতের শাসনক্ষমতা হস্তান্তর করা হয়। দীর্ঘ দিনের প্রাণপাত সাধনা ও লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীর আত্মত্যাগের ফলে ভারত ও পাকিস্তান দুইটি স্বাধীন রাষ্ট্রের সৃষ্টি হইল কিন্তু এই দুই রাষ্ট্রের সীমা নির্ধারণ লইয়া গুরুতর সমস্যার উদ্ভব হইল। লীগ ও কংগ্রেস কর্তৃপক্ষের আপস আলোচনার দ্বারা ইহা সম্ভব না হওয়ায় অগত্যা তৃতীয় পক্ষের উপরে ভার দেওয়া হইল। র‍্যাডক্লীফ সাহেব সালিশ নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গন্য হইবে উভয় পক্ষই মানিয়া লইলেন। তাই তিনি বড়লাটের সহিত পরামর্শ করিয়া খেয়াল-খুশিমত শুধু প্রদেশ নহে জেলা, মহকুমা এমনকি গ্রামগুলি পর্যন্ত ভাগ-বাটোয়ারা করিয়া দিলেন। লীগের ষোল আনা দাবি টিকিল না। আসাম পাকিস্তান ভুক্ত হইল না। মুর্শিদাবাদ, মালদহ প্রভৃতি মুসলমানপ্রধান জেলাগুলি সম্পূর্ণ ও নদীয়া, দিনাজপুর, যশোহর, সিলেট জেলার অংশ বিশেষ ভারতের অন্তর্ভুক্ত করা হইল, কড়িডোরের দাবি আলোচনাই হইল না। পাঞ্জাব ও বাংলা দ্বিধাবিভক্ত হইয়া গেল। বাংলার কৃষি এলাকা পাকিস্তানের ও শিল্প এলাকা খনিজ সম্পদ প্রায় সম্পূর্ণ হিন্দুস্থানের অন্তর্ভুক্ত হইল। এইরূপে ট্রাঙ্কেটেড পাকিস্তান গঠন করিয়া দিয়া র‍্যাডক্লীফ সাহেব মোটা দক্ষিণা লইয়া সরিয়া পড়িলেন। কায়েদ আজম ফুটা পাকিস্তান পাইলাম বলিয়া দুঃখ করিয়াছিলেন। ভাগ-বাটোয়ারার অবস্থা দেখিয়া মনে হয় উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে বিরোধ চির জাগরূক রাখার প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্য বণ্টনকারীর ছিল।

উপসংহার

সুদীর্ঘ ১৯০ বৎসর পর পরাধীনতার নাগপাশ হইতে পাক-ভারত মুক্তিলাভ করিয়া জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে যাঁহারা দেশকে মুক্ত করিতে যুগযুগ ধরিয়া অনন্ত নিগ্রহ ভোগ করিয়াছেন, ফাঁসির মঞ্চে বন্দুকের গুলিতে লাঠির আঘাতে প্রাণ দিয়াছেন,

কারাগারে কালাপানির দেশে নির্বাসিত হইয়া তিল তিল করিয়া জীবন ক্ষয় করিয়াছেন, যাঁহাদের অমানুষিক সাধনা, অপূর্ব আত্মত্যাগের ফলে ভারত স্বাধীন হইয়াছে, দেশের সেই লক্ষ লক্ষ মুক্তিপাগল জনগণের উদ্দেশ্যে গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি। দেশ দ্বিধাবিভক্ত হইয়া পাকিস্তান রাষ্ট্র কায়েম হইল, ভারতের দশ কোটি মুসলমান দ্বিধাবিভক্ত হইয়া পররাষ্ট্রের অধীন হইল। হাজার হাজার মুসলমান যাঁহারা স্বাধীনতা-সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করিয়া অনন্ত নির্যাতন ভোগ করিয়াছিলেন আজ তাঁহাদের পরিণতি কি?

ভাগাভাগির পর

বিভাগ পূর্বে হিলি উত্তরবঙ্গের বিরাট ব্যবসায়ী কেন্দ্র ছিল। এখানে ১৬টি চাউলের কল থাকায়, লক্ষ লক্ষ মন ধান চাউলের আমদানি ও রপ্তানি হইত। র‍্যাড্‌-ক্লীফের কুঠার হিলি বন্দরকেও দ্বিধাবিভক্ত করিয়া দিল। ন্যায়বিচার অনুযায়ী যে সীমানা হিলি ও বালুরঘাটের মাঝ দিয়া চলিয়া যাইত, কি কারণে জানি না উহা একটি পকেট সৃষ্টি করিয়া হিলি বন্দরটি ভারতের কুক্ষিগত হইল। লীগের কর্তাগণ তখন পাকিস্তান পাইয়াই আনন্দে অধীর হইয়াছেন। এইসকল ক্ষুদ্র বিষয়ে তাঁহারা মনোযোগ দেওয়ার প্রয়োজন মনে করিলেন না। ইহার ফলে কয়েক শত বর্গমাইল ভূমি পাকিস্তানের হাতছাড়া হইয়া গেল। ইহার কারণ ছিল, নিজের কষ্টার্জিত সম্পত্তি হইলে উহার সীমানা সরহদ্দ বুঝিয়া লইতে কেহই কসুর করে না। এখানে হইয়াছে অন্যরূপ, স্বাধীনতা-সংগ্রামে লীগ ইংরেজের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে কখনও অবতীর্ণ হয় নাই। অন্যের প্রাণপাত পরিশ্রমে অর্জিত সম্পত্তিতে অংশীদার হিসাবে ভাগ আদায় করিয়া লইয়াছে মাত্র। সুতরাং যাহা পাওয়া যায় তাহাতেই সন্তুষ্ট হওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। ইহা অপ্রিয় সত্য কথা। আমার পরম সুহৃদ হিলির বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মুন্সী জাফর আহম্মদ সাহেব যুক্ত-প্রদেশের লোক। দেশ বিভাগের পর তিনি গাজিপুর নিজ বাড়ীতে গিয়াছিলেন। তাঁহার জনৈক হিন্দু বন্ধু তাঁহাকে বলেন—ভাই তোম লোগকো তো পাকিস্তান মিল গেয়া, আব ইঁহা কাহে:কা রহোগে। তোমহারা যায়েদাদ যো কুছ হ্যায় হামকো দে দো। মুফত নেহি মাঙ্গতে হোঁ, কুছ রুপিয়াভি দেয়েঙ্গে।

দেশ বিভাগ হওয়ার পর হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে এইরূপ মনোভাব প্রায় সর্বত্র

সৃষ্টি হইয়াছিল। বিভিন্ন স্থানে দাঙ্গা-হাঙ্গামা, খুন-জখমও চলিতেছিল। মুসলমান প্রধান এলাকায় হিন্দু খুন হইল। হিন্দুপ্রধান এলাকায় মুসলমান মরিল। বিহারে সংখ্যালঘু মুসলমান স্ত্রী-পুত্র-পরিজনসহ স্থানে স্থানে নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল। দলে দলে বিহারী মুসলমান প্রাণ ভয়ে সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া পাকিস্তানে পলাইয়া আসিল। কেহ ধরা পড়িয়া সপরিবারে নিহত হইল। যুক্ত প্রদেশের বড় বড় মুসলমান জমিদার মহারাজ মাহমুদাবাদ, রাজা সলিমপুর, নবাব রামপুর, টঙ্ক প্রভৃতি জমিদারগণ লক্ষ লক্ষ টাকা আয়ের সম্পত্তি রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া প্রাণ ভয়ে পলাইয়া গেলেন। কত লক্ষপতি কড়ার ভিখারী হইল। কি মর্মান্তিক দৃশ্য দেখিলাম। নির্যাতিত ভারতীয় মুসলমানগণ প্রাণ ভয়ে পৈত্রিক ভিটামাটি ত্যাগ করিয়া দুগ্ধপোষ্য শিশু ও পরিবার পরিজনের হাত ধরিয়া লক্ষহীনভাবে পাকিস্তানের দিকে চলিয়াছে। অনাহারে ক্লিষ্ট, পথশ্রমে কাতর হাজার হাজার নরনারী অশ্রুসজল নেত্রে নিরুদ্দেশের পথে যাত্রা করিয়াছে। আবার পাকিস্তান হইতে দলে দলে হিন্দু আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া অনুরূপভাবে হিন্দুস্থানের দিকে চলিয়াছে। একথা ধ্রুব সত্য বর্ণ হিন্দুদের অনুদারতার ফলে পাকিস্তানদের সৃষ্টি হইয়াছে। তাঁহারা যদি মুসলমানদের ন্যায্য স্বার্থগুলির প্রতি সুবিচার করিতেন ত হা হইলে হয়তো দেশবিভাগের প্রশ্ন আসিত না। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু জীবিত থাকিলে খুব সম্ভব অবস্থা ভিন্নরূপ হইত। পাকিস্তান এখন আর শিশু রাষ্ট্র নহে। যৌবনসীমায় পদার্পন করিয়াছে কেন আমরা স্বাধীনত-সংগ্রামে যোগদান করিয়া স্বেচ্ছায় গুরুতর বিপদের ঝুঁকি লইয়াছিলাম? জমিদারী প্রথা তুলিতে গিয়া অশেষ নির্যাতন ভোগ করিয়াছিলাম। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল বিদেশী শাসনের নাগপাশ ছিন্ন করিয়া স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিকরূপে বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইব, দারিদ্র্যের অভিশাপ হইতে মুক্ত হইয়া সুখী ও সমৃদ্ধশালী উন্নত দেশের শ্রেষ্ঠ নাগরিকরূপে নিজেদেরকে গড়িয়া তুলিব। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সে উদ্দেশ্যে সফল হয় নাই।
